بسم الله الرحمن الرحيم

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

[سورة بنى اسرآئيل آية :٨٠]

আহলে হাদীস নামধারী ভ্রান্ত ও লা-মাযহাবীদের খন্ডন

সত্য সমাগত

বাতিল অপসৃত

এতে রয়েছে-

'জা-আল হক্ব' থেকে নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ

ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জীবনী

'তাক্লীদ'-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হানাফী মাযহাব শ্রেষ্ঠ কেন?

প্রণয়নে

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আবদুল মান্নান

প্রকাশনায়

আন্‌জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,

E-mail:anjumanturst@gmail.com,monthlytarjuman@gmail.com

www.anjumantrust.org

আহলে হাদীস নামধারী ভ্রান্ত ও লা-মাযহাবীদের খন্ডন

সত্য সমাগত বাতিল অপসৃত

এতে রয়েছে-

'জা-আল হক্ব' থেকে নির্বাচিত অংশের বঙ্গানুবাদ

ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জীবনী

'তাক্লীদ'-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

হানাফী মাযহাব শ্রেষ্ঠ কেন?

প্রণয়নে : **মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল আবদুল মান্নান**

মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

কম্পোজ : **মুহাম্মদ ইকবাল উদ্দীন**

প্রথম প্রকাশ : ১১ যিলক্বদ, ১৪৩৮ হিজরী
২০ শ্রাবণ, ১৪২৩ বাংলা
০৪ আগষ্ট, ২০১৭ ইংরেজি

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

হাদিয়া : ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র ।

Satya Samagata Batil Apasrita written by Maulana Muhammad Abdul Mannan, Published by **ANJUMAN-E RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST.** Chittagong, Bangladesh. **Hadiah Tk. 150**/- only.

সূচীপত্র
সত্য সমাগত বাত্বিল অপসৃত

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১.	প্রকাশকের কথা	০৭
০২.	মুখবন্ধ	০৯
০৩.	**ভূমিকা:** হাদীস-ই সহীহ্, হাসান ও দ্ব'ঈফ	১১
০৪.	কোন্ কোন্ জিনিষ দ্বারা হাদীস-ই দ্ব'ঈফ 'হাসান' হয়ে যায়	১২
০৫.	ইমাম-ই আ'যমের হাদীসগুলো দুর্বল (দ্ব'ঈফ) নয়	১৩
০৬.	হাদীসের দুর্বলতা মুক্বাল্লিদের জন্য ক্ষতিকর নয়; কিন্তু ওহাবী লা-মাযহাবীদের জন্য ক্বিয়ামত তুল্য	১৭
০৭.	**প্রথম অধ্যায়: উভয় কান পর্যন্ত হাত উঠানোর বিধান**	১৮
০৮.	**প্রথম পরিচ্ছেদ:** এ মাসআলার পক্ষে ক্বোরআন-হাদীসের প্রমাণাদি ও যুক্তিগ্রাহ্য দলীলসমূহ	১৯
০৯.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:** এ প্রসঙ্গে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	২৩
১০.	**দ্বিতীয় অধ্যায়: নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত**	২৬
১১.	**প্রথম পরিচ্ছেদ:** এ মাসআলার পক্ষে ক্বোরআন-হাদীসের প্রমাণাদি ও যুক্তিগ্রাহ্য দলীলসমূহ	২৭
১২.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:** এ প্রসঙ্গে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	৩০
১৩.	এক আজব ধরনের মজার কথা	৩১
১৪.	**তৃতীয় অধ্যায়: নামাযে 'বিসমিল্লাহ্' নিরবে পড়া প্রসঙ্গে**	৩৪
১৫.	**প্রথম পরিচ্ছেদ:** এ মাসআলার পক্ষে ক্বোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি ও যুক্তিগ্রাহ্য দলীলসমূহ	৩৫
১৬.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	৩৯
১৭.	**চতুর্থ অধ্যায়: ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পন্ন করবে না**	৪৩
১৮.	**প্রথম পরিচ্ছেদ:** ইমামের পেছনে ক্বিরাআত কোন্ কোন্ আয়াত দ্বারা রহিত। এ প্রসঙ্গে ক্বোরআন হাদীসের দলীলাদি ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ। ইমামের পেছনে ক্বিরাআত নিষিদ্ধ	৪৪
১৯.	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	৫১
২০.	ক্বোরআনের তিলাওয়াত ও তা'লীমের মধ্যে পার্থক্য	৫৫
২১.	আশিজন সাহাবী ইমামের পেছনে মুক্বতাদীর ক্বিরাআতের বিপক্ষে	৬১

২২.	**পঞ্চম অধ্যায়: 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা চাই**	৬৬
২৩.	**প্রথম পরিচ্ছেদ:** এর পক্ষে ক্বোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি	৬৭
২৪.	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	৭২
২৫.	উচ্চস্বরে আ-মী-ন বলা ক্বোরআন, হাদীস ও যুক্তির পরিপন্থী	৭৭
২৬.	**ষষ্ঠ অধ্যায়: 'রফ'ই ইয়াদাঈন' নিষিদ্ধ। অর্থাৎ তাকবীর-ই তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলার সময় হাত উঠাবে না**	৮১
২৭.	**প্রথম পরিচ্ছেদ:** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীসের প্রমাণাদি	৮২
২৮.	ইমামে আ'যম ও ইমাম আওযা'ঈর এ হাত উঠানোর প্রসঙ্গে আজব মুনাযারাহ্ (তর্কযুদ্ধ)	৮৮
২৯.	এ প্রসঙ্গে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি	৯০
৩০.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	৯২
৩১.	'নাহ্র'-এর আজব অর্থ	১০৭
৩২.	'কোন বিষয় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলে সেটা আমার মাযহাব' (اِذَاثَبَتَ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ)-এর উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা	১১০
৩৩.	**সপ্তম অধ্যায় : বিতরের নামায ওয়াজিব**	১১২
৩৪.	**প্রথম পরিচ্ছেদ:** বিতর তিন রাক্'আত। এর পক্ষে ক্বোরআন হাদীসের প্রমাণাদি এবং এর পক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য দলীলাদি	১১৩
৩৫.	শাফে'ঈ মাযহাবের ইমামদের এবং ওহাবীদের বিধানগুলোর মধ্যে পার্থক্য	১২৭
৩৬.	**অষ্টম অধ্যায় : ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্ পড়া নিষিদ্ধ**	১২৯
৩৭.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন্ কোন্ দুশমনকে ক্ষমা করেছেন এবং কাদের বিপক্ষে দো'আ করেছেন	১৩০
৩৮.	এ মাসআলার পক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি	১৩৪
৩৯.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো এবং সেগুলোর খন্ডন	১৩৮
৪০.	বিতরের নামাযে দো'আ ক্বুনূত সব সময় পড়ো	১৪৩
৪১.	**নবম অধ্যায় : 'আত্তাহিয়্যাত'-এ বসার ধরন**	১৪৬
৪২.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন ও হাদীস এবং যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি	১৪৭
৪৩.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	১৫২
৪৪.	**দশম অধ্যায় : তারাবীহর নামায বিশ রাক্'আত**	১৫৮
৪৫.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তির প্রমাণাদি	১৫৯
৪৬.	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	১৬৫
৪৭.	ওহাবীদের প্রতি কিছু প্রশ্ন	১৬৯
৪৮.	**একাদশ অধ্যায় : খতমে ক্বোরআন উপলক্ষে আলোকসজ্জা করা**	১৭১

৪৯.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি	১৭২
৫০.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	১৭৭
৫১.	**দ্বাদশ অধ্যায় : 'শবীনাহ্' সাওয়াবের কাজ**	১৮২
৫২.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন, হাদীস ও যুক্তির প্রমাণাদি	১৮৩
৫৩.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	১৮৯
৫৪.	**ত্রয়োদশ অধ্যায় : জমা'আত চলাকালে ফজরের সুন্নাত পড়ার বিধান**	১৯৪
৫৫.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন, হাদীস ও যুক্তিসম্মত প্রমাণাদি	১৯৫
৫৬.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	২০১
৫৭.	**চতুর্দশ অধ্যায়: একাধিক ওয়াক্বতের ফরয নামায একসাথে পড়া নিষিদ্ধ**	২০৬
৫৮.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি	২০৭
৫৯.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	২১২
৬০.	আমাদের কৃত অর্থের পক্ষে সমর্থন	২১৯
৬১.	**পঞ্চদশ অধ্যায় : সফরের দুরত্ব তিন দিনের রাস্তা**	২২০
৬২.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি	২২২
৬৩.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো এবং সেগুলোর খন্ডন	২২৭
৬৪.	**ষষ্ঠদশ অধ্যায় : সফরে সুন্নাত ও নফল পড়ার বিধান**	২৩০
৬৫.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তির প্রমাণাদি	২৩১
৬৬.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	২৩৮
৬৭.	**সপ্তদশ অধ্যায় : সফরে ক্বসর পড়া ওয়াজিব**	২৪৩
৬৮.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন, হাদীস ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি	২৪৪
৬৯.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	২৪৯
৭০.	হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিনায় পূর্ণ নামায কেন পড়েছেন?	২৫৪
৭১.	**অষ্টাদশ অধ্যায়: ফজরের নামায উজালা করে পড়া চাই**	২৫৮
৭২.	**প্রথম পরিচ্ছেদ:** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ভিত্তিক ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদি	২৫৯
৭৩.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	২৬৬
৭৪.	**ঊনবিংশতিতম অধ্যায় : যোহরের নামায ঠান্ডা করে পড়ুন**	২৭৩
৭৫.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীসের ও যুক্তিগ্রাহ্য প্রামাণাদি	২৭৪
৭৬.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	২৭৯
৭৭.	**বিংশতিতম অধ্যায় : আযান ও তাকবীর (ইক্বামত)-এর শব্দাবলী**	২৮৪
৭৮.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তিভিত্তিক দলীলাদি	২৮৬
৭৯.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	২৯২
৮০.	**একবিংশতিতম অধ্যায়: নফল নামায সম্পন্নকারী ইমামের পেছনে ফরয**	

	নামায সম্পন্নকারী মুক্বতাদীর নামায বৈধ নয়	২৯৮
৮১.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি	৩০০
৮২.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	৩০৩
৮৩.	**দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়: বমি ও রক্ত বের হলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়**	৩০৮
৮৪.	**প্রথম পরিচ্ছেদ : এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি**	৩০৯
৮৫.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	৩১৪
৮৬.	বমি ও রক্তের মধ্যে আশ্চর্যজনক পার্থক্য	৩১৮
৮৭.	**ত্রয়োবিংশাতিতম অধ্যায়: নাপাক কূপ পাক করার নিয়ম**	৩২০
৮৮.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি	৩২২
৮৯.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন	৩২৮
৯০.	**চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়: জুমু'আহ্ ও দু'ঈদের নামায গ্রামে শুদ্ধ হয় না**	৩৩৪
৯১.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-হাদীস ও যুক্তিনির্ভর প্রমাণাদি	৩৩৫
৯২.	**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন	৩৪০
৯৩.	পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়: জানাযার নামাযে 'আলহামদু শরীফ ক্বিরআতের নিয়্যতে পড়োনা	৩৪৬
৯৪.	**প্রথম পরিচ্ছেদ :** এর পক্ষে ক্বোরআন-সুন্নাহ্ ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি	৩৪৭
৯৫.	দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : এর বিপক্ষে উপস্থাপিত প্রশ্নাবলী ও সেগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাব	৩৫১
৯৬.	**পরিশিষ্ট**	৩৫৫
৯৭.	**ইমাম আবূ হানীফা** রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জীবনী, ফযাইল ও গুণাবলী	৩৫৫
৯৮.	ইমাম চতুষ্ঠয়ের জন্ম ও ওফাতের তারিখ, বয়স ও মাযার শরীফ	৩৬২
৯৯.	**'তাক্বলীদ'**-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৩৬৪
১০০.	হাদীস শরীফের আলোকে তাক্বলীদ	৩৭০
১০১.	ক্বোরআন ও হাদীস থেকে মাসআলা বের করার নমূনা	৩৭৫
১০২.	**ওহাবী ও হাদীস শরীফ**	৩৮০
১০৩.	সুন্নাহ্ ও হাদীসের মধ্যে পার্থক্য	৩৮৪

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

বর্তমানে বহুবিধ ফিৎনার মধ্যে লা-মাযহাবীদের ফিৎনা অতিমাত্রায় উল্লেখযোগ্য। বস্তুত: তাদের পক্ষে কোন গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নেই। তবুও হঠকারিতা করে তারা মসজিদগুলোতে ও নামাযের অভ্যন্তরে বিভিন্নভাবে তাদের ভ্রান্ত মতবাদকে প্রকাশ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাদের হানাফী মাযহাব-বিরোধী কর্মকান্ডের মধ্যে উচ্চস্বরে আ-মী-ন বলা, তাকবীর-ই তাহরীমার পর অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত তোলা, পা দু'টিকে অস্বাভাবিকভাবে ফাঁক করে দাঁড়ানো, নারীদের মতো পুরুষরাও বুকের উপর হাত বাঁধা ইত্যাদি সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি, তারা মাযহাব, মাযহাবের ইমামগণ, বিশেষ করে, ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-এর শানে অশালীন মন্তব্যাদি করার মতো ধৃষ্ঠতা দেখায়; অথচ ইসলামী শরীয়ত মতে মাযহাব মানা এবং ইমাম চতুষ্ঠয়ের মধ্যে যে কোন একজন ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে, মাযহাবকে অস্বীকার করে এর অনুসরণ না করা, বিশ্ববরেণ্য ইমামগণের প্রতি সম্মান দেখিয়ে তাঁদের অবদানগুলোকে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্মরণ না করে তাঁদের প্রতি অশালীনতা দেখানো জঘন্য গোমরাহীর নামান্তর মাত্র।

বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে অনুসরণীয় বিষয়গুলোকে অকাট্যভাবে মুসলিম সমাজে তুলে ধরা এবং পথভ্রষ্ট লা-মাযহাবীদের যাবতীয় বিরোধিতা ও তাদের উত্থাপিত আপত্তিগুলোর খন্ডন করা এখন যুগের দাবী।

আমাদের আহলে সুন্নাতের দক্ষ ওলামা-ই কেরাম যুগের এ দাবী পূরণে সোচ্ছার হন এবং তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের সপ্রমাণ খণ্ডন করেছেন। সঙ্গত কারণে এ কিতাব, আজকের 'লা-মাযহাবী' ফিৎনার মূলোৎপাটনে সবিশেষ উপকারী বলে একান্তভাবে বিবেচিত হবে ইনশা-আল্লাহ্!।

অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, আমাদের 'আনজুমান রিসার্চ সেন্টার'-এর মহাপরিচালক, বিশিষ্ট আলিমে দ্বীন, স্বনামধন্য লেখক, গবেষক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান সাহেব সরল বাংলায় 'সত্য সমাগত বাত্বিল অপসৃত' শিরোনামে আহলে হাদীসের খন্ডনে একটি প্রমাণ্য পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। এ পুস্তকে তিনি আহলে হাদীসের যথাযথ খন্ডনের নিমিত্তে 'জা-আল হক্ব' থেকে নির্বাচিত কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ, তদসঙ্গে ইমামে আ'যমের জীবনী, তাক্বলীদের গুরুত্ব ও হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি অতি প্রমাণ্যভাবে সন্নিবিষ্ট করেছেন। মোটকথা, সার্বিক বিবেচনায় পুস্তকটা যুগের একটি বিশেষ চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই, আমরা আমাদের প্রিয় সংস্থা 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'-এর প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ হতে পুস্তকটি সযত্নে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

কিতাবটা প্রকাশিত হয়ে পাঠক সমাজে সমাদৃত ও মুসলিম উম্মাহর উপকারে আসলেই আমাদের উদ্যোগে সার্থক হবে বৈ-কি। আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কিতাবটার বহুল প্রচার এবং মহান রব্বুল আলামীন জাল্লা জালালুহু ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে গ্রহণযোগ্যতা কামনা করছি। আ-মী-ন।

আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন
সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট

আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সেক্রেটারি জেনারেল

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

মুখবন্ধ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু আলা হাবীবিল কারীম
ওয়া 'আলা আ-লিহী ওয়া সাহবিহী আজমা'ঈন।

'তাক্বলীদ' তথা মাযহাবের ইমামগণ থেকে কোন এক ইমামের অনুসরণ করা ইসলামী শরীয়তে ওয়াজিব বা অপরিহার্য। এর পক্ষে ইসলামের চতুর্দলীলে বহু প্রমাণ রয়েছে। সঙ্গতকারণে 'তাক্বলীদ' আল্লাহর রহমত, পক্ষান্তরে, মাযহাব না মানা ও গায়র মুক্বাল্লিদ হওয়া আল্লাহর আযাবই। বিশ্বের প্রায় সব মুসলমান মাযহাবের অনুসারী। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, গোটা বিশ্বের অর্ধেক, আরেক পরিসংখ্যান অনুসারে, দু' তৃতীয়াংশ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী; অবশিষ্ট মুসলমানগণ বাকী তিন মাযহাবের অনুসারী।

কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে, কিছুদিন পূর্বে ওহাবী, লা-মাযহাবীরা তাক্বলীদের বিরুদ্ধে, বিশেষত: ইমাম-ই আ'যমের বিরুদ্ধে মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করে এবং মাযহাব ও মাযহাবের ইমামগণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকে। এটা এখন মুসলিম সমাজের অন্যতম মারাত্মক ফিৎনায় পরিণত হয়েছে। তাদের সংখ্যা তো অতি নগণ্য; কিন্তু তারা দল বেঁধে কোন কোন মসজিদে গিয়ে একসাথে 'উচ্চস্বরে আমীন' বলে। আর অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত তুলে তারা নারীদের মতো বুকের উপর হাত বাঁধে এবং পা দু'টিকে অস্বাভাবিকভাবে ফাঁক করে দাঁড়ায় ইত্যাদি। জানা গেছে, এসব কাজ করার জন্য তারা টাকার বিনিময়ে ফেরিওয়ালাদেরকেও নিয়োগ করছে। সুখের বিষয় যে, সংশ্লিষ্ট মসজিদগুলোতে ইমাম ও খতীব সাহেবগণ তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। মাসিক তরজুমানে একটা বিশেষ কলামে আমি ধারাবাহিকভাবে তাদের খন্ডন করতে থাকি। **মুখবন্ধ**

সুখের বিষয় যে, আমাদের আহলে সুন্নাতের দক্ষ ওলামা-ই কেরামও যথাসময়ে তাদের পিছু ধাওয়া করে আসছেন। যেমন- এ পর্যন্ত আহলে হাদীসের উত্থাপিত যাবতীয় মাসআলায় তাদের এবং হানাফী মাযহাব অনুসারে সেগুলোর সপ্রমাণ বর্ণনা করেছেন এবং আপত্তি-বিতর্কের সপ্রমাণ খন্ডন করেছেন হাকীমুল উম্মত আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'জা-আল হক্ব' দ্বিতীয় খন্ডে। কিতাবটিতে তিনি সর্বমোট পঁচিশটি

মাসআলা পঁচিশটি অধ্যায়ে অকাট্য প্রমাণাদি সহকারে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার ধরনও অতি চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি প্রতিটি মাসআলা একটি অধ্যায় এবং দু'টি পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছেন। আরো মজার বিষয় যে, প্রত্যেক প্রথম পরিচ্ছেদে সংশ্লিষ্ট মাসআলার পক্ষে ক্বোরআন ও হাদীস এবং যুক্তির নিরীখে যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ উত্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'আহলে হাদীস' নামের লা-মাযহাবীদের আপত্তিগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর খন্ডন তথা দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। ফলে আহলে সুন্নাত, বিশেষত হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ প্রতিটি মাসআলার পক্ষে দলীলাদি অতি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন, আর লা-মাযহাবীরা ও তাদের নসীবে হিদায়ত থাকলে, সঠিকপথে আসার সুযোগ পাবে। এ বিষয়ে অন্যান্য সুন্নী লেখক ওলামা-ই কেরামও এগিয়ে আসেন।

আরো উল্লেখ্য যে, আমি 'সত্য সমাগত বাত্বিল অপসৃত' শিরোনামের এ পুস্তকটা প্রণয়ন করেছি। এ'তে 'জা-আল হক্ব' থেকে প্রয়োজনীয় অংশের বঙ্গানুবাদ, ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নূরানী জীবনী, ইসলামে তাক্বলীদের গুরুত্ব ও হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠত্ব ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো সন্নিবিষ্ট করেছি, যাতে পুস্তকটি আহলে হাদীস নামের বাতিল সম্প্রদায়টির খন্ডনে একটি প্রমাণ্য পুস্তকের রূপ ধারন করে। আর 'আনজুমান রিসার্চ সেন্টার' থেকে মুদ্রণের জন্য তা পূর্ণাঙ্গরূপে তৈরী করে দিয়েছি, যা অতি সুন্দরভাবে 'আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'-এর প্রচার ও প্রকাশনা দপ্তর ছাপিয়ে পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপন করেছে। কিতাবটা, বর্তমানকার মারাত্মক ও ক্ষতিকর 'তাক্বলীদ বিরোধী ফিৎনা'র মূলোৎপাটন করে সুন্নী সমাজ তথা মুসলিম উম্মাহকে যে অকল্পনীয়ভাবে উপকৃত করবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

পরিশেষে, পুস্তকটার প্রকাশক ও অন্যান্য সহযোগীদের ধন্যবাদ জানিয়ে প্রত্যেককে কমপক্ষে একটি কপি সংগ্রহ করে, মাযহাবের অনুসরণে ও মাযহাব বিরোধীদের খন্ডনে ব্রতী হবার উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ্ তাওফীক্ব দিন! আ-মী-ন।

শুভাচ্ছান্তে-

(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

মূল কিতাব পাঠ-পর্যালোচনার পূর্বে নিম্নলিখিত নীতিমালা অতি উত্তমরূপে পাঠ-পর্যালোচনা করে মুখস্থ করে নিন। এ নিয়ম-নীতিগুলো অতি উপকারী।

নিয়ম নং-১

'ইসনাদ'* অনুসারে হাদীসের বহু প্রকার রয়েছে; কিন্তু আমি শুধু তিনটি প্রকারের আলোচনা করবো: ক. হাদীস-ই সহীহ্, খ. হাদীস-ই হাসান এবং গ. হাদীস-ই দ্ব'ঈফ।

প্রত্যেকটার সংজ্ঞা নিম্নরূপ

সহীহ্ ওই হাদীসকে বলা হয়, যা'তে চারটি বৈশিষ্ট্য আছে-

১. সেটার সনদ 'মুত্তাসিল' হয়; অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে আরম্ভ করে কিতাব প্রণয়নকারী পর্যন্ত কোন বর্ণনাকারী কোথাও বাদ পড়েনি।**

২. সেটার সমস্ত বর্ণনাকারী প্রথম পর্যায়ের মুত্তাক্বী-পরহেযগার হন, কেউ ফাসিক্ব (পাপাচারী) কিংবা এমন না হন, যাঁর অবস্থাদি অস্পষ্ট ও গোপন।

৩. সমস্ত বর্ণনাকারী অত্যন্ত প্রখর স্মরণশক্তিসম্পন্ন হন; কারো স্মরণশক্তি অসুস্থতা কিংবা বার্দ্ধক্যের কারণে দুর্বল হবে না এবং

৪. ওই হাদীস 'শায' অর্থাৎ 'মাশহুর' হাদীসগুলোর বিপরীত হবে না।

হাসান ওই হাদীসকে বলা হয়, যার কোন বর্ণনাকারীর মধ্যে এ গুণাবলী সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেই; অর্থাৎ কারো তাক্বওয়া (খোদাভীরুতা) অথবা স্মরণশক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ের নয়।

* হাদীস বর্ণনাকারীদের পরম্পরাকে 'ইসনাদ' বলা হয়। আর হাদীসের শব্দাবলীকে, যেখানে গিয়ে 'ইসনাদ' সমাপ্ত হয়, 'হাদীস' বলা হয়।

** যদি 'ইসনাদ'-এর মধ্যে একজন কিংবা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যান, তবে সেটাকে 'মুনক্বাত্বি' হাদীস' বলা হয়।

দ্ব'ঈফ (দুর্বল) হচ্ছে ওই হাদীস, যার কোন একজন বর্ণনাকারীও মুত্তাক্বী ও প্রখর স্মরণশক্তি বিশিষ্ট নন। অর্থাৎ যেসব গুণ বা বৈশিষ্ট্য 'সহীহ্ হাদীস'-এর মধ্যে বিবেচিত ছিলো, ওইগুলো থেকে কোন একটি গুণ থাকে না।

নিয়ম নং- ২

প্রথম দু' প্রকার, অর্থাৎ 'সহীহ্' ও 'হাসান' 'আহকাম' (বিধানাবলী) ও 'ফযা-ইল' (ফযীলতসমূহ) উভয়ের মধ্যে গ্রহণযোগ্য; কিন্তু হাদীস-ই দ্ব'ঈফ (দুর্বল হাদীস) শুধু ফযীলতসমূহের মধ্যে গ্রহণযোগ্য; 'আহকাম' (বিধানাবলী)-এ গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ তা দ্বারা হালাল কিংবা হারাম প্রমাণিত হবে না। অবশ্য, আমলসমূহ অথবা কারো মহত্ব ও ফযীলত প্রমাণিত হতে পারে।

ফলশ্রুতি

'দ্ব'ঈফ' বা দুর্বল হাদীস মিথ্যা, ভুল ও বানোয়াট হাদীসকে বলা হয় না, যেমনটি গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী)গণ সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দিয়েছে; ফলে লোকেরাও সেটাকে গলধকরণ করে রেখেছে, বুঝে বসেছে; বরং মুহাদ্দিসগণ নিছক সতর্কতার ভিত্তিতে এ হাদীসের মর্যাদাকে প্রথম দু' প্রকারের হাদীস থেকে কিছুটা কম রেখেছেন।

নিয়ম নং-৩

যদি 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল) হাদীস কোন কারণে 'হাসান' পর্যায়ের হয়ে যায়, তবে সেটাও নিঃশর্তভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে যায়। তখন তা দ্বারা 'আহকাম' ও 'ফযাইল' সবই প্রমাণিত হতে পারে।

নিয়ম নং-৪

নিম্নলিখিত বস্তুগুলোর মাধ্যমে 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল) হাদীস 'হাসান' পর্যায়ের হয়ে যায়:

১. দুই কিংবা ততোধিক সনদে বর্ণিত হওয়া; যদিও ওই সনদগুলোও দুর্বল (দ্ব'ঈফ) হয়। অর্থাৎ যদি একটি হাদীস কয়েকটা দুর্বল সনদেও বর্ণিত হয়ে যায়, তবে তখন সেটা আর দ্ব'ঈফ বা দুর্বল থাকে না; 'হাসান' পর্যায়ের হয়ে যায়।

[সূত্র. মিরক্বাত, মওদূ'আত-ই কবীর; শামী, মুক্বাদ্দামা-ই মিশকাত শরীফ, কৃত. মাওলানা আব্দুল হক্ব, রিসালাহ্-ই উসূল-ই হাদীস, কৃত, আল্লামা জুরজানী, তিরমিযী শরীফ প্রথম খন্ড ইত্যাদি]

২. কামিল আলিমদের আমল দ্বারা দ্ব'ঈফ হাদীস 'হাসান' হয়ে যায়। অর্থাৎ যদি দ্ব'ঈফ হাদীস অনুসারে ওলামা-ই দ্বীন আমল করতে আরম্ভ করেন, তবে তা 'দ্ব'ঈফ' থাকেনা, 'হাসান' হয়ে যায়। এজন্য ইমাম তিরমিযী বলেছেন-

هٰذَا الْحَدِيْثُ غَرِيْبٌ ضَعِيْفٌ وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ

অর্থাৎ এ হাদীস তো 'গরীব' অথবা 'দ্ব'ঈফ'; কিন্তু বিজ্ঞ আলিমদের এটা অনুসারে আমল রয়েছে।

ইমাম তিরমিযীর এ কথার মর্মার্থ এ নয় যে, 'এ হাদীস 'দ্ব'ঈফ, আমলযোগ্য নয়; কিন্তু উম্মতের বিজ্ঞ আলিমগণ বোকামী করে তদনুসারে আমল করে ফেলেছেন এবং সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন' বরং মর্মার্থ এ যে, হাদীসটি 'সনদ' অনুসারে দুর্বল ছিলো; কিন্তু উম্মতের বিজ্ঞ আলিমদের আমল দ্বারা শক্তিশালী হয়ে গেছে।

৩. আলিমদের অভিজ্ঞতা ও ওলীগণের কাশ্‌ফ দ্বারা 'দ্ব'ঈফ হাদীস' শক্তিশালী হয়ে যায়। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনুল আরবী একটি হাদীস শুনেছিলেন- 'যে ব্যক্তি সত্তর হাজার বার কলেমা তাইয়্যেবাহ্ পাঠ করবে তার মাগফিরাত হয়ে যাবে।' একবার এক যুবক বললো, ''আমি আমার মারহুম মাকে দোযখে দেখতে পাচ্ছি।'' শায়খ সত্তর হাজার বার কলেমা তৈয়্যবাহ্ পড়ে রেখেছিলেন। তিনি মনে মনে ওই কলেমাগুলো তার মাকে দান করে দিলেন। তিনি দেখলেন যুবকটি তখনই হেসে উঠলো আর বললো, ''আমি আমার মাকে জান্নাতে দেখতে পাচ্ছি।'' হযরত শায়খ বলেছেন, ''আমি এ হাদীসের 'সহীহ্ হওয়া' এ ওলীর কাশ্‌ফ থেকে জানতে পেরেছি।'' (সহীহুল বিহারী) মাওলানা মুহাম্মদ ক্বাসেম নানূতবী তার লিখিত কিতাব 'তাহযীরুন্নাস'-এ এ ঘটনা হযরত জুনায়দ রাহমাতুল্লাহির বলে উল্লেখ করেছেন।

নিয়ম নং-৫

সনদ 'দুর্বল' হলে হাদীসের মতন (বচনগুলো) দুর্বল হওয়া অপরিহার্য হয় না। সুতরাং এমনটিও যে, এক হাদীস এক সনদে 'দুর্বল' হলেও অন্য সনদে 'হাসান' হতে পারে আর তৃতীয় সনদে 'সহীহ্'ও হতে পারে। এ কারণে ইমাম তিরমিযী এক হাদীস সম্পর্কে বলেছেন-هٰذَا الْحَدِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ (অর্থাৎ এ হাদীস হাসান, সহীহ্, গরীব)। ইমাম তিরমিযীর এ কথার মর্মার্থ হচ্ছে- এ হাদীস কয়েকটা সনদে বর্ণিত। এক সনদে 'হাসান', দ্বিতীয় সনদে 'সহীহ্' এবং তৃতীয় সনদে 'গরীব'।

নিয়ম নং-৬

পরবর্তী বর্ণনাকারীর দুর্বলতা পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস কিংবা মুজতাহিদদের জন্য ক্ষতিকারক নয়। সুতরাং যদি এক হাদীস ইমাম বোখারী কিংবা তিরমিযী 'দ্ব'ঈফ' হিসেবে পেয়েছেন, কেননা, তাতে এক বর্ণনাকারী 'দ্ব'ঈফ' অন্তর্ভুক্ত হয়ে

গেছেন। তখন হতে পারে ওই হাদীসকে ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি সহীহ্ সনদে পেয়েছেন। তাঁর যুগ পর্যন্ত ওই দুর্বল বর্ণনাকারী সেটার সনদে অন্তর্ভুক্ত হননি। সুতরাং কোন ওহাবীর পক্ষে একথা প্রমাণ করা সহজ নয় যে, ইমাম আ'যমও এ হাদীসকে 'দুর্বল' হিসেবে পেয়েছেন।

মজার কথা

একদা এক ওহাবী গায়র মুক্বাল্লিদের সাথে 'ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়া' বিষয়ে আমার মা'মুলী বিতর্ক হলো। আমি নিম্নলিখিত হাদীস পেশ করলাম- قِرَاءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ (ইমামের ক্বিরাআত মুক্বতাদীর ক্বিরাআত)। ওহাবীটা বললো, ''এ হাদীস 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল)। সেটার সনদে 'জাবির জুহানী' আছে; যিনি দ্ব'ঈফ' (দুর্বল)।'' আমি বললাম, ''জাবির জুহানী কখন জন্মগ্রহণ করেছেন, যার কারণে এ হাদীস দুর্বল হলো?'' সে লাফিয়ে ওঠে বললো, ''৩৩৫হিজরীতে।'' আমি বললাম, ''যখন ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছিলেন, তখন জাবির তার পিতার পৃষ্ঠদেশেও আসেননি। কেননা, ইমামে আ'যমের জন্ম হয়েছে ৮০ হিজরিতে আর ওফাত হয়েছে ১৫০ হিজরিতে। সুতরাং তখন এ হাদীস শরীফ একেবারে সহীহ্ ছিলো। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ সেটাকে দ্ব'ঈফ (দুর্বল) হিসেবে পেয়েছেন।'' ওহাবীটা এর কোন জবাব দিতে পারে নি। জবাব না দিয়েই মারা গেছে।

সুতরাং হানাফী আলিমদের একথা মনে রাখা দরকার যে, তাঁরা যেন ওহাবীদেরকে 'দ্ব'ঈফ' 'দ্ব'ঈফ' বলা থেকে রুখে দেন, দুর্বলতার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, তারপর এর উপর গবেষণা করেন যে, দুর্বলতা ইমাম আ'যমের পূর্বেকার, না পরবর্তীর? ইনশা-আল্লাহ্, ওহাবীজ্বী পানি চেয়ে বসবে এবং 'দ্ব'ঈফ, 'দ্ব'ঈফ' বলার সবক ভুলে যাবে। কেননা, ইমামে আ'যমের যুগ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম- এর যুগের একেবার কাছে। ওই সময় হাদীস খুব কম 'দ্ব'ঈফ' ছিলো। ইমামে আ'যম হলেন তাবে'ঈ।

নিয়ম নং-৭

'জরহে মুবহাম' (অনির্দিষ্ট ত্রুটিনির্ণয়) গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ হাদীসের কোন সমালোচক, বিশেষতঃ ইবনে জূযী প্রমুখের একথা বলে ফেলা যে, 'অমুখ হাদীস অথবা বর্ণনাকারী দুর্বল, অনির্ভরযোগ্য' যতক্ষণ পর্যন্ত একথা বলেন না কেন

দুর্বল? এবং ওই বর্ণনাকারীর কি দুর্বলতা আছে? কেননা, দুর্বলতার কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইমামগণের মতবিরোধ থাকে। একটা বিষয়কে কোন মুহাদ্দিস দোষ মনে করেন, অন্যজন তা দোষ মনে করেন না। দেখুন 'তাদলীস', 'ইরসাল', ঘোড়া দৌড়ানো, ঠাট্টা-মযাক করা, অল্প বয়স্ক হওয়া ও ফিক্বহ্ নিয়ে মগ্ন থাকাকে কোন কোন মুহাদ্দিস বর্ণনাকারীর দোষ হিসেবে বিবেচনা করেন; কিন্তু হানাফী ইমামগণের মতে ওইগুলোর মধ্যে কোনটাই দোষ নয়।

[নূরুল আন্ওয়ার: হাদীসের সমালোচনা শীর্ষক আলোচনা]

নিয়ম নং-৮.

যদি জরহ্ ও তা'দীল (যথাক্রমে, পরস্পর বিরোধ নির্ণয় ও উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান)-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, তবে তা'দীল-ই গ্রহণযোগ্য, 'পরস্পর বিরোধ' নয়। অর্থাৎ এক বর্ণনাকারীকে কোন মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন, অন্য কেউ শক্তিশালী বা গ্রহণযোগ্য বলেছেন; কোন ইতিহাস দ্বারা তাঁর পাপাচারিতা প্রমাণিত হলো, আর অন্য কেউ বললেন, তিনি মুত্তাক্বী, সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁকে মুত্তাক্বী (খোদাভীরু) বলে বিবেচনা করা হবে এবং তাঁর বর্ণনা দুর্বল হবে না। কেননা, মু'মিনের মধ্যে তাক্বওয়া থাকাই আসল বা মূল কথা।

নিয়ম নং-৯

কোন হাদীস সহীহ্ না হলে, সেটা দুর্বল হওয়া অনিবার্য হয় না। সুতরাং যদি কোন মুহাদ্দিস কোন হাদীস সম্পর্কে একথা বলে ফেলেন, "এটা সহীহ্ নয়" সেটার অর্থ এ নয় যে, সেটা দুর্বল। হতে পারে যে, ওই হাদীস 'হাসান'। 'সহীহ্' ও 'দ্ব'ঈফ'-এর মধ্যবর্তীতে অনেক স্তর রয়েছে।

নিয়ম নং-১০

সহীহ্ হাদীসের ভিত্তি মুসলিম, বোখারী কিংবা সিহাহ্ সিত্তার* উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সিহাহ্ সিত্তাহকে সহীহ্ বলার মর্মার্থ-এ নয় যে, সেগুলোর সমস্ত হাদীসই সহীহ্, ওইগুলো ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের সমস্ত হাদীস 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল); বরং মর্মার্থ শুধু এটাই যে,

* সেহাহ্ সিত্তাহ্

হাদীসের ছয়টি কিতাবকে 'সেহাহ্ সিত্তাহ্' বলা হয়: বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্। হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবের সংখ্যা সর্বমোট পঞ্চাশ অপেক্ষাও বেশি; মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে ইমাম আবূ হানীফা, মুআত্তা-ই ইমাম মালিক, বায়হাক্বী, দারেমী, দারু কুত্বনী ও হাকিম ইত্যাদিও ওইগুলোর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম বোখারীর নাম শরীফ 'মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল'। তাঁর জন্ম ১৯৪ হিজরীতে হয়েছে, অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ওফাতের ৪৪ বছর পর। কেননা, ইমামে আ'যমের ওফাত হয়েছে ১৫০ হিজরীতে।

ওইগুলোর মধ্যে সহীহ্ হাদীস বেশী। আমাদের ঈমান হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর রয়েছে; নিছক বোখারী, মুসলিম ইত্যাদির উপর নয়; হুযূর-ই আক্রামের হাদীস যেখান থেকেই পাওয়া যাক, তা আমাদের মাথা ও চোখের উপর; তা বোখারীতে থাকুক, কিংবা না-ই থাকুক।

আশ্চর্যবোধ হয় গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী)-দের উপর! তারা ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর তাক্বলীদ করাকে শির্ক সাব্যস্ত করে; কিন্তু মুসলিম ও বোখারীর উপর এমনভাবে ঈমান রাখে এবং তাঁদের এমন অন্ধ তাক্বলীদ বা অনুসরণ করে যে, আল্লাহরই পানাহ্!

নিয়ম নং-১১.

কোন বিজ্ঞ আলিম ফক্বীহ্ মুহাদ্দিসের কোন হাদীসকে কোনরূপ আপত্তি ছাড়া গ্রহণ করে নেওয়া ওই হাদীস শক্তিশালী হবার প্রমাণ। যদি কোন ফক্বীহ্ আলিম মুজতাহিদ কোন দ্ব'ঈফ হাদীসকে ক্বূল করে নেন, তবে তা দ্বারা ওই দুর্বল হাদীস শক্তিশালী হয়ে যায়। ওয়ালী উদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ খতীব তারবীযী, মিশকাত শরীফের প্রণেতা মহোদয় মিশকাত শরীফের ভূমিকায় লিখেছেন-

وَاِنِّىْ اِذَا اَسْنَدْتُّ الْحَدِيْثَ اِلَيْهِمْ كَاَنِّىْ اَسْنَدْتُّ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: আমি যখন হাদীসকে ওইসব মুহাদ্দিসের দিকে সম্পৃক্ত করেছি, তখন যেন সেটাকে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করেছি।

এসব নিয়ম থেকে আপনারা হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যেসব হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন, সেগুলোর কোনটা দুর্বল হতে পারে না। কারণ, সেগুলো অনুসারে উম্মতের আমল রয়েছে। সেগুলোকে বিজ্ঞ আলিম ও ফক্বীহ্গণ গ্রহণ করে নিয়েছেন। ওইগুলোর প্রতিটি হাদীস অনেক সনদে বর্ণিত হয়েছে। আমি অধম, আল্লাহর মুখাপেক্ষী, ইনশা-আল্লাহ্, প্রত্যেক মাসআলার পক্ষে অনেক হাদীস পেশ করবো, যেগুলো থেকে কোন হাদীসকে দুর্বল (দ্ব'ঈফ) বলা যেতে পারে না, কেননা, সনদগুলোর আধিক্য 'দ্ব'ঈফ'কেও 'হাসান' করে দেয়।

নিয়ম নং-১২

যদি হাদীস ও ক্বোরআনের মধ্যে দ্বন্দ্ব দৃষ্টিগোচর হয়, তবে হাদীসের অর্থ এভাবে করা চাই যেন উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে যায়, দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যায়। অনুরূপ যদি হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী বলে মনে হয়, তবে সেগুলোর এমন অর্থ করা

দরকার, যেন বিরোধ না থাকে এবং সবকটি অনুসারে আমল করা যায়। এর উদাহরণ হচ্ছে এ-ই, মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن **তরজমা:** যে পরিমাণ ক্বোরআন মজীদ সহজ হয় ততটুকু নামাযে পড়ে নাও। কিন্তু হাদীস শরীফে শরীফে আছে- لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ **অর্থ:** যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামায হয়নি।

এ হাদীসকে ওই আয়াতের বিরোধী বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং হাদীসের অর্থ এভাবে করো- 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না।' যে কোন ক্বিরাআত (مطلقا) নামাযে ফরয। আর সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। সুতরাং পারস্পরিক বিরোধ দূর হয়ে গেলো। আর ক্বোরআন ও হাদীস উভয়টি অনুসারে আমলও হয়ে গেলো। অনুরূপ, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমায়েছেন- وَاِذَا قُرِءَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا **তরজমা:** যখন ক্বোরআন পাঠ করা হয়, তখন তা কান লাগিয়ে শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো। কিন্তু হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ **অর্থ:** যে সূরা ফাতিহা পড়ে না, তার নামায হয় না।

এ হাদীসকে ও-ই আয়াতের বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। কারণ, ক্বোরআন নিঃশর্তভাবে (সম্পূর্ণ) নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দিচ্ছে। আর হাদীস শরীফ মুক্বতাদীকে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ দিচ্ছে। সুতরাং এটা মেনে নাও যে, 'ক্বোরআনের হুকুম শর্তহীন (مطلق) আর হাদীস শরীফের হুকুম একাকী নামায সম্পন্নকারী অথবা ইমামের জন্য প্রযোজ্য।' মুক্বতাদীদের জন্য ইমামের ক্বিরাআত যথেষ্ট; অর্থাৎ এটা তার জন্য ক্বিরাআত বলে বিবেচ্য হবে। মোটকথা, এ নিয়ম অতি গুরুত্বপূর্ণ। আর যদি কোন হাদীসকে ক্বোরআনের আয়াতের অথবা এর পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের এমন বিরোধী হিসেবে পাওয়া যায় যে, কোনভাবেই সামঞ্জস্য হতে পারছে না, তখন ক্বোরআন-ই করীম অথবা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাদীসকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর এ হাদীস অনুসারে আমল করা যাবে না; এ হাদীসকে 'মানসূখ' (রহিত) বলে ধরে নিতে হবে। অথবা সেটাকে হুযূর-ই আক্বরামের বিশেষত্বের মধ্যে গণ্য করতে হবে। এর বহু উদাহরণও রয়েছে।

নিয়ম নং ১৩.

হাদীস শরীফ দুর্বল হয়ে যাওয়া গায়র মুক্বাল্লিদদের জন্য ক্বিয়ামত তুল্য। কেননা, তাদের মাযহাবের ভিত্তি ওই বর্ণনাগুলোর উপরই প্রতিষ্ঠিত। বর্ণনা (হাদীস) দুর্বল হলে তো তাদের মাসআলাও বিলীন হয়ে গেলো; কিন্তু তা হানাফীদের জন্য কোন

মতে ক্ষতিকর নয়; কেননা, হানাফীদের দলীল এ বর্ণনাগুলো নয়; তাঁদের দলীল হচ্ছে শুধু ইমামেরই অভিমত। ইমামের অভিমতের সমর্থক হচ্ছে- এ বর্ণনাগুলো। অবশ্য ইমামের দলীল হচ্ছে ক্বোরআন ও হাদীস। কিন্তু ইমাম সাহেব যখন হাদীসগুলো পেয়েছেন, তখন তো সেগুলো সহীহ্ ছিলো; কারণ, সেগুলোর সনদ এগুলো ছিলোনা, যেগুলো ইমাম বোখারী ও মুসলিমেরই রয়েছে। যদি পুলিশ অপরাধীকে জেলে পুরে দেয়, তবে পুলিশের দলীল হয় হাকিমের রায়; পাক-বাংলা-ভারতের দন্ডবিধির ধারাগুলো নয়। অবশ্য হাকিমের দলীল কিন্তু এ ধারাগুলো। এ কথা স্মরণ রাখো। 'তাক্বলীদ' হচ্ছে আল্লাহ্র রহমত। আর গায়র মুক্বাল্লিদ হওয়া মহান রবের আযাবই। [মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আলায়হির রাহমাহ্]

---o---

প্রথম অধ্যায়

[তাকবীর-ই তাহরীমার সময় উভয় কান পর্যন্ত দু' হাত উঠানোর বিধান]

তাকবীর-ই তাহরীমার সময় উভয় কান পর্যন্ত দু' হাত উঠানোর বিধান

নামাযে তাকবীর-ই তাহরীমার সময় পুরুষদের জন্য উভয় কান পর্যন্ত দু' হাত উঠানো সুন্নাত; কিন্তু ওহাবী গায়র-মুকাল্লিদগণ মেয়েলোকদের মতো কাঁধ দু'টি বৃদ্ধাঙ্গুলি যুগল দ্বারা স্পর্শ করে বুকের উপর হাত বাঁধে।* অথচ পুরুষের জন্য হাত কান পর্যন্ত তুলে নাভীর নিচে বাঁধাই সুন্নাত। তাই প্রথমে কান পর্যন্ত হাত উঠানোর মাসআলাটা সপ্রমাণ উল্লেখ করে এরপর নাভীর নিচে হাত বাঁধার মাসআলাটা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো- ইন্‌শা-আল্লাহ্! সুতরাং আমি এ অধ্যায়ের দু'টি পরিচ্ছেদ করছি- প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের হানাফী মাযহাবের দলীলাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লা-মাযহাবীদের বিভিন্ন আপত্তি ও সেগুলোর খণ্ডণ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কান পর্যন্ত হাত উঠানোর পক্ষে অনেক হাদীস শরীফ রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটা মাত্র নিম্নে পেশ করছি-

হাদীস নম্বর ১-৩

সর্বইমাম বোখারী, মুসলিম ও ত্বাহাভী হযরত মালিক ইবনে হুয়ায়রিস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ اُذُنَيْهِ وَفِيْ لَفْظٍ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ-

অর্থঃ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন তাকবীর বলতেন, তখন আপন দু'হাত মুবারক তাঁর উভয় কান পর্যন্ত উঠাতেন। অন্য বচনে এভাবে আছে- উভয় কানের লতি পর্যন্ত উঠাতেন।

---

* আলবানীর পুস্তিকা তথাকথিত 'সহীহ ছালাত'-এর ৪র্থ মাসআলা হচ্ছে- তাকবীর-ই তাহরীমারসময় হাত কাঁধ কিংবা কান বরাবর উঠিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে বুকের উপর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখতে হবে। [পৃষ্ঠা -৪] এ অধ্যায়ে তার খন্ডন রয়েছে।

হাদীস নম্বর-৪

আবূ দাঊদ শরীফে হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ-

অর্থঃ আমি হুযূর-ই আনওয়ারকে দেখেছি যে, যখন তিনি নামায আরম্ভ করতেন তখন নিজের দু' হাত মুবারক উভয় কানের নিকট পর্যন্ত উঠাতেন। এর পর আর হাত উঠাতেন না। (রফ'ই ইয়াদাঈন করতেন না)।

হাদীস নম্বর-৫

মুসলিম শরীফে হযরত ওয়া-ইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে-

اَنَّهٗ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ قَالَ اَحَدُ الرُّوَاةِ حِيَالَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهٖ -

অর্থঃ তিনি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে, হুযূর যখন নামাযে প্রবেশ করেছেন তখন আপন দু'হাত মুবারক উঠিয়েছেন। আর তাকবীর বলেছেন। এক বর্ণনাকারী বলেছেন, আপন দু'কানের বরাবর, তারপর আপন কাপড়ে দু'হাত গোপন করে (ঢেকে) নিয়েছেন।

হাদীস নম্বর- ৬-৮

বোখারী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ হযরত আবূ ক্বালাবাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ مَالِكَ بْنَ حُوَيْرِثٍ رَاَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ -

অর্থঃ হযরত মালিক ইবনে হুয়াইরিস নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, তিনি উভয় হাত মুবারক উঠাতেন যখন তাকবীর-ই তাহরীমাহ্ বলতেন আর যখন রুকূ' থেকে শির মুবারক উঠাতেন এ পর্যন্ত যে, তখন উভয় হাত মুবারক উভয় কানের লতি মুবারক পর্যন্ত পৌঁছে যেতো।

হাদীস নম্বর- ৯-১২

সর্ব ইমাম আহমদ, ইসহাক্ব ইবনে রাহ্ওয়াইহ্, দারু ক্বুত্বনী ও ত্বাহাভী হযরত বারা ইবনে 'আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا بِحِذَاءِ اُذُنَيْهِ-

অর্থঃ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন, তখন এ পর্যন্ত উভয় হাত মুবারক উঠাতেন যে, তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী যুগল উভয় কান মুবারকের বরাবর হয়ে যেতো।

হাদীস নম্বর- ১৩-১৫

সর্ব ইমাম হাকিম মুস্তাদ্রাকে, দারু ক্বুতনী এবং বায়হাক্বী অত্যন্ত বিশুদ্ধ সনদে, যা ইমাম বোখারীও বোখারী শরীফের শর্তাবলীর অনুরূপ, হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فَحَاذٰى بِاِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ-

অর্থঃ আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি তাকবীর বললেন আর আপন উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী শরীফ আপন উভয় কান মুবারকের বরাবর করে নিয়েছেন।

হাদীস নম্বর-১৬-১৭

ইমাম আবদুর রায্যাক্ব ও ইমাম তাহাভী হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَبَّرَ لِافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَكُوْنَ اِبْهَامَاهُ قَرِيْبًا مِنْ شَحْمَةِ اُذُنَيْهِ-

অর্থঃ যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায আরম্ভ করার জন্য তাকবীর বলতেন, তখন এ পর্যন্ত হাত শরীফ উঠাতেন যে, তাঁর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী শরীফ উভয় কান মুবারকের লতির বরাবর হয়ে যেতো।

হাদীস নম্বর-১৮

ইমাম আবূ দাঊদ হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى كَانَتَا بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذٰى بِاِبْهَامَيْهِ اُذُنَيْهِ-

অর্থঃ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উভয় হাত মুবারক উঠালেন এ পর্যন্ত যে, উভয় হাত শরীফ তো উভয় স্কন্ধের এবং উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলী শরীফ উভয় কান মুবারকের বরাবর হয়েছিলো।

হাদীস নম্বর-১৯

দারু কুত্বনী হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّهٗ رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذٰى بِهِمَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ اِلٰى شَيْءٍ مِنْ ذَالِكَ حَتّٰى فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهٖ-

অর্থ: তিনি হুযূর-ই আকরামকে দেখলেন যখন তিনি নামায আরম্ভ করেছেন, তখন আপন হাত মুবারক উঠালেন এ পর্যন্ত যে, ওই দু'টিকে উভয় কান মুবারকের বরাবর করে নিয়েছেন। তারপর নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত আর হাত উঠাননি।

হাদীস নম্বর-২০

ত্বাহাভী শরীফে হযরত আবূ হুমায়দ সা-'ইদী থেকে বর্ণনা করা হয়েছে-

اَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ لِاَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذَاءَ وَجْهِهٖ-

অর্থ: তিনি হুযূর-ই আকরামের সাহাবীদেরকে বলতেন, তোমাদের সবার চেয়ে আমি হুযূর-ই আকরামের নামায সম্পর্কে বেশী জানি। তিনি যখন নামাযে দণ্ডায়মান হতেন, তখন তাকবীর বলতেন আর আপন দু' হাত মুবারক চেহারা শরীফের বরাবর পর্যন্ত উঠাতেন।

কান পর্যন্ত হাত উঠানোর পক্ষে আরো বহু হাদীস শরীফ পেশ করা যেতে পারে। এখানে মাত্র বিশটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করলাম। যদি আরো বেশী চান, তাহলে হাদীস শরীফের কিতাবাদি, বিশেষ করে 'সহীহুল বিহারী শরীফ' পর্যালোচনা করুন। কারণ, সেটার মতো কিতাব হানাফী মাযহাবের সমর্থনে 'জা-মি'ই আহা-দীস' (হাদীস সম্ভার) রূপে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি।

যুক্তিগত দলীলাদি

যুক্তি (আক্বল)ও চাচ্ছে যে, নামায আরম্ভ করার সময় উভয় কান পর্যন্ত উভয় হাত উঠানো হোক। কেননা, মুসল্লী নামায আরম্ভ করার সময় ইবাদতে মশগুল হয় এবং দুনিয়াবী ঝগড়া-বিবাদ থেকে পৃথক ও সম্পর্কহীন হয়ে যায়। পানাহার, কথাবার্তা, এদিক-ওদিক দেখা, সব কিছু নিজের উপর হারাম করে নেয়। সে যেন দুনিয়া থেকে বের হয়ে ঊর্ধ্ব জগতে ভ্রমণ করে। ওরফে, যখন কোন জিনিষ থেকে তাওবা কিংবা পৃথক করানো হয়, তখন কানগুলোতে হাত রাখানো হয়, কাঁধ ধরানো হয় না। নামাযীও যেন মুখে (তাকবীর বলে) নামায শুরু করে, আর কাজে কানগুলোতে হাত রেখে দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে থাকে। এমন সময় কাঁধ

ধরা একেবারেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। যেমন সাজদায় মুসলমান মুখেতো মহান রবের মহত্ব ও বড়ত্বের কথা স্বীকার করে, আর ভূ-পৃষ্ঠের উপর মাথা রেখে নিজের অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ করে, তেমনি নামায শুরু করার সময় একাংশের স্বীকার মুখে করা হয়; অপর অংশের প্রকাশ আমল (কর্ম) দ্বারা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খণ্ডন

এ মাসআলায় গায়র মুক্বাল্লিদ (মাযহাব অমান্যকারী)দের দু'টি আপত্তি রয়েছে, যে দু'টি আপত্তি তারা সর্বত্র পেশ করে থাকে-

প্রথম আপত্তি

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবূ হুমায়দ সা-'ইদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে একটা বচন এমন আছে যে- اِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذَاءَ مَنْكِبَيْهِ- অর্থাৎ হুযূর-ই আকরাম যখন তাকবীর বলতেন, তখন আপন হাত শরীফ স্কন্ধযুগলের বরাবর করে নিতেন। বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে এ বচনগুলো উদ্ধৃত করেছেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

অর্থ: রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন দু' হাত মুবারক স্বীয় স্কন্ধ যুগলের বরাবর করে নিতেন।

এ হাদীস শরীফ অনেক সনদ দ্বারা বর্ণিত। বুঝা গেলো যে, স্কন্ধযুগল পর্যন্ত হাত উঠানো সুন্নাত। আর কর্ণযুগল পর্যন্ত উঠানো সুন্নাতের পরিপন্থী।

খণ্ডন

এ হাদীসগুলো হানাফী মাযহাবের মোটেই বিরোধী নয়। কেননা, কানের সাথে বৃদ্ধাঙ্গুলী লাগালে হাত দু'টি কাঁধের সমান (বরবার)ই হয়ে যাবে এবং উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যাবে। কিন্তু কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠিয়ে কাঁধকে স্পর্শ করার মধ্যে ওই সব হাদীসের উপর আমল করা হয় না, যেগুলোতে কান পর্যন্ত হাত উঠাতেন মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে। হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা উভয় প্রকারের হাদীসের উপর আমল করে থাকেন। আর ওহাবী লা-মাযহাবীরা এক প্রকারের হাদীসকে ছেড়ে

দেয়। সুতরাং হানাফী মাযহাব ব্যাপকতর; বরং হাদীস নম্বর ১৮তে এর স্পষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে- হুযুর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাত শরীফ এভাবে উঠাতেন যে, হাত শরীফ তো স্কন্ধযুগল পর্যন্ত থাকতো, বৃদ্ধাঙ্গুলী দু'টি থাকতো কান পর্যন্ত। সুতরাং না হাদীস শরীফগুলো পরস্পর বিরোধী, না ওই দু'ধরনের হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব। শুধু তোমাদের বুঝা ও অনুধাবনের মধ্যে হেরফের হয়েছে।

সমস্ত গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী, আহলে হাদীস ও সালাফী)'র প্রতি সাধারণ ঘোষণা রইলো- এমন কোন মারফূ' (সরাসরি হুযূর-ই আকরামের সূত্রে বর্ণিত হাদীস শরীফ) দেখান, যা'তে একথা রয়েছে যে, হুযূর-ই আকরাম আপন বৃদ্ধাঙ্গুলী শরীফ দু'টি কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। যেখানেই কাঁধগুলোর কথা আছে, ওখানে তো হাত শরীফ এরশাদ হয়েছে, আর যেখানে কানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে বৃদ্ধাঙ্গুলী শরীফ বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায় যে, উভয় কাঁধ পর্যন্ত হাত এভাবে উঠাতেন যে, বৃদ্ধাঙ্গুলী শরীফ কান শরীফ পর্যন্ত পৌঁছে যেতো।

দ্বিতীয় আপত্তি

কান পর্যন্ত হাত শরীফ উঠাতেন মর্মে যেসব হাদীস শরীফ আপনারা (সুন্নী হানাফী মুসলমানগণ) পেশ করেছেন, সবকটি 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল)। সুতরাং সেগুলো আমলযোগ্য নয়।

খণ্ডন

এ আপত্তির কয়েকটা জবাব দেওয়া যেতে পারে-

এক. ওহাবী গায়র মুকাল্লিদগণ তাদের অভ্যাসের গোলাম। তাদের অভ্যাস হচ্ছে তাদের বিপক্ষে যে সব হাদীস আছে সবকটিকে তারা বিনা কারণে 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল) বলে বসে। (এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।)

দুই. আমরা এ পরম্পরায় বোখারী ও মুসলিমের হাদীসও উল্লেখ করেছি। ওইগুলোর উপর তো তোমাদের পাকাপোক্ত ঈমান থাকার কথা। (সুতরাং ওইগুলো মেনে নাও।)

তিন. 'দ্ব'ঈফ' হাদীসও যখন কয়েকটা সূত্রে (সনদ) বর্ণিত হয়, তখন তা শক্তিশালী ও 'হাসান' পর্যায়ের হাদীস হয়ে যায়। দুর্বল খড়কুটাগুলোও পরস্পর মিলে মজবুত রশি হয়ে যায়। সুতরাং একাধিক দুর্বল সনদ হাদীসের মতন

(বচন)কে কেন মজবুত করবে না? এ কিতাব 'জা-আল হক'ঃ ২য় খণ্ডের ভূমিকাটা দেখুন! (সেটা পাঠ-পর্যালোচনা করলে এ সম্পর্কে ভুল অবশ্যই ভাঙ্গবে।)

চার. আমাদের উপস্থাপিত এ হাদীসগুলো অনুসারে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিজ্ঞ আলিম, ওলী ও নেক্কার ব্যক্তিবর্গ আমল করেছেন। উম্মতের আমলের কারণেও দুর্বল হাদীস শক্তিশালী হয়ে যায়।

পাঁচ. যদি এ হাদীসগুলো (তোমাদের কথা মতো) দুর্বলও হয়, তবুও ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতো ইমাম সেগুলো গ্রহণ করেছেন। এটাও তো ওইগুলোকে শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য করে দেয়। কেননা, নেক্কার এবং যোগ্য আলিম গ্রহণ করলেও দুর্বল হাদীস শক্তিশালী হয়ে যায়।

ছয়. নির্বিচারে ওইসব হাদীসকে আপনাদের 'দুর্বল' বলে ফেলাকে 'জরহে মজহুল' (অজ্ঞাত কারণে সমালোচনা করা) বলা হয়, যা কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তাতে দুর্বল হবার কোন কারণ বলা হয়নি, বলা হয়নি সেগুলো কি কারণে দুর্বল?

সাত. যদি (পরবর্তী) মুহাদ্দিসগণ উক্ত হাদীস শরীফগুলো দুর্বল হিসেবে পান, তবে তা ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। কারণ, তাঁর সমসাময়িক যুগে কোন দুর্বল বর্ণনাকারী হাদীসের সনদগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পরবর্তী যুগের দুর্বলতা পূর্ববর্তীদের জন্য ক্ষতিকারক নয়। সুতরাং সালাফী-ওহাবী প্রমুখের আশাপ্রদ আপত্তিটাও টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেলো। আল্‌হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

---o---

দ্বিতীয় অধ্যায়

[নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত (পুরুষের জন্য)]

নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত (পুরুষের জন্য)

গায়র মুক্বাল্লিদ-ওহাবীরা নামাযের তাকবীর-ই তাহরীমার পর বুকের উপর, নাভীর উপরে হাত বাঁধে। এর খণ্ডনে আমি এ মাসআলার আলোচনা দু'টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের দলীলাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওহাবী লা-মাযহাবীদের আপত্তি ও সেগুলোর জবাব (খণ্ডন) উল্লেখ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুরুষগণ নামাযে নাভীর নিচে হাত বাঁধবে। এটা সুন্নাত। বুকের উপর হাত বাঁধা সুন্নাতের পরিপন্থী। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমি মাত্র কয়েকটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

হাদীস নম্বর - ১

عَنْ وَائِل بْن حُجْر قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِيْنَه عَلَى شِمَالِه تَحْتَ السُّرَّةِ - رَوَاهُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ بِمُسْنَدٍ صَحِيْحٍ وَرِجَالُه ثِقَاتٌ-

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি ডান হাত মুবারক বাম হাত মুবারকের উপর রেখেছেন নাভী শরীফের নিচে।

এ হাদীস শরীফ ইবনে আবী শায়বাহ্ সহীহ্ সনদ সহকারে উদ্ধৃত করেছেন। এর সব বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

হাদীস নম্বর - ২

ইবনে শাহীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ ثَلَاثٌ مِّنْ اَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ تَعْجِيْلُ الْاِفْطَارِ وَتَاْخِيْرُ السُّحُوْرِ وَوَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ-

অর্থ: তিনটি কাজ নুবূওয়তের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত: ১. (বিলম্ব না করে) শীঘ্র ইফতার করা, ২. সাহরী দেরীতে আহার করা এবং ৩. নামাযে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখা।

হাদীস নম্বর- ৩

আবূ দাউদ শরীফ: ইবনে আ'রাবীর কপিতে, হযরত আবূ ওয়াইল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ اَبُوْ وَائِلٍ اَخُذُالْ كَفٌّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

অর্থ: হযরত আবূ ওয়া-ইল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- নামাযে নাভীর নিচে হাতের উপর হাত রাখা চাই।

হাদীস নম্বর -৪ ও ৫

দারু কুত্বনী ও আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِى الصَّلٰوةِ وَضْعِ الْكَفِّ وَفِى رَوَايَةٍ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

অর্থ: নামাযে হাতের উপর হাত রাখা, অন্য এক বর্ণনায় আছে - ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা, নাভীর নিচে, সুন্নাত।

হাদীস নম্বর- ৬-৯

আবূ দাউদ ইবনে আ'রাবীর কপিতে, আহমদ, দারু কুত্বনী ও বায়হাক্বী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّهُ قَالَالسُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَّةِ-

অর্থ: নাভীর নিচে হাতের উপর হাত রাখা সুন্নাত।

হাদীস নম্বর- ১০

রাযীন হযরত আবূ হুজায়ফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّ عَلِيًّا قَالَالسُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ-

অর্থ: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, নামাযে হাত বাঁধা সুন্নাত। আর তিনি উভয় হাত নাভীর নিচে রাখতেন।

হাদীস - ১১

ইমাম মুহাম্মদ 'কিতাবুল আসার শরীফ'-এ হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّهُ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى تَحْتَ السُّرَّةِ-

অর্থ: তিনি নিজের ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখতেন।

হাদীস- ১২

ইবনে আবী শায়বাহ্ হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ يَضَعُ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

অর্থ: তিনি বলেন, তিনি আপন ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখেন।

হাদীস- ১৩

ইবনে হাযাম হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّهُ قَالَ مِنْ اَخْلَاقِ النُّبُوَّةِ وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ تَحْتَ السُّرَّةِ-

অর্থ: তিনি বলেন, ডান হাত বাম হাতের উপর নাভীর নিচে রাখা নুবূওয়তের চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস- ১৪

আবূ বকর ইবনে আবী শায়বাহ্ হাজ্জাজ ইবনে হাস্সান থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مُجْلَزٍسَأَلْتُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّهِ يَمِيْنَهُ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِوَيَجْعَلُهُمَا اَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ-اِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرُوَاتُهُكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ-

অর্থ: আমি আবূ মুজলাযকে জিজ্ঞাসা করেছি- তিনি নামাযে হাত কিভাবে রাখেন? তিনি বললেন, তিনি আপন ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখেন- নাভীর নিচে। এ হাদীসের সনদ অতি উত্তম (শক্তিশালী) আর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে আরো বহু হাদীস পেশ করা যায়। এখানে শুধু চৌদ্দটা উল্লেখ করে ক্ষান্ত হলাম। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেখুন- 'সহীহুল বিহারী' ও 'ফাত্হুল ক্বাদীর'-এ।

যুক্তিও চায় যে, নামাযে নাভীর নিচে হাত রাখা হোক! কেননা, গোলাম তার মুনিবের সামনে এভাবেই দণ্ডায়মান হয়। এতে চূড়ান্ত আদব রয়েছে। নামাযে যেহেতু বান্দা মহান রবের দরবারে হাযিরা দেয়, সেহেতু আদব সহকারে দণ্ডায়মান হওয়া চাই। গায়র মুক্বাল্লিদগণ (লা-মাযহাবীরা) যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন বুঝা যায় না যে, তারা কি মসজিদে দাঁড়িয়েছে, না বুক ফুলিয়ে দম্ভভরে (গোঁয়ারের মত) দাঁড়িয়েছে; বিনয় প্রকাশের জন্য দাঁড়িয়েছে, না কুস্তি লড়ার জন্য থুতনী উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হে আল্লাহ্র বান্দারা! যখন রুকূ'তে আদব প্রকাশ করছো, সাজদায় আদব এবং 'আত্তাহিয়্যাত'-এ আদব ও বিনয়ের বিষয়টি বিবেচনা করছো, তখন ক্বিয়ামে বুক ফুলিয়ে, থুতনী উঁচিয়ে বেয়াদবীর সাথে পলোয়ানের মতো কেন দাঁড়াচ্ছো? এখানেও নাভীর নিচে হাত বেঁধে গোলামের মতো দাঁড়াও! আল্লাহ্ তা'আলা বুঝ শক্তি দান করুন! (এ কথা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে,) গায়র মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবীদের নিকট একটি মারফু' সহীহ হাদীসও নেই। মুসলিম ও বোখারী শরীফের এ প্রসঙ্গে কোন হাদীস শরীফ তাদের নিকট নেই, যাতে পুরুষদেরকে বুকের উপর হাত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (এমনটি করার বিধান রয়েছে মেয়ে লোকদের জন্য। মহিলাদের নামাযের নিয়মও অন্যত্র সপ্রমাণ আলোচনা করা হবে ইন্শা-আল্লাহ্।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খণ্ডন]

আপত্তি- ১

আবূ দাঊদ শরীফে ইবনে জারীর দ্বাবী আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهٗ بِيَمِيْنِهٖ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ-

অর্থ: আমি হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দেখেছি - তিনি বাম হাত ডান হাত দ্বারা কব্জির উপর ধরেছেন নাভীর উপরে।

খণ্ডন

এর কয়েকটা জবাব রয়েছে-

এক. আপনি তো আবূ দাঊদ শরীফের এ হাদীস পুরোপুরি উল্লেখ করেন নি। এর পর বিস্তারিত বর্ণনা হচ্ছে নিম্নরূপ: (ইবনে আ'রাবীর কপি)

قَالَ اَبُوْدَاؤدَ رَوٰى عَنْهُ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ وَقَالَ اَبُوْجَلَادٍ تَحْتَ السُّرَّةِ وَرُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ-

অর্থ: ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন, হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র থেকে নাভীর উপর হাত বাঁধার বর্ণনা এসেছে; কিন্তু আবূ জালাদ নাভীর নিচে বলে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকেও এটা বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সেটা কোন শক্তিশালী বর্ণনা নয়।

জরুরী নোট

'নাভীর নিচে' অথবা 'নাভীর উপরে' হাত বাঁধার হাদীসগুলো 'আবূ দাঊদ' শরীফের প্রচলিত কপিগুলোতে নেই; 'ইবনে আ'রাবী' সম্বলিত আবূ দাউদের কপিগুলোতে মওজুদ রয়েছে; যেমনটি আবূ দাউদ শরীফের পার্শ্বটীকায় এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। এ কপি থেকে 'ফাতহুল ক্বাদীর' ও 'সহীহুল বিহারী' বর্ণনাদি নিয়েছে। মোট কথা, হে লা-মাযহাবীরা আপনাদের পেশকৃত আবূ দাউদের হাদীসে পরস্পর বিরোধ সৃষ্ট হয়ে গেছে। এ পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলোকে খোদ্ ইমাম আবূ দাউদ 'দুর্বল' বলেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- হে লা-মাযহাবীরা! আপনারা আবূ দাউদের দুর্বল হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয়ত, যখন হাদীসে পরস্পর বিরোধ দেখা দেয়, তখন 'ক্বিয়াস' দ্বারা প্রাধান্য নির্ণয় করা হয়। 'ক্বিয়াস' (যুক্তি) চাচ্ছে- 'নাভীর নিচে হাত বাঁধার বর্ণনা সম্বলিত হাদীসগুলো অনুসারেই আমল করা হোক। কেননা, সাজদাহ্, রুকু' ও

আত্তাহিয়্যাত-এর বৈঠক-এ সব ক'টিতে আদবের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সুতরাং ক্বিয়ামেও আদবের দিকটা বিবেচনায় আনা হোক। নাভীর নিচে হাত বাঁধায় আদব রয়েছে। বুকের উপর (পুরুষেরা) হাত-বাঁধা বেয়াদবীর সামিল; যেমন, এভাবে কাউকে কুস্তি খেলার জন্য আহ্বান করা হয়। মহান রবকে জোর (শক্তি) দেখিও না, ওখানে কান্না করো। (নম্রতা দেখাও!)

আপত্তি- ২

হে হানাফীরা, আপনাদের পেশকৃত হাদীসগুলো দ্ব'ঈফ (দুর্বল)। আর দ্ব'ঈফ বা দুর্বল হাদীস থেকে দলীল গ্রহণ করা ভুল পদ্ধতি।

খণ্ডন:

দ্ব'ঈফ দ্ব'ঈফ (দুর্বল, দুর্বল) বলে বুলি আওড়ানো আপনারা লা-মাযহাবীদের পুরানা অভ্যাস। সাতটা জবাব আমি প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দিয়েছি। আবারো শুনুন- যে বর্ণনা (হাদীস) একাধিক সনদে বর্ণিত হয়, সেটা 'দ্ব'ঈফ' বা দুর্বল থাকে না। আমি তো দশটি সনদ পেশ করেছি। তাছাড়া, উম্মতের আমল দ্বারাও 'দুর্বল' হাদীস 'শক্তিশালী' হয়ে যায়। তদুপরি, ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতো মহান ইমামের 'কবূল করা'র কারণেও সেটার দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যায়। তাছাড়া, ওইগুলোতে যদি দুর্বলতা থাকে, তাহলে তা ইমাম-ই আ'যমের পরে সৃষ্টি হয়েছে। পরবর্তীকালীন দুর্বলতা ইমাম আ'যমের জন্য ক্ষতিকর হবে কেন? মোটেই হবে না, ইত্যাদি।

একটা মজার ঘটনা

আমি (মুফতী আহমদ ইয়ার খান) ৬ রমযানুল মুবারক সোমবার 'আহলে হাদীসের অহংকার' বলে খ্যাত পাকিস্তানের গুজরাত নিবাসী মাওলানা হাফেয এনায়ত উল্লাহ'র প্রতি একটি চিঠি লিখে তা গুজরাতের জামালপুর নিবাসী হাফেয ইলাহী বখশের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম। চিঠিতে তাঁকে লিখেছিলাম যেন অনুগ্রহপূর্বক বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে কিছু হাদীস সূত্র সহকারে লিখে পাঠান। আমার ধারণা ছিলো যে, যেহেতু হাফেয মাওলানা এনায়ত উল্লাহ্ সাহেব আহলে হাদীসের শীর্ষস্থানীয় গর্বিত আলিম, সেহেতু তিনি তাদের উক্ত আমলের পক্ষে বোখারী, মুসলিম অথবা সিহাহ্ সিত্তার অন্য হাদীস-গ্রন্থাবলী থেকে অসংখ্য হাদীস উদ্ধৃত করে পাঠাবেন, যেগুলো আমরা আজ পর্যন্ত হয়তো দেখিও নি। কিন্তু জবাব কি আসলো? উক্ত মাওলানা সাহেবের পক্ষ থেকে যে

জবাব এসেছে তা শুনুন! আর মাথায় হাত মারুন! তিনি এক ইঞ্চি পরিমাণের এক টুকরো কাগজে একটা মাত্র লাইন লিখেছিলেন। তা নিম্নরূপ:

বুলুগুল মুরাম: পৃষ্ঠা - ২১

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ -

অর্থ: ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে নামায পড়েছি। সুতরাং তিনি আপন ডান হাত বাম হাতের উপর তাঁর বক্ষের উপর রেখেছেন।

আর মৌখিকভাবে উক্ত মাওলানা বলে পাঠিয়েছেন যে, তাফসীর-ই ক্বাদেরী (উর্দু)তেও লিখা হয়েছে যে, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ -এর অর্থ হচ্ছে- "আপনি আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন এবং 'নাহর' অর্থাৎ বুকের উপর নামাযে হাত রাখুন।"

(আহলে হাদীসের অহংকার বলে খ্যাত মাওলানা'র) এ জবাব দেখে ও শুনে আমি তো এ ভেবে সীমাহীন হতভম্ব যে, আফসোস! যেই আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়রা আমাদের নিকট যে কোন মাস'আলায় (দলীল হিসেবে) বোখারী ও মুসলিমের হাদীসের উদ্ধৃতি দাবী করতে থাকেন এবং সিহাহ্ সিত্তার বাইরে যেতে দেন না, আর যখন তাদের পক্ষে দলীল দেওয়ায় পালা আসে তখন এমন রেওয়ায়ত লিখে ক্ষান্ত হন, যার না আছে কোন হাত-পা না আছে মাথা। উক্ত রেওয়াতের না কোন সূত্র (সনদ) লিখলেন, না কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাত। হাফেয ইলাহী বখশ আমাদের বললেন, 'বুলূগুল মুরাম'-এর কথা। তাও মাত্র ত্রিশ/চল্লিশ পাতার একটি পুস্তিকা। তা থেকে এ হাদীস মৌলভী সাহেব উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। যদি কোন মাসআলায় আমরা এমন পুস্তিকা থেকে কোন হাদীস উদ্ধৃত করতাম, তাহলে ক্বিয়ামত এসে যেতো! তারা দাবী করতো বোখারী কিংবা মুসলিমের হাদীস।

তাঁর উদ্ধৃত রেওয়ায়তটার এমন কোন পাত্তাই নেই যে, তা কি মওদ্বু' (বানোয়াট), না দ্ব'ঈফ (দুর্বল), কিংবা অন্য কিছু। যদি কিছুক্ষণের জন্য সেটাকে একটা সহীহ হাদীস বলে মেনেও নেয়া হয়, তবে সেটার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাতে একথার উল্লেখ নেই যে, হুযূর-ই আকরাম নামাযের মধ্যে বুকের উপর হাত রেখেছেন, বরং فَوَضَعَ يَدَهُ الخ -এর 'ف' (عاطفه تعقيبيه) থেকে বুঝা যায় যে, তিনি নামাযের পর কোন প্রয়োজনে বক্ষ মুবারকের উপর হাত

রেখেছেন। যেমন মহান রব এরশাদ করেন- وَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا (অর্থাৎ এবং যখন তোমরা খানা খেয়ে নাও তখন চলে যাও)।

এর অর্থ এ নয় যে, খাদ্যাহার করার মধ্যভাগে রুটি/ভাত হাতে নিয়ে চলে যাও। এমতাবস্থায় এ হাদীস শরীফ আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলোর পরিপন্থী হবে না।

তাছাড়া, (আহলে হাদীসের মৌলভীর উপস্থাপিত) উক্ত হাদীসে সেটার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়নি যে, নারীদের মতো হাত বুকের উপর রেখেছেন, না পলোয়ানদের মতো। সুতরাং হাদীসটি 'মুজমাল' (অবিস্তারিত); আমল করার যোগ্য নয়। আর আয়াত শরীফ সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলবো যে, وَانْحَرْ শব্দের এ অস্পৃশ্য অর্থ না কোন মারফূ' সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, না জমহুর (অধিকাংশ) মুফাস্সিরগণ বর্ণনা করেছেন। সবাই তো আয়াতের এ অর্থ করেন যে, 'মহান রবের জন্য নামায পড়ুন! এবং ক্বোরবানী করুন।' উক্ত মৌলভী বরাতও দিয়েছেন কেমন বড় ও উল্লেখযোগ্য তাফসীরের 'তাফসীর'-ই ক্বাদেরী' (উর্দু)!

আর যদি অসম্ভব কল্পনায় তা মেনেও নেওয়া হয়, তাহলে সমস্ত আহলে হাদীসের উচিত হবে- এখন থেকেই নামাযে হাত বুকের পরিবর্তে গলার উপর রাখা। কেননা 'নাহ্র' তো গলার শেষ ভাগকে বলা হয়, যা বুকের সাথে মিলিত অংশের উপরের দিকে থাকে। ক্বোরবানীকেও 'নাহর' এজন্য বলা হয় যে, তাতে যবেহের সময় পশুর গলা চিরে ফেলা হয়; বুক চেরা হয় না। সুতরাং আহলে হাদীস লা-মাযহাবীদেরও, উন্নতি করে বক্ষের উপরে গলা ধরা উচিত হবে।

মোটকথা, উক্ত মৌলভীর উক্ত জবাবের জন্য আমাদের খুব আফসোস্ হলো। আর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, ওই আহলে হাদীসের নিকট নামাযে বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে কোন হাদীস বোখারী, মুসলিম ও সিহাহ্ সিত্তার নেই। এসব বেচারা ভ্রান্তলোক সেহাহ্ সিত্তার হাদীস তাদের পক্ষে পাবে কিভাবে? সিহাহ্ সিত্তার অন্যতম হাদীসগ্রন্থ তিরমিযী শরীফে ইমাম তিরমিযী বলেছেন-

وَرَاٰى بَعْضُهُمْ اَنْ يَضَعَهُمَا فَوْقَ السُّرَّةِ وَرَاٰى بَعْضُهُمْ اَنْ يَضَعَهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ وَكُلُّ ذَالِكَ وَاسِعٌ عِنْدَهُمْ -

অর্থ: কিছু সংখ্যক বিজ্ঞ আলিমের অভিমত হচ্ছে- হাত নাভীর উপর রাখবে, আর কারো কারো অভিমত হচ্ছে হাত নাভীর নিচে রাখবে। এ দু'এর মধ্যে প্রতিটি জায়েয, তাদের মতে।

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি যদি বুকের উপর হাত বাঁধার পক্ষে কোন হাদীস পেতেন, তাহলে তিনি অবশ্যই তা উদ্ধৃত করতেন। শুধু আলিমদের অভিমত উল্লেখ করে ক্ষান্ত হতেন না।

[পরিশেষে, বলছি পুরুষরা নামাযে তাকবীর-ই তাহরীমাহ্ করে দু'হাত নাভীর নিচে বাঁধবেন (বুকের উপর বাঁধবে নারীরা)। এ বিষয়টি এখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত।] এটাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত। সুতরাং এটা অনুসারেই আমল করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

[নামাযে বিস্‌মিল্লাহ নিরবে পড়বেন]

নামাযে ‘বিসমিল্লাহ্’ নিরবে পড়বেন

সুন্নাত হচ্ছে নামাযী সূরা ফাতিহার প্রারম্ভে ‘বিস্‌মিল্লাহ্ শরীফ’ নীরবে বলা, ‘আলহামদু লিল্লাহ্’ থেকে ক্বিরা’আত আরম্ভ করা; কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবী সম্প্রদায় ‘বিস্‌মিল্লাহ্’ও উচ্চরবে পড়ে থাকে, যা একেবারে সুন্নাত বিরোধী ।

‘বিস্‌মিল্লাহ্’ নীরবে পড়া সম্পর্কে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে । ওইগুলো থেকে কয়েকটা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে । আল্লাহ্ তা‘আলা কবূল করুন!

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাদীস নম্বর ১-৩

বোখারী, মুসলিম ও ইমাম আহমদ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ وَّعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

অর্থঃ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, আবূ বকর সিদ্দীক্ব, ওমর ফারুক্ব ও ওসমান গণি রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম-এর পেছনে নামায পড়েছি । তাঁদের মধ্যে কাউকে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ সরবে পড়তে শুনিনি ।

হাদীস নম্বর ৪

মুসলিম শরীফ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছে-

وَعَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلٰوةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

অর্থঃ নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন’ দ্বারা ক্বিরআত আরম্ভ করতেন ।

হাদীস নম্বর ৫-৭

নাসাঈ, ইবনে হাব্বান ও ত্বাহাভী শরীফ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছে-

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

অর্থ: আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর পেছনে নামায পড়েছি। ওই সব হযরতের কাউকে 'বিসমিল্লাহ্' উচুঁ আওয়াজে পড়তে শুনিনি।

হাদীস নম্বর-৮-১১

ত্বাব্রানী মু'জাম-ই কবীর-এ, আবূ নু'আয়ম 'হুলিয়া'য় এবং ইবনে খোযায়মাহ্ ও ত্বাহাভী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يُسِرُّوْنَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' নীরবে পড়তেন।

হাদীস নম্বর ১২-১৪

আবূ দাউদ, দারেমী ও ত্বাহাভী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرْاَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম 'আলহামদু লিল্লাহি রাবিবল 'আ-লামীন' দ্বারা ক্বিরআত আরম্ভ করতেন।

হাদীস নম্বর ১৫

মুসলিম শরীফে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوْا يَسْتَفْتِحُوْنَ الْقِرْاَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا يَذْكُرُوْنَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فِيْ اَوَّلِ الْقِرْاَةِ وَلَا فِيْ اٰخِرِهَا-

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম 'আলহামদু লিল্লাহি রাবিবল আ-লামীন' দ্বারা ক্বিরআত আরম্ভ করতেন 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' না ক্বিরআতের শুরুতে উল্লেখ করতেন, না ক্বিরআতের শেষ ভাগে।

হাদীস নম্বর ১৬

ইবনে আবী শায়বাহ্ সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُخْفِيْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالْاِسْتِعَاذَةَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ-

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম', 'আ'ঊযু বিল্লাহ্' ও 'রাব্বানা-লাকাল হামদু' নীরবে বলতেন।

হাদীস নম্বর ১৭

ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'কিতাবুল আ-সা-র'-এ হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْاِمَامُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَالتَّعَوُّذَ وَاٰمِيْنَ-

অর্থ: তিনি বলেন, চারটি বিষয় ইমাম নীরবে পড়বেন-'বিসমিল্লাহ্', 'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা', 'আ'ঊযু বিল্লাহ্' এবং 'আ-মী-ন'।

হাদীস নম্বং ১৮-১৯

ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাউদ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ الصَّلٰوةَ بِالتَّكْبِيْرِ وَالْقِرْاَةَ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

অর্থঃ তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযকে 'তাকবীর' দ্বারা আরম্ভ করতেন আর ক্বিরআতকে (আরম্ভ করতেন) 'আলহামদু লিল্লা-হি' দ্বারা।

হাদীস ২০

আবদুর রায্যাক্ব আবূ ফাখ্তাহ্ থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ يَجْهَرُ بِالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ-

অর্থঃ হযরত আলী মুরতাদ্বা 'বিস্মিল্লাহ্' উচুঁ আওয়াজে পড়তেন না, আর 'আলহামদু লিল্লাহ্' উঁচু আওয়াজে পড়তেন।

মোটকথা, এ সম্পর্কে আরো বহু হাদীস শরীফ পেশ করা যেতে পারে। কিন্তু আমি এখানে শুধু বিশটি হাদীস পেশ করে ক্ষান্ত হলাম। যদি আগ্রহ থাকে, তবে 'ত্বাহাভী' ও 'সহীহুল বিহারী' শরীফ পাঠ-পর্যালোচনা করুন।

যুক্তিও চায় যে, 'বিস্মিল্লাহ্' উঁচু আওয়াজে না পড়া হোক। কেননা, সূরাগুলোর প্রারম্ভে যে 'বিস্মিল্লাহ্' লিখা হয়েছে, তা ওই সূরাগুলোর অংশ নয়। শুধু সূরাগুলোকে পরস্পর পৃথক বুঝানোর জন্য লিখা হয়েছে। হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- যে ভাল কাজকে বিসমিল্লাহ্ দ্বারা আরম্ভ করা না হয়, তা অসম্পূর্ণ। সুতরাং যেভাবে বরকতের জন্য নামাযী ক্বিরআতের আগে 'আ'ঊযু বিল্লাহ্' পড়ে, কিন্তু নবীবে, কেননা, 'আ'ঊযু বিল্লাহ্' সূরার অংশ নয়, তেমনি বরকতের জন্য 'বিসমিল্লাহ্' পড়বে, কিন্তু নীরবে পড়বে। কেননা, এটাও সূরার অংশ নয়। অবশ্য, সূরা 'নাম্ল' শরীফে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরার আয়াতের অংশ। ইমাম সেখানে উচ্চ আওয়াজে পড়ে থাকেন। কেননা সেটা সেখানকার আয়াতই। মোটকথা, ইমাম শুধু ক্বোরআন করীমকেই উঁচু আওয়াজে পড়বেন। যে 'বিস্মিল্লাহ্' সূরার প্রারম্ভে রয়েছে, তা সূরার অংশ নয়। তাই সেটা নিরবে পড়া চাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খণ্ডন]

আপত্তি-১

যেহেতু 'বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' প্রত্যেক সূরার অংশ; যদি অংশ না হতো, তাহলে ক্বোরআনে এভাবে লেখা হতো না, ক্বোরআন-ই করীমেতো শুধু ক্বোরআনের আয়াতগুলোই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, ক্বোরআন নয় এমন কিছু লিপিবদ্ধ করা হয়নি, সেহেতু যেমন অন্য আয়াতগুলো উঁচু আওয়াজে পড়া হয়, তেমনি 'বিসমিল্লাহ্'ও উঁচু আওয়াজে পড়া চাই।

খণ্ডন

এ আপত্তির কয়েকটা জবাব হতে পারে-

এক. 'বিসমিল্লাহ্' প্রত্যেক সূরার অংশ নয়; কেননা সেটা প্রত্যেক সূরার সাথে নাযিল হয়নি। সূতরাং বোখারী শরীফের প্রারম্ভে 'ওহী নাযিল হওয়া কিভাবে আরম্ভ হয়েছিল?' শীর্ষক অধ্যায়ে ইমাম বোখারী সর্বপ্রথম ওহী সম্পর্কে বর্ণনা (রেওয়ায়ত) এনেছেন। যেমন হযরত জিব্রাঈল আমীন হুযূর-ই আকরামের খিদমতে আরয করেছেন اِقْرَأْ 'ইক্বরা' (পড়ুন)! আর হুযূর-ই আকরাম বলেছেন- مَاانَا بِقَارِئ (আমি পড়বো না)। তারপর হযরত জিব্রাঈল আরয করলেন, اِقْرَأْ (পড়ুন)! হুযূর এবারও ওই জবাব দিয়েছেন। শেষ বারে আরয করলেন, اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (আপনি আপনার ওই মহান রবের নামে পড়ুন, যিনি সৃষ্টি করেছেন)। মোটকথা, প্রথম ওহী এটাই। এতে 'বিসমিল্লাহ্'র উল্লেখ নেই। বুঝা গেলো যে, সূরাগুলোর প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ্ শরীফ' নাযিল হয়নি।

দুই. যদি 'বিসমিল্লাহ্' প্রত্যেক সূরার অংশ হতো, তাহলে সূরার উপরে পৃথকভাবে অক্ষরগুলোকে দীর্ঘ করে লিপিবদ্ধ করা হতো না; বরং যেভাবে অন্যান্য আয়াত মিলিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি 'বিসমিল্লাহ্' সমস্ত আয়াতের সাথে লিখা হতো। দেখুন, সূরা নামল শরীফে 'বিসমিল্লাহ্' ওই সূরার অংশ। সুতরাং সেখানে পৃথক আঙ্গিকে লিপিবদ্ধ করা হয়নি, বরং সেটাও অন্য সমস্ত আয়াতগুলোর সাথে একইভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বুঝা গেলো, সূরাগুলোর প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহ্'কে বিশেষ আঙ্গিকে পৃথক করে লিপিবদ্ধ করা প্রত্যেক সূরাকে পরস্পর পৃথক করার জন্যই।

আপত্তি-২

ত্বাহাভী শরীফে হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত-

اَنَّالنَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى فِىْ بَيْتِهٖ فَيَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَا حَمْدُ لِلّٰهِ -

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে নামায পড়তেন। তিনি পড়তেন- 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, 'আলহামদুলিল্লাহ্' শেষ পর্যন্ত। বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযে 'বিস্‌মিল্লাহ্' উঁচু আওয়াজে পড়তেন, অন্যথায় হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা কীভাবে শুনলেন?

খণ্ডন

এ হাদীসে 'আওয়াজ'-এর কথা উল্লেখ করা হয়নি, শুধু 'বিসমিল্লাহ্' পড়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরাও বলি যে, তিনি 'বিসমিল্লাহ্' পড়েছেন, কিন্তু নিম্নস্বরে পড়েছেন। প্রকাশ তো এটাই থাকে যে, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এখানে নীরবে পড়তেন। আর ওই নামায, যা তিনি হযরত উম্মে সালামার ঘরে পড়তেন, তা ফরয নামায ছিলো না, নফল ছিলো। ফরয তো তিনি মসজিদ শরীফে জামা'আত সহকারে পড়তেন। নফল নামাযে ক্বোরআনের ক্বিরআত নিম্নস্বরেই হয়ে থাকে। সুতরাং এখানে 'বিসমিল্লাহ্'ও নিম্নস্বরে ছিলো। আর 'আলহামদু লিল্লাহ্'ও নীরবে। হযরত উম্মে সালামাহ্ এমন সময় হুযূর-ই আকরামের কাছেই থাকতেন। এ কারণে তিনি হুযূর-ই আকরামের নিম্নস্বরে পড়ার আওয়াজটুকুও শুনতেন। নিম্নস্বরে উচ্চারিত ক্বিরআতও এতটুকু আওয়াজ দ্বারা সম্পন্ন করা যায় যেন পার্শ্ববর্তী লোকও শুনতে পায়। একেবারে নীরবে ক্বিরআত হয় না, বরং চিন্তা বা কল্পনাই হয়। সুতরাং এ হাদীস শরীফ থেকে আপত্তিকারীর দাবী প্রমাণিত হচ্ছে না।

আপত্তি-৩

তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত-

قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلٰوتَهٗ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

অর্থঃ তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন নামায 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দ্বারা আরম্ভ করতেন।

খণ্ডন

এর দু'টি জবাব হতে পারে-

এক. আফসোস্! হে আপত্তিকারী! আপনিতো ইমাম তিরমিযীর এখানে এর পরবর্তী মন্তব্যটা দেখেননি (কিংবা উল্লেখ করেনি)। তা হচ্ছে, তিনি বলেন, مِنْ اَحَادِيْثَ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ بِذَاكَ অর্থাৎ "এটা এমন এক হাদীস, যার সনদ বলতে কিছুই নেই।"

আফসোস্! হে আপত্তিকারীরা, আপনারা আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলোকে বিনা কারণে 'দুর্বল' বলে প্রত্যাখ্যান করে থাকেন, আর নিজেরা এমন হাদীস পেশ করছেন, যার কোন পাত্তাই নেই।

দুই. যদি এ হাদীসকে 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) বলে মেনেও নেওয়া হয়, তবুও তাতে 'বিসমিল্লাহ্' উঁচু আওয়াজে পড়ার উল্লেখ নেই। তাতে শুধু এতটুকু আছে যে, "তিনি নামায 'বিসমিল্লাহ্' দ্বারা আরম্ভ করতেন।" আমরাও তো বলছি যে, 'বিসমিল্লাহ্' পড়া চাই, তবে নিম্নস্বরে।

তিন. হতে পারে যে, তিনি তাকবীর-ই তাহরীমার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্' পড়ছিলেন। কারণ, তাতে 'সালা-তাহু' (তাঁর নামায আরম্ভ করতেন) বলেছেন, 'কিরাআতাহু' (ক্বিরআত শুরু করতেন) বলেন নি।

আপত্তি-৪

ত্বাহাভী শরীফে, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন-

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَجَهَرَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَكَانَ يَجْهَرُ اَبِىْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

অর্থঃ আমি হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পেছনে নামায পড়েছি। তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' উঁচু আওয়াজে পড়েছেন। আমার পিতাও উঁচু আওয়াজে 'বিসমিল্লাহির রাহমা-নির রাহীম' পড়তেন। বুঝা গেলো যে, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উঁচু আওয়াজে 'বিসমিল্লাহ্' পড়তেন।

খণ্ডন

এর কয়েকটা জবাব হতে পারে-

এক. এ হাদীস ওই সব প্রসিদ্ধ (মাশহুর) হাদীস শরীফের পরিপন্থী, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। ওইগুলোর মধ্যে বোখারী ও মুসলিম

শরীফের হাদীসও রয়েছে, যেগুলো থেকে একথা অতি মজবুতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরাত খোলাফা-ই রাশেদীন 'আলহামদু লিল্লাহ্' দ্বারা ক্বিরাআত আরম্ভ করতেন, 'বিসমিল্লাহ্' নিম্নস্বরে পড়তেন। সুতরাং এ হাদীস 'শায' (বিরল) পর্যায়ের। বস্তুত 'মাশহুর' পর্যায়ের হাদীসগুলোর মোকাবেলায় 'শায' পর্যায়ের হাদীস আমলযোগ্য হয় না।

দুই. এ হাদীস শরীফে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নামাযের অভ্যন্তরে 'সুবহানাকা' পড়ার পর 'আলহামদু' পড়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্' উঁচু আওয়াজে পড়তেন। এর অর্থ এও হতে পারে যে, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নামায সমাপ্ত করে দো'আর পূর্বে বরকতের জন্য 'বিসমিল্লাহ্' শরীফ পড়তেন; তারপর দো'আ করতেন। এমতাবস্থায় এ হাদীস শরীফ আমাদের উপস্থাপিত হাদীস শরীফগুলোর বিপরীত নয়। বস্তুত যথাসম্ভব হাদীস শরীফগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা চাই।

তিন. সূরার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ্' উঁচু আওয়াজে পড়া হতো যদি তা প্রত্যেক সূরার অংশ হয়; অথচ সূরার অংশ হওয়া অকাট্য ও নিশ্চিত হাদীস শরীফ দ্বারা-ই সাব্যস্ত হতে পারে; 'খবরে ওয়াহিদ' দ্বারা নয়। কাজেই, আপত্তিকারীর পেশকৃত হাদীস হচ্ছে 'খবর-ই ওয়াহিদ', যা একথা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়।

আফসোস তো এজন্য যে, আমরা নিম্নস্বরে 'বিসমিল্লাহ্' পড়ার পক্ষে বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহ পেশ করছি, আর আপনারা বিরুদ্ধবাদীরা! সেগুলোর বিরোধিতা করার জন্য ত্বাহাভী শরীফের আশ্রয় নিচ্ছেন! অথচ ত্বাহাভী শরীফের উপরও আপনাদের ভরসা নেই।

---o---

চতুর্থ অধ্যায়

[ইমামের পেছনে মুক্বতাদি ক্বিরাআত সম্পন্ন করবে না]

ইমামের পেছনে মুক্বতাদি ক্বিরআত সম্পন্ন করবে না

ইমামের পেছনে মুক্বতাদীর জন্য ক্বোরআন শরীফ পড়া (ক্বিরাআত) কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা মুক্বতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়া ফরয বলে জানে। এ কাজটা করা নিষিদ্ধ হবার পক্ষে ক্বোরআন-ই করীম, বহু হাদীস শরীফ, শীর্ষস্থানীয় সাহাবা-ই কেরামের অভিমতগুলো এবং যুক্তিগ্রাহ্য বহু দলীল রয়েছে। সুতরাং আমি এ অধ্যায়কেও দু'টি পরিচ্ছেদ বিন্যস্থ করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এ নিষেধের পক্ষে প্রমাণাদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর বিপক্ষে প্রশ্নাবলী (আপত্তিসমূহ) ও সেগুলোর খন্ডন উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ববূল করুন!

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইমামের পেছনে মুক্বতাদীর জন্য ক্বোরআন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ, নিশ্চুপ থাকা জরুরী। দলীলাদি নিম্নে লক্ষ্য করুন-

আয়াত-১.

ক্বোরআন-ই করীম-এ এরশাদ হচ্ছে-

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ।

তরজমা: এবং যখন ক্বোরআন শরীফ পড়া হয়, তখন সেটাকে কান লাগিয়ে শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো, যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।

স্মর্তব্য যে, ইসলামের প্রারম্ভিককালে নামাযে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা জায়েয (বৈধ) ছিলো। আর মুক্বতাদী ক্বিরাআতও পড়তো, কথাবার্তাও বলতো। এটা এ আয়াত শরীফের মাধ্যমে মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে-

আয়াত-২

আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ ফরমান-

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

তরজমা: এবং দন্ডায়মান হও আল্লাহ্র জন্য আনুগত্যকারী হয়ে।

সুতরাং ইমাম মুসলিম 'বা-বু তাহরী-মিল কালা-মি ফিস্ সালা-তি' এবং ইমাম বোখারী 'বা-বু মা-ইয়ুন্হা মিনাল কালামি ফিস্ সালা-তি'-এর মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে আরক্বাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِى الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ اِلٰى جَنْبِهٖ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَزَلَتْ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا مِنَ الْكَلَامِ

অর্থ: আমরা নামাযের অভ্যন্তরে কথাবার্তা বলে ফেলতাম। প্রত্যেকে নিজ নিজ সাথীর সাথে নামাযরত অবস্থায় কথোপকথন করতাম এ পর্যন্ত যে, এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে- ওয়া ক্বু-মূ-লিল্লাহি...। তারপর আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিশ্চুপ থাকার এবং কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

এরপর থেকে নামাযে কথা বলা নিষিদ্ধ হলো; কিন্তু ক্বোরআন তিলাওয়াত মুক্বতাদী করতে থাকে। যখন এ আয়াত শরীফ অবতীর্ণ হলো তখন মুক্বতাদীর জন্য ক্বোরআন তিলাওয়াতও নিষিদ্ধ হয়ে গেলো, وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا... - الاية (এবং যখন ক্বোরআন পড়া হয় তখন তা মনযোগ সহকারে শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো)।

সুতরাং 'তাফসীর-ই মাদারিক' শরীফে এ আয়াত 'ওয়াইযা- ক্বুরিআল ক্বোরআনু-এর তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَجُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ عَلٰى اَنَّهٗ فِى اسْتِمَاعِ الْمُؤْتَمِّ

অর্থ: আম সাহাবা-ই কেরামের অভিমত হচ্ছে এ আয়াত শরীফ মুক্বতাদী কর্তৃক ইমামের ক্বিরাআত শ্রবণ করার প্রসঙ্গেই।

'তাফসীর খাযিন'-এ এ-ই আয়াত- وَاِذَا قُرِئَ (যখন ক্বোরআন পড়া হয়...)-এর ব্যাখ্যায় একটি বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে-

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهٗ سَمِعَ نَاسًا يَقْرَؤُنَ مَعَ الْاِمَامِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَمَا اَنَّ لَكُمْ اَنْ تَفْقَهُوْا وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ

অর্থ: হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কিছু লোককে ইমামের সাথে ক্বোরআন পড়তে শুনেছেন। যখন নামায শেষ করলেন, তখন বললেন, এখনো কি এ সময় আসেনি যে, তোমরা এ আয়াতের মর্মার্থ বুঝবে- 'এবং যখন ক্বোরআন পড়া হয়...'?

'তানভীর-ই মিক্বইয়াস মিন তাফসীর-ই ইবনে আব্বাস' শরীফে এ আয়াতের তাফসীরে আছে-

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فِى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ بِالْقِرَاَتِهٖ وَاَنْصِتُوْا لِقِرَاَتِهٖ

অর্থ: যখন ফরয নামাযে ক্বোরআন পড়া হয়, তখন সেটার ক্বিরাআত কান পেতে শোনো এবং ক্বোরআন পঠিত হওয়ার সময় নিশ্চুপ থাকো।

আমার এ গবেষণালব্ধ বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইমামের পেছনে মুক্বতাদী ক্বিরাআত সম্পন্ন করতেন। এ আয়াত শরীফ নাযিল হবার পর ইমামের পেছনে ক্বিরাআত মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। এখন হাদীস শরীফগুলো দেখুন-

হাদীস নং-১

'মুসলিম শরীফ: বাবু সুজূ-দিত্ তিলাওয়াত'- এ হযরত আত্বা ইবনে ইয়াসির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত-

اَنَّه سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَأَةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ لاَ قِرَأَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِىْ شَيْءٍ

অর্থ: তিনি হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (সাহাবী)কে ইমামের সাথে ক্বিরাআত সম্পন্ন করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তদুত্তরে তিনি বললেন, ''ইমামের সাথে ক্বিরাআত মোটেই জায়েয নয়।''

হাদীস নং-২

'মুসলিম শরীফ: বাবুত্ তাশাহ্হুদ'-এ বর্ণিত হয়েছে-

فَقَالَ لَه اَبُوْبَكْرٍ فَحَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيْحٌ يَعْنِىْ وَاِذَا قُرِئَ فَاَنْصِتُوْا

অর্থ: আবূ বকর সালমানকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত আবূ হোরায়রার হাদীস কেমন? তদুত্তরে তিনি বললেন, ''একেবারে সহীহ্ (বিশুদ্ধ)।'' অর্থাৎ এ-ই হাদীস ''যখন ইমাম ক্বিরাআত সম্পন্ন করে, তখন নিশ্চুপ থাকো!'' একেবারে বিশুদ্ধ।

হাদীস নং-৩

ইমাম তিরমিযী তাঁর তিরমিযী শরীফে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেন-

مَنْ صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ يَقْرَاُفِيْهَا بِاُمِّ قُرْاٰنٍ فَلَمْ يُصَلِّ اِلاَّ اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ - هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

অর্থ: যে কেউ নামায পড়ে, তাতে সূরা ফাতিহা না পড়ে, সে নামাযই পড়েনি; কিন্তু যদি ইমামের পেছনে পড়ে থাকে। (অর্থাৎ তখন যদি সূরা ফাতিহা না পড়ে, তবে নামায শুদ্ধ হবে।) এ হাদীস শরীফ 'হাসান- সহীহ্' পর্যায়ের।

হাদীস নং-৪

নাসাঈ শরীফে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণিত-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ

بِه فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইমাম এ জন্য নিয়োগ করা হয়েছে যেন তাঁর অনুসরণ করা হয়। সুতরাং তিনি যখন তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বলো, আর যখন তিনি ক্বিরাআত সম্পন্ন করেন, তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকো।

আমি হাদীস নং ২-এ মুসলিম শরীফের বরাতে বর্ণনা করেছি যে, হযরত আবূ হোরায়রার এ হাদীস সহীহ্ (সঠিক)।

হাদীস নং-৫

তাহাভী শরীফে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণিত-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَه اِمَامٌ فَقِرَأَةُ الْاِمَامِ لَه قِرَأَةٌ

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যার ইমাম থাকেন, তখন ইমামের তিলাওয়াত তারই তিলাওয়াত।

হাদীস নং- ৬-১০

ইমাম মুহাম্মদ মুআত্তা শরীফে, ইমাম আবূ হানীফা মূসা ইবনে আবূ আয়েশা থেকে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে শাদ্দাদ থেকে, তিনি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَه اِمَامٌ فَقِرَأَةُ الْاِمَامِ لَه قِرَاَةٌ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَابْنُ الْهُمَامِ هٰذَا الْاِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

অর্থ: হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার ইমাম থাকে, তবে ইমামের তিলাওয়াত তারই তিলাওয়াত। মুহাম্মদ ইবনে মানী' ও ইমাম ইবনে হুমাম বলেছেন, এ সনদ সহীহ এবং ইমাম মুসলিম ও ইমাম বোখারীর শর্তানুরূপ।

এ হাদীস সর্ব ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ্, দারু ক্বুত্বনী বায়হাক্বীও বর্ণনা করেছেন। [সহীহুল বিহারী]

হাদীস-১১

ত্বাহাভী শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণিত-

قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اَقْبَلَ بِوَجْهِه فَقَالَ اَتَقْرَءُوْنَ الْاِمَامُ يَقْرَأُ فَسَكَتُوْا فَسَاَلَهُمْ ثَلٰثًا فَقَالُوْا اِنَّا لَنَفْعَلُ قَالَ فَلاَ تَفْعَلُوْا

অর্থঃ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একবার হুযূর-ই আক্রাম নামায পড়িয়েছেন। তারপর সাহাবীদের দিকে চেহারা মুবারক ফেরালেন। আর এরশাদ করলেন, তোমরা কি ইমাম ক্বিরাআত সম্পন্ন করার অবস্থায় তিলাওয়াত করো? সাহাবীগণ নিশ্চুপ রইলেন। হুযূর-ই আক্রাম এটা তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সাহাবীগণ আরয করলেন, "হ্যাঁ আমরা এমনটি করি"। হুযূর এরশাদ করলেন, "আগামীতে এমন করোনা।"

হাদীস নং-১২

ত্বাহাভী শরীফে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণিত-

مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَلَيْسَ عَلٰى فِطْرَةٍ

অর্থ: যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করে, সে 'দ্বীন-ই ফিত্বরাত'-এর উপর নেই।

হাদীস নং-১৩

ইমাম দারু কুত্বনী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّه قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ اَوْ اَنْصِتُ قَالَ بَلْ اَنْصِتْ فَاِنَّه يَكْفِيْكَ

অর্থঃ নিশ্চয় তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করলেন, "আমি কি ইমামের পেছনে ক্বিরাআত করবো না নিশ্চুপ থাকবো?" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "বরং তুমি নিশ্চুপ থাকো। কারণ তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।"

হাদীস নং-১৪

ইমাম দারু কুত্বনী হযরত শা'বী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قِرَاَةَ خَلْفَ الْاِمَامِ

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করা জায়েয নয়।"

হাদীস নং-১৫

ইমাম বায়হাক্বী ক্বিরাআতের আলোচনায় হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ صَلٰوةٍ لَمْ يُقْرَأُ فِيْهَا بِاُمِّ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ اِلاَّ صَلٰوةً خَلْفَ الْاِمَامِ

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া হয় না, তা অপরিপূর্ণ। ওই নামায ব্যতীত, যা ইমামের পেছনে পড়া হয়।

হাদীস নং ১৬-১৭

ইমাম মুহাম্মদ 'মুআত্তা'য়, ইমাম আবদুর রায্যাক্ব তাঁর 'মুসান্নাফ'-এ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَيْتَ فِىْ فَمِ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ حَجَرًا

অর্থঃ তিনি বলেন, আহা, যদি ইমামের পেছনে তিলাওয়াতকারীর মুখগহ্বরে পাথর পুরে দেওয়া হতো!

হাদীস নং ১৮-২৪

ইমাম ত্বাহাভী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ, হযরত যায়দ ইবনে সাবিত হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্, হযরত আলক্বামাহ্, হযরত আলী মুরতাদ্বা ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ সাহাবা-ই কেরাম থেকে পরিপূর্ণ সনদগুলো এ মর্মে বর্ণনাদি সহকারে পেশ করেছেন যে, এসব হযরত ইমামের পেছনে ক্বিরাআতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কোন সাহাবী বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করবে, তার মুখে যেন আগুন পুরে দেওয়া হয়।" "কেউ বলেছেন, "তার মুখে যেন পাথর পুরে দেওয়া হয়।" অন্য কেউ বলেছেন, "সে দ্বীন-ই ফিত্বরাতের বিরোধী।" যদি আমি এ কিতাবের পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা না করতাম, তবে ওইসব বর্ণনা (রেওয়ায়ত) এখানে উল্লেখ করতাম।

এতদ্ব্যতীত ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পন্ন করার বিপক্ষে অনেক হাদীস রয়েছে, যেগুলো থেকে আমি শুধু ২৪টি হাদীস উল্লেখ করে ক্ষান্ত হলাম। যদি কেউ ওইগুলো পাঠ- পর্যালোচনা করার আগ্রহ রাখেন, তবে যেন ত্বাহাভী শরীফ, মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ, সহীহুল বিহারী ও আমার হাশিয়া-ই বোখারী 'নঈমুল বারী', ইত্যাদি পাঠ-পর্যালোচনা করেন।

আক্বল বা বিবেকও চাচ্ছে যেন মুক্বতাদী ইমামের পেছনে তিলাওয়াত না করে। তাও কয়েকটা কারণে-

এক. নামাযে যেমন সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরুরী, তেমনি সূরা মিলানোও জরুরী। মুসলিম শরীফে আছে-

لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَأْ بِاُمِّ الْقُرْان فَصَاعِدًا

অর্থঃ তার নামায হয় না, যে সূরা ফাতিহা এবং আরো কিছু না পড়ে।

গায়র মুক্বাল্লিদগণ (লা-মাযহাবীরা)ও একথা মানে যে, মুক্বতাদী ইমামের পেছনে সূরা পড়বে না।

সুতরাং সূরা ফাতিহাও না পড়া উচিৎ হবে। কারণ, যেমন সূরার বেলায় ইমামের ক্বিরাআত যথেষ্ট, তেমনি সূরা ফাতিহার বেলায়ও যথেষ্ট হওয়া চাই।

দুই. যে কেউ রুকূ'তে ইমামের সাথে মিলিত হয়, সে ওই রাক্'আত পেয়ে যায়। যদি মুক্বতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়া অপরিহার্য হতো, তবে সে রাক্'আত পেয়েছে বলে বিবেচিত না হওয়া উচিৎ ছিলো। দেখুন, যদি এ ব্যক্তি তাকবীর-ই তাহরীমা না বলে, অথবা তাকবীর-ই তাহরীমার সাথে এক তাসবীহর সমপরিমাণ ক্বিয়াম না করে; বরং সোজা রুকূ'তে চলে যায়, তবে সে ওই রাক্'আত পাবে না, কেননা তাকবীর-ই তাহরীমা ও ক্বিয়াম মুক্বতাদীর উপর ফরয; অনুরূপ, যদি তার উপর সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হতো, তবে তা ব্যতীত রাক্'আত পাওয়া যেতোনা।

বুঝা গেলো যে, ইমামের ক্বিরাআত তার জন্য যথেষ্ট। যখন ওই মুক্বতাদীকে ক্বিরাআত থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তখন উচিৎ হবে অন্যান্য মুক্বতাদীকেও অব্যাহতি দেওয়া।

তিন. যদি মুক্বতাদীর উপর 'সূরা ফাতিহা' পড়াও অপরিহার্য হয় আর 'আ-মী-ন' বলাও, তবে বলো, যদি ইমাম মুক্বতাদীর পূর্বে সূরা ফাতিহা পড়ে শেষ করে নেন, আর এ মুক্বতাদী, যে এখন সূরা ফাতিহার মধ্যখানে রয়েছে, তবে সে 'আ-মী-ন' বলবে কিনা? আর সে নিজে যেই সূরা ফাতিহা পড়ছে, সেটার পর সে আ-মী-ন বলবে কিনা? এ প্রশ্নের যে জবাবই দেবেন, হাদীস দেখিয়ে (হাদীসের আলোকে) দেবেন। বস্তুত: না দু'বার 'আ-মী-ন' বলা জায়েয, না সূরা ফাতিহার মধ্যভাগে 'আ-মী-ন' বলা দুরস্ত আছে।

চার. যদি মুক্বতাদী সূরা ফাতিহার মধ্যখানে থাকে, আর ইমাম রুকূ'তে চলে যান, তবে বলো, এ মুক্বতাদী কি সূরা ফাতিহার বাকী অর্দ্ধেক ছেড়ে দেবে, না

রুকূ' ছেড়ে দেবে? এর যে জবাবই দেবেন, হাদীসের আলোকে, হাদীস দেখিয়ে দেবেন; নিজের বিবেক বা যুক্তির আলোকে জবাব দেবেন না।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আহলে হাদীসের সব আলিমের প্রতি আম ঘোষণা- এ ২,৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তরগুলো সবাই মিলে পরামর্শ করে দিন; কিন্তু শর্ত হচ্ছে- সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা দেবেন; নিজেদের নিছক অভিমত দ্বারা দেবেন না। ইনশা-আল্লাহ্, দিতেও পারবেন না। সুতরাং উচিৎ হবে জেদ্ ছাড়ুন, হানাফীদের মতো ক্বোরআন-হাদীসের নির্দেশ অনুসারে আমল করুন! ইমামের অর্থাৎ ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পন্ন করবেন না।

পাঁচ. শাহী দরবারে যখন কোন প্রতিনিধি দল যায়, তখন দরবারের আদাব (নিয়ামাবলী) সবাই পালন করে; কিন্তু বাদানুবাদ সবাই করেন না, যিনি মুখপাত্র হন তিনিই করেন। অনুরূপ, জামা'আত সহকারে নামায সম্পন্নকারী মহান রবের দরবারে প্রতিনিধি দলের আকারে হাযির হন। তখন তাকবীর, তাসবীহ্, ও তাশাহ্হুদ ইত্যাদি সবাই পড়বেন। এটা হচ্ছে ওই দরবারের সালামীর প্রদর্শনী। এটা সবাই প্রদর্শন করবেন। কিন্তু ক্বোরআন তিলাওয়াত, যা হচ্ছে আবেদন-নিবেদনই, শুধু সম্প্রদায়ের (জাতি) প্রতিনিধি (মুখপাত্র)-ই করবেন; অর্থাৎ ইমাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছদ

[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত কিছু প্রশ্ন ও সেগুলোর জবাব]

এ মাসআলায় 'গায়র মুক্বাল্লিদগণ' এ পর্যন্ত যে সব আপত্তি করতে পেরেছে, আমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে, প্রত্যেকটা আপত্তি উদ্ধৃত করে সব ক'টির জবাব পৃথক পৃথকভাবে দিয়ে থাকি। আর যে পদ্ধতিতে তাদের প্রশ্নগুলো আমরা উদ্ধৃত করছি, ইনশা-আল্লাহ্ ওই নিয়মে তারাও করতে পারবেনা। মহামহিম রব কবূল করুন।

আপত্তি নম্বর -১

আয়াত শরীফ- وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ -তে 'ক্বোরআন' মানে জুমু'আহ্র খোৎবা, মুক্বতাদীর নামায নয়, যেমনটি কোন কোন তাফসীরকারক এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন। সুতরাং জুমু'আহর খোৎবা প্রদানের সময় নিশ্চুপ থাকা জরুরি; তবে মুক্বতাদির জন্য 'সূরা ফাতিহা' পড়া নিষিদ্ধ নয়।

জবাব

এ কথা ভুল। কেননা এ আয়াত শরীফ মক্কী (হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে)। সূরা আ'রাফের এ আয়াত। আর জুমু'আহ্‌র নামায ও খোৎবা মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পর আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতে জুমু'আহর খোৎবার কথা কিভাবে বুঝানো হতে পারে?

দ্বিতীয়ত যদিও কিছুক্ষণের জন্য, অসম্ভব কল্পনায়, তা মেনেও নেয়া হয় তবুও যেহেতু আয়াতে খোৎবার শর্তারোপ করা হয়নি, শুধু ক্বোরআন পাঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেহেতু এ নির্দেশ সব ক'টি বিষয়ে প্রযোজ্য। কেননা, আয়াতে ব্যাপকতাই বিবেচ্য। আয়াতটি সেটার শানে নুযূল বা অবতরণের প্রেক্ষাপটের সাথেও খাস নয়।

তৃতীয়ত যখন খোৎবায় লোকজনকে কিছু বলা হারাম, অথচ পূর্ণ খোৎবা তো ক্বোরআন নয় বরং তাতে ক্বোরআনের দু'/একটি আয়াত শরীফ পাঠ করা হয়, ইমামের পেছনে, যখন পূর্ণ ক্বোরআন পড়া হয়, তখন নিশ্চুপ থাকা কেন জরুরী হবে না? আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ওহে লা মাযহাবীরা! আপনারা জুমু'আহ্‌র খোৎবা পড়ার সময় নিশ্চুপ থাকা জরুরী বলেন, কিন্তু ইমামের পেছনে নিশ্চুপ থাকতে নিষেধ করছেন!

আপত্তি নম্বর-২

আয়াত শরীফ-وَاِذَا قُرِئَ-এর মধ্যে মক্কার মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে; যারা হুযূর-ই আকরামের ক্বোরআন তিলাওয়াতের সময় শোর-চিৎকার করতো আর আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে- 'ক্বোরআন পাঠের সময় দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে শোরগোল করোনা; সুতরাং (ইমামের পেছনে) সূরা ফাতিহা পড়া এ নিষেধের আওতায় পড়ে না।

জবাব

এটাও ভুল কথা। আয়াতে সম্বোধন শুধু মুসলমানদেরকে করা হয়েছে। কেননা, কাফিরদের উপর কোন ইবাদত অপরিহার্য নয়, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে। ক্বোরআন শোনাও ইবাদত। এটা তাদের (মুশরিকগণ) উপর ঈমান না আনলে কীভাবে ওয়াজিব হবে?

দ্বিতীয়ত আয়াত শরীফের শেষ ভাগে আছে- لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ(যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়)। ক্বোরআন শুনলে রহমত শুধু মুসলমানদের উপর বর্ষিত

হয়; কাফির ঈমান না এনে যে কোন নেক কাজ করুক না কেন, রহমত পাবার উপযোগী হতে পারে না। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

مِنْهُمْ مَنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً

অর্থাৎ "কোন কোন কাফির আপনার দিকে কান লাগিয়ে শোনে। আমি তাদের হৃদয়ের উপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি।" দেখুন, কাফিরদের মনযোগ সহকারে শোনা তাদের কোন উপকারে আসেনি।

অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে-

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا অর্থাৎ তারা যা কিছু আমল করেছিলো আমি ইচ্ছা করে সেগুলোকে সূক্ষ্ম বালি কণার ন্যায় করে দিয়েছি। যদি কাফির গোটা ক্বোরআন মুখস্থও করে নেয় আর প্রতিদিন তিলাওয়াতও করে, তবুও তারা সাওয়াবের উপযোগী হবে না। ওযূ ব্যতীত নামায শুদ্ধ হয় না। ঈমান ব্যতীত কোন আমল কবূল হয় না।

তৃতীয়ত ক্বোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে- وَاَنْصِتُوْا (এবং তোমরা নিশ্চুপ থাকো)। এ নিশ্চুপ থাকার মানে হচ্ছে- না কথাবার্তা বলো, না কোন কিছু পাঠ করো। যদি সূরা ফাতিহা পড়তে থাকো, তবে নিশ্চুপ রইলে কি করে? মোটকথা, না এ আয়াত কাফিরদের উদ্দেশে নাযিল হয়েছে, না জুমু'আর খোৎবার জন্য; বরং নামাযীদেরকে ইমামের পেছনে ক্বিরআত থেকে বিরত থাকার জন্য নাযিল হয়েছে। সুতরাং বায়হাক্বী শরীফে হযরত মুজাহিদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ فَسَمِعَ قِرْأَةَ فَتًى مِّنَ الْاَنْصَارِ فَنَزَلَ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ ..الخ

অর্থাৎ তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযে ক্বিরআত সম্পন্ন করছিলেন। তিনি এক আনসারী যুবকের ক্বিরআত শুনতে পেলেন। তখন এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছেঃ "এবং যখন ক্বোরআন পড়া হয়...।" [সহীহ্-ই বিহারী]

ইবনে মরদুয়াইহ্ তাঁর তাফসীরগ্রন্থে সনদ সহকারে হযরত মু'আভিয়া ইবনে ক্বুর্‌রাহ্ থেকে বর্ণনা করেছেন; তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুগাফ্‌ফাল সাহাবী-ই রসূলকে এ আয়াত শরীফের অবতরণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জবাবে বললেন-

قَالَ اِنَّمَا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ الخ فِىْ قِرْاَءَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ - وَاِذَا قَرَاَ الْاِمَامُ فَاسْتَمِعْ لَهٗ وَاَنْصِتْ [بهارى]

অর্থাৎ এ আয়াত وَاِذَا قُرِئَ الخ ইমামের পেছনে ক্বিরআতের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। সুতরাং যখন ইমাম ক্বিরাআত সম্পন্ন করেন, তখন তোমরা মনযোগ সহকারে শোনো এবং চুপ থাকো। [সহীহ্-ই বিহারী]

আপত্তি নম্বর -৩

যদি ক্বোরআন তিলাওয়াতের সময় সবাইকে নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে তো মুসীবৎ এসে যাবে। আজকাল রেডিওতে ক্বোরআন তিলাওয়াত করা হয়, যা সমগ্র দেশে শোনা যায়, সুতরাং সবার কাজ-কারবার, সালাম-কালাম হারাম হয়ে যাবে। ইমাম তারাবীহ্ পড়াচ্ছেন। এক ব্যক্তি আসলো, যে তখনো ফরয পড়েনি; অথচ সে ওই মসজিদে এশার ফরয পড়ে থাকে; যেখানে 'ক্বিরআত' (ক্বোরাআন তিলাওয়াত)-এর আওয়াজ আসছে। এটাও তো হারাম হয়ে যাবে। মোটকথা, এ 'মর্মার্থ' উম্মতের জন্য অসহনীয় কষ্টের কারণ হয়ে যাবে। [বর্তমানকার ওহাবী প্রশ্নকর্তা]

জবাব

সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য একথার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, ক্বোরআনের তিলাওয়াত শোনা 'ফরয-ই কেফায়া'; 'ফরয-ই আইন' নয়। যদি ক্বারীর ক্বিরাআত একজন মুসলমানও শুনে, তাহলে যথেষ্ট; যেমন জানাযার নামায। তা যদিও সবার উপর ফরয, কিন্তু একজন পড়ে নিলে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। ইমামের পেছনে সকল মুক্বতাদী 'এক ব্যক্তি' বলে বিবেচিত। যেমন জানাযার নামাযের জমা'আত। সুতরাং মুক্বতাদীদের মধ্য থেকে তো কেউ সালাম - কালাম ও তিলাওয়াত করতে পারে না। যারা মুক্বতাদী হয়নি, তাদের জন্যও ওইসব মুক্বতাদীর শোনা যথেষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সবলোক কাজ-কারবারে ব্যস্ত থাকে, কেউ না শোনে, তাহলে উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। অনুরূপ, এক মজলিসে কয়েকজন লোক উচ্চস্বরে ক্বোরআন-ই করীম তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। সুতরাং হয়তো একজন তিলাওয়াত করবে, সবাই শুনবে, অথবা সবাই বিনা আওয়াজে পাঠ করবে। এর গবেষণাধর্মী বিবরণ 'শামী' ইত্যাদি ফিক্বহ্-ফাত্ওয়ার কিতাবে দেখুন। সুতরাং তখন না কোন বিপদ হবে, না কোন মুসীবৎ।

আপত্তি নম্বর -৪

এ থেকে একথা অপরিহার্য হয়ে যায় যে, (এমনটি হলে) মকতবে একাধিক শিশু একসাথে ক্বোরআন শরীফ উচ্চ আওয়াজে শিখতে বা মুখস্থ করতে পারবেনা। এটাতো আরেক মহা সমস্যা!

জবাব

ওখানে তো ক্বোরআন শিক্ষা দেয়া হয়, নিছক তিলাওয়াত করা হয় না। তিলাওয়াত শোনা ফরয, তবে ক্বোরআন শিক্ষা দেওয়ার সময় শোনা (ফরয) নয়। এ কারণে মহান রব এরশাদ করেছেন- اِذَا قُرِئَ (যখন তিলাওয়াত করা হয়); اِذَا عُلِّمَ (যখন শিক্ষা দেওয়া হয়) এরশাদ করেননি।

দেখুন, মহামহিম রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ (যখন তুমি ক্বোরআন পড়ার ইচ্ছা করো, তখন ক্বোরআন তিলাওয়াতের পূর্বক্ষণে 'আ'ঊযুবিল্লাহ্' পড়ো। কিন্তু যখন ছাত্র শিক্ষককে ক্বোরআন শোনায়, তখন 'আ'ঊযু' পড়বেনা। কারণ, এটা ক্বোরআনের নিছক তিলাওয়াত নয়; বরং ক্বোরআন শিক্ষা দেওয়া। [সূত্র. ফাতাওয়া-ই শামী ইত্যাদি]

অনুরূপ, ক্বোরআন মজীদ উল্টো বিন্যাসে ছাপানো নিষিদ্ধ; বরং সঠিক বিন্যাসে ছাপানো জরুরী। কিন্তু শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সর্বশেষ পারা (আমপারা) উল্টোভাবে ছাপানোও হয়, উল্টো দিক থেকে পড়ানোও হয়।

শিক্ষাদান ও ক্বিরাআত (তিলাওয়াত)-এর বিধানের মধ্যে পার্থক্য আছে। ক্বোরআন করীমও তিলাওয়াত ও তা'লীমের মধ্যে পার্থক্য করেছে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الخ (অর্থাৎ: ওই নবী মুসলমানদের নিকট আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছেন এবং তাদেরকে পবিত্র করছেন; তাদেরকে ক্বোরআন ও হিকমত শিক্ষা দিচ্ছেন)। যদি তিলাওয়াত ও শিক্ষাদানের মধ্যে পার্থক্য না থাকতো, তাহলে ওই দু'টিকে পৃথক পৃথকভাবে কেন এরশাদ করেছেন?

আপত্তি নম্বর-৫

আপনাদের (হানাফী সুন্নীগণ) পেশকৃত হাদীস শরীফ- قِرْاَءَةُ الْاِمَامِ لَهٗ قِرَاءَةٌ এবং وَاِذَا قُرِئَ فَاَنْصِتُوْا (যথাক্রমে, ইমামের ক্বিরআত মুক্বতাদীদের জন্য যথেষ্ট এবং যখন ক্বিরআত করা হয় তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকো)-এর মধ্যে قِرَاءَة শব্দ এসেছে, যার অর্থ 'পাঠ করা'। সুতরাং এ হাদীস দু'টির মর্মার্থ হলো- 'যখন

ইমাম পড়বেন, তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকো'। তিনি যাই পড়ুন না কেন? ক্বোরআন পড়ুন কিংবা অন্য কিছু। সুতরাং ইমামের পেছনে 'সুবহানাল্লাহ্', 'আত্তাহিয়্যাত' ও দুরূদ শরীফ ইত্যাদিও পড়া যাবেনা; কারণ, ইমামতো পড়ছেন। (প্রশ্নকর্তা: বর্তমানকার বিবেকবান বলে দাবীদার ওহাবী।)

জবাব

এর দু'টি জবাব দেওয়া যায়ঃ একটা 'ইলযামী' (তাদের কথার ভিত্তিতে), আর অপরটি গবেষণাভিত্তিক। প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে জবাব হচ্ছে- যদি এভাবে শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থই নেওয়া হয়, তবে হে (লা-মাযহাবীরা!) আপনারাও বিপদে পড়বেন। যেমন- আপনারা নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে দাবী করে থাকেন; অথচ 'হাদীস' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'কথাবার্তা', 'কিচ্ছা-কাহিনী'। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَبِاَىِّ حَدِيْثٍ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ অর্থাৎ এরপর তারা কোন্ কথার উপর ঈমান আনবে? আরো এরশাদ হচ্ছে- فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِيْثَ অর্থাৎ: আমি ওই জনগোষ্ঠীকে কিচ্ছা-কাহিনীতে পরিণত করে দিয়েছি। সুতরাং 'আহলে হাদীস'-এর অর্থ দাঁড়ায় হয়তো মনগড়া কথাবার্তা রচনাকারী বাচাল, অথবা কিচ্ছা-কাহিনী ও নভেল পাঠক কিংবা পড়ে শোনায় এমন কিছুলোক।

শুনুন, এখানে 'হাদীস' শব্দের পারিভাষিক অর্থ বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'ফরমান' বা পবিত্র 'বাণী'। 'ওহী' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'ইঙ্গিত'। 'ইসলাম' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'আনুগত্য করা' আর 'কলেমা'র অর্থ 'লফয' (মুখ থেকে নিক্ষেপ করা)। পবিত্র ক্বোরআনে এসব শব্দ এসব (আভিধানিক) অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। বলুন, এখন কোথায় যাবেন? (এভাবে অর্থ করলে) সম্পূর্ণ ইসলামই শেষ হয়ে যাবে, ক্বোরআনের বিধানগুলো নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আর গবেষণাভিত্তিক জবাব হচ্ছে- নামাযের কথা উল্লেখ করার সময় যখন 'ক্বিরাআত (قِرَاءَة) শব্দটা বলা হয়, তখন তা দ্বারা 'ক্বোরআন তিলাওয়াত' বুঝায়। আমরা বলি নামাযের ছয়টি 'রুকন' আছে- তাকবীর-ই তাহ্রীমাহ্, ক্বিয়াম, ক্বিরাআত, রুকূ', সাজদাহ্ এবং শেষ বৈঠক অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাত পড়ার জন্য বসা। এখানে 'ক্বিয়াম' মানে 'নর্তন করার জন্য দাঁড়ানো' নয়, 'ক্বিরআত'

মানেও 'নভেল পড়া' নয়। কাজেই, একটু বুঝেসুঝে কথা বলুন। এতটুকু বুঝেই কি রসূল-ই পাকের হাদীস শরীফ বুঝার দাবী করছেন? কবি বলেন-

گر ہمیں مکتب و ہمیں ملا کار طفلاں تمام خواہد شد

অর্থাৎ যদি আমাদের জন্য একটি মকতব আর মকতবে মোল্লাজি পাওয়াই যথেষ্ট হতো, তবে তো (মকতবের) শিশুদের পড়াই যথেষ্ট হয়ে যেতো।

আপত্তি নম্বর -৬

বোখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হুযূর করীম এরশাদ করেছেন- لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَاْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ (অর্থাৎ তার নামায হয়না, যে সূরা ফাতিহা পড়েনা।) এ হাদীস শরীফ থেকে দু'টি মাসআলা প্রতীয়মান হয়- ১. নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয; এটা ব্যতীত নামায একেবারে শুদ্ধ হয়না; যেমন ক্বিয়াম ও রুকূ' ইত্যাদি, ২. সবার উপর (সূরা ফাতিহা পড়া) ফরয:নামাযী একাকী নামায পড়ুক কিংবা ইমাম হোন, অথবা মুক্বতাদী হোক। হাদীস শরীফে কোনরূপ শর্তারোপ করা হয়নি।

জবাব

এর তিনটি জবাব রয়েছে- দু'টি 'ইলযামী' (বিরুদ্ধবাদীদের কথার ভিত্তিতে), আরেকটি গবেষণাভিত্তিক।

প্রথম ইলযামী জবাব তো এ'যে, হাদীসটা ইমাম মুসলিম এভাবে বর্ণনা করেছেন-

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَّمْ يَقْرَاْ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا অর্থাৎ তার নামায হয়না, যে সূরা ফাতিহা অতঃপর আরো কিছু পড়েনা।

আর 'মুআত্ত্বা-ই ইমাম মালিক'-এ এ-ই হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে- لَا صَلٰوةَ لِلْاَبِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَالسُّوْرَةِ (নামায হয়না, কিন্তু সূরা ফাতিহা এবং আরো সূরা পড়লে।) সুতরাং (হে সালাফী, লা-মাযহাবীরা!) আপনাদের উচিত হচ্ছে- মুক্বতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়াকে ফরয বলে জানা, সূরা মিলানোকেও। আপনারা তো কিছু সংখ্যক হাদীসের উপর ঈমান আনছেন, আর কিছু সংখ্যককে অস্বীকার করছেন।

দ্বিতীয় (ইলযামী) জবাব

আপনাদের পেশকৃত হাদীস তো ক্বোরআন-ই করীমেরও বিপরীত আর ওইসব হাদীসেরও, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে পেশ করেছি; বরং আপনাদেরও বিপক্ষে। (কারণ) ক্বোরআন-ই করীম এরশাদ করছে- فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰن ...الاية(সুতরাং ক্বোরআন থেকে যে পরিমাণ সহজ হয়, পড়ে নাও)! কাজেই, সূরা ফাতিহা পড়া কীভাবে ফরয হতে পারে? আরো এরশাদ হচ্ছে- وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا (অর্থাৎ আর যখন ক্বোরআন পড়া হয়, তখন কান লাগিয়ে শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো... আল-আয়াত) তারপরও মুক্বতাদী ইমামের সাথে সূরা ফাতিহা পড়ে মহান রবের এ হুকুমের বিরোধিতা কিভাবে করবে? আমি অনেক হাদীস বর্ণনা করেছি, যেগুলোতে এরশাদ করা হয়েছে যে, 'ইমামের ক্বিরআতই মুক্বতাদীর ক্বিরআত'। যখন ইমাম ক্বিরআত সম্পন্ন করবেন, তখন তোমরা নিশ্চুপ থাকো' ইত্যাদি।

আপনারাও বলে থাকেন, যে ব্যক্তি রুকূ'তে ইমামের সাথে মিলিত হয়েছে সে রাক'আত পেয়ে গেছে। যদি মুক্বতাদীর উপর সূরা ফাতিহা ফরয হতো, তবে সে তা ব্যতীত রাক'আত কীভাবে পেলো? তার উপর ওযূ, পবিত্রতা অর্জন, তাকবীর-ই তাহরীমা ও ক্বিয়াম ফরয ছিলো। যদি তন্মধ্যে কোন একটাও ছেড়ে দিয়ে রুকূ'তে সামিল হয়ে যায়, তা হলেও তো নামায পাবে বলে বিবেচিত হবেনা। সূরা ফাতিহা কীভাবে মাফ হয়ে গেলো? তা তো (আপনাদের মতে) ফরয ছিলো!

গবেষণার আলোকে জবাব হচ্ছে- এ হাদীসের এমন অর্থ করা চাই, যাতে ক্বোরআন ও হাদীসের বিরোধিতা না হয়, হাদীসগুলোও পরস্পর বিরোধী না হয়ে যায়, আপত্তিও না আসে। তা হচ্ছে এ-ইঃ لَاصَلٰوةَ -এর لا - نفى جنس -এর; যার اسم হচ্ছে صلٰوة ; তবে একটা অংশ এখানে উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ كامل (কামিল)। সুতরাং অর্থ দাঁড়ায় নামায সূরা ফাতিহা ব্যতীত পরিপূর্ণ (কামিল) হয়না। ক্বোরআনের যে কোন অংশ থেকে (প্রয়োজনীয় পরিমাণ) পড়া ক্বোরআনের হুকুমে ফরয হলো, আর সূরা ফাতিহা হাদীস শরীফের নির্দেশে 'ওয়াজিব' হলো। যেমন-

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ (হুযূর-ই ক্বলব বা একাগ্রচিত্তে না পড়লে নামায হয় না) এবং لَا صَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ (যে ব্যক্তি মসজিদের নিকটে থাকে, তার নামায মসজিদে ব্যতীত হয়না।) এ দু'টি হাদীসে لَا صَلٰوة -

এর মধ্যে নামাযের পরিপূর্ণতা (كمال صلٰوة)-এর অস্বীকৃতি রয়েছে; মূল নামাযের নয়। তদুপরি, এখানে لِمَنْ يَّقْرَأْ -এর মধ্যে প্রত্যক্ষ ক্বিরাআত ও পরোক্ষ ক্বিরআত উভয়ই সামিল রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম ও একাকী নামায সম্পন্নকারীর জন্য প্রত্যক্ষভাবে 'সূরা ফাতিহা' পড়া ওয়াজিব, আর মুক্বতাদীর উপর পরোক্ষভাবে। অর্থাৎ ইমামের পড়া তার জন্য যথেষ্ট। আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলো এ হাদীসেরই ব্যাখ্যা। অথবা এ হাদীস ব্যাপক (عام) আর আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলো সেটাকে বিশেষিত (خاص) করে; যেগুলো মুক্বতাদীকে এ নির্দেশের সাথে খাস করেছে।

আপত্তি নং ৭

তিরমিযী শরীফে হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত, যার শেষের শব্দাবলী নিম্নরূপ-

قَالَ اِنِّىْ اَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ وَرَآءَ اِمَامِكُمْ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ لَا تَقْرَءُوْا اِلَّا بِاُمِّ الْقُرْاٰن

অর্থ: হুযূর-ই আক্রাম সাহাবীদের বললেন, আমার মনে হয় যে, তোমরা তোমাদের ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পন্ন করো। আমরা আরয করলাম, হ্যাঁ, তিনি বললেন, "সূরা ফাতিহা ব্যতীত আর কিছু পড়ো না।"

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে এরশাদ হচ্ছে যে, ইমামের পেছনে মুক্বতাদী সূরা ফাতিহা পড়বে। অন্য কোন সূরা পড়বে না। আমরা তো এটাই বলছি। হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিতের এ হাদীস আবূ দা'ঊদ, নাসাঈ ও বায়হাক্বী শরীফেও আছে।

খন্ডন

এ আপত্তির কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস আপনাদেরও পরিপন্থী। কেননা আপনারাও বলেন যে, ইমামের সাথে রুকূ'তে মিলিত হলে রাক্'আত পাওয়া যায়। কেন জনাব? যখন মুক্বতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়া ফরয, তখন ওই মুক্বতাদী সূরা ফাতিহা পড়া ব্যতীত এ রাক্'আত কিভাবে পেয়ে গেলেন? এর জবাব চিন্তা করে বের করুন! আপনারা যা জবাব দেবেন, আমাদের জবাবও তা-ই হবে।

দুই. শুধু হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এ হাদীস 'মারফূ' সূত্রে বর্ণিত, যাতে হুযূর-ই আক্রাম ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ার হুকুম দিয়েছেন। কিন্তু এর বিপরীত হযরত জাবির, হযরত আলক্বামাহ্, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ, হযরত যায়দ ইবনে সাবিত,

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হযরত আলী ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত, ওইগুলো থেকে কয়েকটা হাদীস আমি প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি এবং ত্বাহাভী শরীফে ও সহীহুল বিহারীতে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হযরত ওবাদার এ বর্ণনা 'খবর-ই ওয়াহিদ' হলো আর ওই সাহাবা-ই কেরামের বর্ণনাগুলো 'হাদীস-ই মাশহুর'-এর মর্যাদা রাখে। সুতরাং ওই গুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে।

তিন. আপনাদের পেশকৃত হাদীস-ই ওবাদাহ্ ক্বোরআনেরও পরিপন্থী। ক্বোরআন মজীদ ক্বোরআন তিলাওয়াতের সময় নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দিয়েছে। আমাদের উপস্থাপিত হাদীস শরীফগুলোকে যেহেতু ক্বোরআন-ই করীম সমর্থন করছে, সেহেতু সেগুলোকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে।

চার. আপনাদের পেশকৃত হাদীসে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়ার নির্দেশ রয়েছে। আর ওইসব হাদীসে, যেগুলো আমরা পেশ করেছি, তা পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। 'নাসগুলো' পরস্পর বিরোধী হলে, নিষেধের 'নাসগুলো'কে প্রাধান্য দিতে হয়। দেখুন, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে সম্মানের সাজদা করার হুকুম ক্বোরআন করীমে মওজূদ আছে। ফেরেশতাদেরকে এর হুকুম দেওয়া হয়েছে, বরং শয়তান 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সত্তা (হযরত আদম) কে সাজদা না করার কারণে ধিক্কৃত হয়ে গেছে; কিন্তু অন্যান্য 'নাস'-এ এ সাজদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এখন এ নিষেধ অনুসারেই আমল করা হয়।

পাঁচ. হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিতের এ হাদীস না ইমাম বোখারী উল্লেখ করেছেন, না ইমাম মুসলিম। নিষেধের হাদীস মুসলিম শরীফে রয়েছে। তাছাড়া, ইমাম তিরমিযী সেটা উদ্ধৃত করে সেটাকে 'সহীহ্' বলেননি, বরং 'হাসান' পর্যায়ের বলেছেন। আর বলেছেন, "অধিকতর সহীহ্ হচ্ছে অন্য কিছু।" বরাত দেখুন, তিরমিযীতে তোমাদের পেশকৃত হাদীসের সাথে এটাই রয়েছে-

قَالَ اَبُوْ عِيْسى حَدِيْثُ عُبَادَةَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَرَوٰى هٰذَاالْحَدِيْثَ الزُّهْرِىُّ عَنْ مَحْمُوْدِ الرَّبِيْعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهٰذَا اَصَحُّ

অর্থ: ইমাম আবূ ঈসা বলেন, হযরত ওবাদার এ হাদীস 'হাসান'; (সহীহ্ নয়।) এ-ই হাদীস ইমাম যুহ্রী মাহমূদ ইবনে রাবী' থেকে, তিনি হযরত ওবাদাহ্

ইবনে সামিত থেকে বর্ণনা করেছেন এ মর্মে যে, হযরত ওবাদাহ্ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না, তার নামায হয় না। এ বর্ণনাই বেশী সহীহ্।

বুঝা গেলো যে, অধিকতর সহীহ্ হচ্ছে ওই বচনগুলো, যেগুলোতে ইমামের পেছনে মুক্বতাদীর সূরা ফাতিহা' পড়ার উল্লেখ নেই। 'আশ্চর্য! আপনারা সহীহ্ হাদীসের মোকাবেলায় এমন এক হাদীস পেশ করছেন, যা ক্বোরআনেরও বিপক্ষে, 'মশ্হুর হাদীসগুলো'রও বিপরীত। আর ইমাম তিরমিযীর মতে 'সহীহ্'ও নয়; বরং 'হাসান' পর্যায়ের। আর বিপরীতে যা রয়েছে তা বেশী সহীহ। আপনারা হানাফীদের বিপক্ষে যার অভিযোগ করছেন, তা নিজেরা (নিজেদের বিপক্ষে) করছেন!

আপত্তি নং ৮

অধিকাংশ সাহাবা-ই কেরামের আমল হচ্ছে এটাই যে, তাঁরা ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পন্ন করতেন। ইমাম তিরমিযী এ হাদীস-ই ওবাদাহ্ ইবনে সামিতের ব্যাখ্যায় বলছেন-

عَمَلُ الْعُلٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ فِى الْقِرَاَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ

অর্থ: ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পর্কে বেশীর ভাগ সাহাবী ও তাবে'ঈর এ হাদীসে ওবাদাহ্ অনুসারে আমল রয়েছে।

যখন বেশীরভাগ সাহাবীর আমল এ অনুসারে রয়েছে, তখন সূরা ফাতিহা অবশ্যই পড়া চাই।

খন্ডন

এর কতিপয় জবাব দেওয়া যায়-

এক. ইমাম তিরমিযীর এখানে 'আকসার' (বেশীর ভাগ) বলা আপেক্ষিক নয় বরং প্রকৃতই। এর অর্থ এ নয় যে, বেশীর ভাগ সাহাবী তো ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা পড়তেন, কম সংখ্যক সাহাবী পড়তেন না; বরং 'আকসার' মানে কয়েকজন। ক্বোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে-

وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ عَلَى الْهُدٰى وَكَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ

অর্থ: তাদের মধ্যে অনেকে হিদায়তের উপর রয়েছে, আর অনেকের উপর পথ ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছে।

সঠিক কথা হচ্ছে- বেশীর ভাগ সাহাবী ইমামের পেছনে ক্বিরাআতের ঘোর বিরোধী, যেমন-

১. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত বলেন- যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করে তার নামায হয় না। [সহীহুল বিহারী]

২. হযরত আনাস বলেন, যে ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করে, তার মুখ যেন আগুনে ভর্তি হয়ে যায়! [ইবনে হাব্বান]

৩. হযরত আবদুল্লাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করে, তার মুখ যেন দুর্গন্ধে ভর্তি হয়ে যায়। [ইবনে হাববান]

৪ ও ৫. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ ও হযরত আলক্বামাহ্ বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে ক্বিরাআত সম্পন্ন করে, তার মুখে মাটি পড়ুক!

[ত্বাহাভী শরীফ]

৬. হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করে, সে ফিত্বরাত-এর উপর নেই।" [ত্বাহাভী শরীফ]

৭. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করে তার নামায হয় না।" [ইবনে জূযী ফিল 'ইলাল]

৮. হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করে, আহা, যদি তার মুখে পাথর পড়তো!"

[মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ ওয়া আবদুর রায্যাক্ব]

৯. হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেন, "যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করে, তার মুখে যেন অঙ্গার হয়।" [মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ, আবদুর রায্যাক্ব]

১০. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর নিজেও ইমামের পেছনে তিলাওয়াত করতেন না, কঠোরভাবে অন্য লোকদের নিষেধও করতেন, আর বলতেন, "ইমামের ক্বিরাআত' যথেষ্ট।" [মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ]

এসব ক'টি বর্ণনা 'ত্বাহাভী শরীফ' এবং 'সহীহুল বিহারী' তে মওজূদ আছে। এগুলো তো নমুনা স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। অন্যথায় আশিজন সাহাবী থেকে বর্ণিত যে, তাঁরা ইমামের পেছনে ক্বিরাআত করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। দেখুন, 'শামী', 'ফাত্হুল ক্বদীর' ইত্যাদি। যদি কিছু সংখ্যক রেওয়ায়ত এ মর্মে এসে যায় যে, তাঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক হযরত সূরা ফাতিহা পড়তেন, তাহলে হয়তো তা তাঁদের প্রথম দিকের আমল ছিলো, যা পরবর্তীতে মান্সূখ হয়ে গেছে, অথবা ওইসব রেওয়ায়ত বর্জনযোগ্য, কেননা, ক্বোরআনের পরিপন্থী।

আপত্তি নং ৯

এসব ক'টি রেওয়ায়ত দ্ব'ঈফ (দুর্বল)। (ওই পুরানা সবক)

খন্ডন

জ্বী-হাঁ! এজন্য দ্ব'ঈফ বা দুর্বল যে, সেগুলো আপনাদের বিপক্ষে। হয়তো আপনাদের উপর ওইগুলো দ্ব'ঈফ মর্মে ইলহাম হয়েছে। আমরা 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল) সম্পর্কে ইতোপূর্বে অনেক কিছু আরয করেছি। যেমন- 'জরহে মুবহাম' (সন্দেহপূর্ণ ত্রুটি নির্ণয়) বিবেচনাযোগ্য নয়। তাছাড়া, ইমাম-ই আ'যম যখন এ হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন, তখনতো সেগুলো 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল) ছিলোনা; পরবর্তীতে দুর্বলতা এসেছে। পরবর্তীকালীন দুর্বলতা ইমাম-ই আ'যমের জন্য ক্ষতিকর নয়। তাছাড়া, কয়েকটা দুর্বল হাদীস মিলে হাদীসকে 'হাসান' করে দেয়। ইত্যাদি।

আপত্তি- ১০

যদি ইমাম নিম্নস্বরে তিলাওয়াত করছেন, যেমন যোহর ও আসরে, অথবা মুক্বতাদী অনেক দূরে থাকে, যেখানে ইমামের ক্বিরাআতের আওয়াজ পৌঁছেনা, তবে উচিৎ হবে তার সূরা ফাতিহা পড়ে নেওয়া; কেননা, এখনতো সূরা ফাতিহা পড়লে ক্বোরআন শোনার মধ্যে ক্ষতি হচ্ছে না।

খন্ডন

এ আপত্তি তখনই দুরস্ত হতো, যখন নিশ্চুপ থাকা শুধু ক্বোরআন শোনার জন্য হতো, অথচ নিশ্চুপ থাকার বিধান আলাদা এবং শোনার নির্দেশ আলাদা। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَاسْتَمِعُوْا لَه وَاَنْصِتُوْا(সুতরাং তা মনযোগ সহকারে শোনো এবং নিশ্চুপ থাকো)। এটা তেমনি, যেমন আল্লাহ্ তা'আলার এরশাদ- اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ (তোমরা নামায কায়েম করো এবং যাকাত প্রদান করো। যেমন যাকাত ফরয হওয়া, নামাযের কারণে নয়; বরং এটা নামায থেকে পৃথক স্বতন্ত্র ফরয, তেমনি নিশ্চুপ থাকা একটি স্বতন্ত্র জরুরী জিনিস। নিরব নামাযগুলোতে নিশ্চুপ থাকা রয়েছে, শোনা নেই। উচ্চস্বরে ক্বিরাআতের নামাযগুলোতে নিশ্চুপ থাকাও জরুরী, শোনাও জরুরী।

আপত্তি নং-১১

যখন মুক্তাদী নামাযের সমস্ত রুকন (অভ্যন্তরীণ ফরয) সম্পন্ন করে, যেমন- তাকবীর-ই তাহরীমাহ্, ক্বিয়াম, রুকূ' ইত্যাদি, তখন তিলাওয়াতও নামাযের এটা রুক্ন। তাও পালন করুন। এটা কেমন নিয়ম যে, সব ক'টি রুক্ন পালন করছেন, এ একটা ছেড়ে দিচ্ছেন?

খন্ডন

এর জবাব আমি ইতোপূর্বে দিয়েছি। তা হচ্ছে- জমা'আত সহকারে নামাযে মুসলমানগণ প্রতিনিধিদল হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাযির হয়, তাদের প্রধান হন ইমাম। শাহী দরবারের নিয়মানুসারে ক্বিয়াম, রুকূ', সাজদাহ্, তাহিয়্যাহ্ ও সানা সবই আরয করবে; কিন্তু আবেদন-নিবেদন অর্থাৎ তিলাওয়াত-ই ক্বোরআন শুধু দল-প্রধানই তাদের পক্ষ থেকে করবেন। মুক্বতাদীর উপর এজন্যই তিলাওয়াত ফরয নয়; বরং নিষিদ্ধ। তার উপর আদব সহকারে দাঁড়িয়ে থাকা ক্বোরআন-ই করীমের নির্দেশেই ফরয।

আপত্তি নং ১২

রুকূ'তে মিলিত হয় এমন মুক্বতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়া মাফ, যেমন মুসাফিরের উপর, চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযে দু' রাক্'আত মাফ। কেননা, এ বিধান হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

খন্ডন

আলহামদু লিল্লাহ্! আপনারা হানাফী মাযহাবের কাছাকাছি হয়ে গেছেন! ব্যাস, আমরা তো এটাই বলে থাকি যে, ইমামের পেছনে 'সূরা ফাতিহা' পড়া মাফ, যেমন মুসাফিরের উপর দু' রাক্'আত ফরয নামায মাফ। কেননা, ইমামের ক্বিরাআত তার ক্বিরাআত। আপনারা মেনে নিলেন যে, لا صَلوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ... (যারা সূরা ফাতিহা পড়েনি, তাদের নামায নেই) বিশিষ্ট হাদীস সেটার বাহ্যিক ব্যাপকতার উপর নেই; কোন কোন নামাযী এ বিধান বর্হিভূত। ব্যাস! আমরা তো এটাই শুনতে চাই যে, আপনাদের মতেও বিশেষ বিশেষ মুসল্লী এ বিধান-বর্হিভূত; আর আমাদের মতে আম মুক্বতাদী। হাদীসে 'কিছু সংখ্যক বর্হিভুত' মানার মধ্যে আমরা ও আপনারা এক সমান হয়ে গেলাম; শুধু বহির্ভূতদের পরিমাণের মধ্যে কিছুটা আলোচনার অবকাশ রয়েছে মাত্র। ইনশা-আল্লাহ্! তাও মেনে যাবেন। এ খন্ডন 'ইলযামী' (আপত্তির ভিত্তিতে পাল্টা) জবাবই ছিলো।

গবেষণাধর্মী খন্ডন বা জবাব নিম্নরূপঃ

শরীয়তে, কোন কোন অবস্থায় নামায অর্দ্ধেক হয়ে থেকে যায়; যেমন- সফরে, কখনো কখনো একেবারে মাফ হয়ে যায়। যেমন- স্থায়ী উম্মাদনা, নারীসূলভ অপবিত্রতার অবস্থায়। কিন্তু নামাযের অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত ফরযগুলো কোন অবস্থায় মাফ হয় না। অবশ্য কোন কোন বিশেষ কারণে এর পরিবর্তে বিকল্প

বিধান দেওয়া হয়; একেবারে মাফ কখনো হয় না। যেমন- ওযূর বিকল্প তায়াম্মুম, ক্বিয়ামের বিকল্প 'ক্বা'দাহ্' রাখা হয়েছে; কিন্তু ওযূ ব্যতীত কোন কারণেই নামায জায়েয নয়। যদি মুক্বতাদীর জন্য সূরা ফাতিহা পড়া নামাযের রুক্ন হতো, তবে তা ছুটে গেলে রাক্'আত মোটেই পাওয়া যেতো না। বুঝা গেলো যে, তার জন্য ইমামের ক্বিরাআত হচ্ছে বিকল্প। ব্যাস, আমরা এটাই বলি। সুতরাং এ মাসআলাকে সফরের নামাযের উপর ক্বিয়াস করা একেবারে বিবেকগ্রাহ্য নয়। দেখুন, যদি নামাযে কেউ রুকূ'তে সামিল হয়, তবে ওয়াজিব হচ্ছে রুকূ'তেই ঈদের তাকবীরগুলো বলে নেয়া। জানাযার নামায কেউ আখেরী তাকবীরে সামিল হলে তার উপর ওয়াজিব পূর্ববর্তী তাকবীরগুলো বলে নেওয়া। যখন রুকূ'তে শামিল হয়েছে এমন মুকতাদীর উপর ঈদের তাকবীরগুলো মাফ হয়নি, আর শেষভাগে সামিল হয়েছে এমন লোকের উপর জানাযার নামাযের তাকবীরগুলো মাফ হয় না, তাহলে, যদি মুক্বতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়া ফরয হতো, তবে রুকূ'তে শামিল হলে কেন তা মাফ হয়ে গেলো?

আপত্তি নং ১৩

রুকূ' পেয়েছে এমন মুক্বতাদীর উপর ওই রাক্'আতের ক্বিয়াম মাফ হয়ে গেলো, যা ফরয ছিলো, তাহলে যদি সূরা ফাতিহা মাফ হয়ে যায়, তবে ক্ষতি কি?

খন্ডন

এটা ভুল কথা। তার উপর ক্বিয়াম মাফ হয়নি। তার জন্য তাকবীর-ই তাহরীমাহ্ বলে কমপক্ষে এক তাসবীহ্ পরিমাণ ক্বিয়াম করা, তারপর দ্বিতীয়বার তাকবীর বলে রুকূ' করা জরুরী। অন্যথায় সে নামায পাবে না।

আপত্তি নং ১৪

আয়াত শরীফ- وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ الخ.. (এবং যখন ক্বোরআন পড়া হয়...) মক্কী, হিজরতের পূর্বে নাযিল হয়েছে। আর সূরা ফাতিহা হচ্ছে মাদানী, মদীনা মুনাওয়ারায় ফরয হয়েছে। কাজেই, সূরা ফাতিহা পড়া এ আয়াত দ্বারা কীভাবে মান্সূখ হতে পারে? পূর্বে নাযিল হয়েছে এমন আয়াত কি পরে নাযিল হয়েছে এমন আয়াতের নাসিখ (রহিতকারী) হতে পারে? (আপত্তিকারী কোন নতুন ওহাবী)

খন্ডন

এটা নিছক আপনারই রায় বা অভিমত। আপনি আমার উক্তির পক্ষে কোন বরাত পেশ করলেন না। যখন সূরা ফাতিহা মক্কী, আর নামাযও মক্কা মু'আয্যামায় ফরয হয়েছিলো, তখন এর কি কারণ হতে পারে যে, সূরা ফাতিহা পড়া মক্কা মু'আয্যামায় ফরয হলোনা? তাহারাত ও ওযূর ফরয হওয়া কি মাদানী?

---o---

পঞ্চম অধ্যায়

['আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা চাই]

‘আ-মী-ন’ নিম্নস্বরে বলা চাই

হানাফী মাযহাবানুসারে প্রত্যেক নামাযী- ইমাম হোন কিংবা মুক্বতাদী অথবা একাকী নামায সম্পন্নকারী হোন আর নামাযও ‘জাহ্‌রী’ (উচ্চস্বরে ক্বিরাআত বিশিষ্ট) হোক, কিংবা ‘সিররী’ (নিম্নস্বরে ক্বিরাআত বিশিষ্ট) হোক, ‘আ-মী-ন’ নিম্নস্বরে বলবেন। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবী সম্প্রদায়ের মতে, ‘জাহরী’ নামাযে ইমাম ও মুক্বতাদী উচ্চস্বরে চিৎকার করে ‘আ-মী-ন’ বলবে। সুতরাং এ মাসআলা দু’টি পরিচ্ছেদে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের প্রমাণাদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওহাবীদের আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খণ্ডন করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিম্নস্বরে ‘আ-মী-ন’ বলা আল্লাহ্‌ ও রসূলের নির্দেশের অনুরূপ। উচ্চস্বরে চিৎকার করে ‘আ-মী-ন’ বলা ক্বোরআন-ই করীমেরও বিরোধী এবং হাদীস কিংবা সুন্নাতের পরিপন্থী (বিপরীত)।

দলীলাদি নিম্নরূপ

আল্লাহ্‌ তা‘আলা এরশাদ ফরমান-

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً

তরজমা: “আপন রবের মহান দরবারে দো’আ (প্রার্থনা) করো বিনয়ভাবে এবং নিম্নস্বরে।” ‘আ-মী-ন’ও দো‘আ। সুতরাং এটাও নিম্নস্বরে বলা উচিত। মহান রব এরশাদ ফরমান-

وَاِذَا سَئَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

তরজমা: হে মাহবূব, যখন লোকেরা আপনাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে (বলুন) ‘আমি অত্যন্ত নিকটে। আমি প্রার্থনাকীর প্রার্থনা ক্ববূল করি, যখন সে আমাকে আহবান করে, বুঝা গেলো যে, চিৎকার করে তাকেই ডাকা হয়, যে আমাদের থেকে দূরে। মহান রব আমাদের স্কন্ধশিরা অপেক্ষাও নিকটে। সুতরাং ‘আ-মী-ন’ (হে আল্লাহ্‌! ক্ববূল করো) উচ্চস্বরে বলা অনর্থক, বরং ক্বোরআনের শিক্ষার বিপরীত। কারণ, ‘আ-মী-ন’ও দো‘আ।

হাদীস শরীফ থেকে দলীল

হাদীস নম্বর ১-৮

সর্ব ইমাম বোখারী, মুসলিম, আহমদ, মালিক, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্‌ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَاَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন ইমাম ‘আ-মী-ন’ বলবে, তখন তোমরাও ‘আ-মী-ন’ বলো। কেননা, যার ‘আ-মী-ন’ ফেরেশতাদের ‘আ-মী-ন’-এর অনুরূপ হবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো, গুনাহ্‌র ক্ষমা রয়েছে ওই নামাযীর জন্য, যার ‘আ-মী-ন’ ফেরেশতাদের ‘আ-মী-ন’-এর মতো হবে। আর প্রকাশ্য কথা হচ্ছে যে, ফেরেশতাগণ ‘আ-মী-ন’ নিম্নস্বরে বলেন। তাই আমরা আজ পর্যন্ত তাঁদের ‘আ-মী-ন’ শুনিনি। সুতরাং আমাদের ‘আ-মী-ন’ও নিম্নস্বরে হওয়া চাই, যাতে তা ফেরেশতাদের আমলের অনুরূপ হয় এবং পাপরাশিরও ক্ষমা হয়। যে সব ওহাবী (সালাফী, লা-মাযহাবী) চিৎকার করে ‘আ-মী-ন’ বলে, তারা তো যেভাবে মসজিদে আসে, সেভাবেই মসজিদ থেকে যায়, তাদের গুনাহগুলোর ক্ষমা হয় না। কেননা, তারা ফেরেশতাদের ‘আ-মী-ন’-এর বিরোধিতা করে।

হাদীস নম্বর ৯-১৩

সর্ব ইমাম বোখারী, শাফে‘ঈ, মালিক, আবূ দাঊদ, নাসাঈ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ فَاِنَّهُ مَنْ وَّافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ-

অর্থ: রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন ইমাম বলে, “গায়রিল মাগদূ-বি ‘আলায়হিম ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া----ল্লী-ন”, তখন তোমরা বলো, “আ-মী-ন”। কেননা, যার এ ‘আ-মী-ন’ বলা ফেরেশতাদের ‘আ-মী-ন’ বলার মতো হবে, তার পূর্ববর্তী গুনাহ্‌ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

এ হাদীস শরীফ থেকে দু'টি মাসআলা প্রতীয়মান হয়-

এক. মুক্বতাদী ইমামের পেছনে 'সূরা ফাতিহা' কখনো পড়বে না। যদি মুক্বতাদী পড়তো, তবে হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করতেন, "যখন তোমরা 'ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া----ল্লী-ন' বলবে, তখন তোমরা 'আ-মী-ন' বলো। 'ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া----ল্লী-ন' বলা ইমামের কাজ। মহান রব এরশাদ করছেন-

اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ فَامْتَحِنُوْهُنَّ

তরজমা: "যখন তোমাদের নিকট মু'মিন নারীগণ আসে, তখন তাদের পরীক্ষা নাও।"

দেখুন, পরীক্ষা নেওয়া শুধু মু'মিন পুরুষদের কাজ, মু'মিন নারীদের কাজ নয়। কোন হাদীসে একথা বলা হয়নি-

اِقْرَءُوْا وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا اٰمِيْنَ

(যখন তোমরা 'ওয়ালাদ্ব দোয়া-ল্লী-ন' বলো, তখন 'আ-মী-ন' বলে নাও!) বুঝা গেলো যে, মুক্বতাদীগণ وَلَا الضَّآلِّيْنَ বলবেই না।

দুই. 'আ-মী-ন' আস্তে (নিম্নস্বরে) বলা চাই। কেননা, ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন' বলা নিম্নস্বরে হয়ে থাকে। ফলে আজ পর্যন্ত আমরা তা শুনতে পায়নি।

স্মর্তব্য যে, এখানে ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন' বলার মতো হওয়া মানে 'সময়ের মিল' নয়, বরং বলার ধরনে মিল থাকা। ফেরেশতাদের 'আ-মী-ন' বলার সময়তো তখনই, যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ খতম করেন। কেননা, আমাদের সংরক্ষক ফেরেশতাগণ আমাদের সাথেই নামাযগুলোতে শরীক হন এবং ওই সময়ই 'আ-মী-ন' বলেন।

হাদীস নম্বর ১৪-১৮

ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ ত্বায়ালেসী, আবূ ইয়া'লা মসূলী ত্বাবরানী, দার-ই ক্বুতনী ও হাকিম 'মুস্তাদ্‌রাক'-এ হযরত ওয়া-ইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকিম বলেছেন, "সেটার সনদ অতি মাত্রায় বিশুদ্ধ।" বর্ণনাটা নিম্নরূপ-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَاَخْفٰى بِهَا صَوْتَهُ-

অর্থ: হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়েছেন। যখন

হুযূর-ই আকরাম 'ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া----ল্লী-ন'-এ পৌঁছেছেন, তখন তিনি বলেন, 'আ-মী-ন'। আর 'আ-মী-ন' বলার সময় কণ্ঠস্বর শরীফকে নিচু রেখেছেন।

বুঝা গেলো যে, 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা রাসূলুল্লাহ্‌র সুন্নাত। উচ্চস্বরে বলা একেবারে সুন্নাত বিরোধী।

হাদীস নম্বর ১৯-২১

সর্ব ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে আবী শায়বাহ্ হযরত ওয়া-ইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقَالَ اٰمِيْنَ وَخَفَضَ بِهِ صَوْتَهُ-

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শুনেছি, তিনি পড়েছেন, "গায়রিল মাগদ্বো-বি আলায়হিম ওয়ালাদ্ব দ্বো----য়াল্লীন।" তখন তিনি বলেছেন, 'আ-মী-ন' এবং আওয়াজ শরীফকে নিচু রেখেছেন।

হাদীস নম্বর ২২-২৩

ইমাম ত্বাবরানী 'তাহযীবুল আ-সা-র'-এ এবং ইমাম ত্বাহাভী হযরত ওয়া-ইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ وَعَلِيٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا بِاٰمِيْنَ-

অর্থ: হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা 'বিস্‌মিল্লাহ্' না উঁচু আওয়াজে পড়তেন, না আ-মী-ন।

বুঝা গেলো যে, নিম্নস্বরে 'আ-মী-ন' বলা সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত।

হাদীস নম্বর ২৪

'হিদায়া' কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা 'আইনী হযরত আবূ মা'মার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يُخْفِى الْاِمَامُ اَرْبَعًا اَلتَّعَوُّذَ وَبِسْمِ اللهِ وَاٰمِيْنَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ-

অর্থ: হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম চারটি বিষয় নিম্নস্বরে বলবে- 'আ'ঊযু বিল্লাহ্', 'বিস্‌মিল্লাহ্', 'আ-মী-ন' 'রাববানা- লাকাল হামদু'।

হাদীস নম্বর ২৫

ইমাম বায়হাক্বী হযরত আবূ ওয়া-ইল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন-

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ يُخْفِى الْاِمَامُ اَرْبَعًابِسْمِ اللهِ وَاللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُوَالتَّعَوُّذَ وَالتَّشَهُّدَ -

অর্থ: ইমাম চারটি জিনিষ নিম্নস্বরে বলবেন- বিস্মিল্লাহ্, রাব্বানা লাকাল হামদু, আ'ঊযু ও আত্তাহিয়্যাত ।

হাদীস নম্বর ২৬

ইমাম আবূ হানিফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত হাম্মাদ থেকে, তিনি ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اَرْبَعٌ يُخْفِيْهِنَّ الْاِمَامُ التَّعَوُّذُوَبِسْمِ اللهِ وَسُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَاٰمِيْنُ-رَوَاهُ مُحَمَّدٌ فِى الْاٰثَارِ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ فِىْ مُصَنَّفِهِ-

অর্থ: তিনি বলেন, ইমাম চারটি বিষয় নিম্নস্বরে বলবেন- 'আ'ঊযু', 'বিস্মিল্লাহ্', 'সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা' এবং 'আ-মী-ন ।' এ হাদীস শরীফ ইমাম মুহাম্মদ 'আ-সা-র'-এ এবং ইমাম আবদুর রায্যাক্ব তার 'মুসান্নাফ'-এ বর্ণনা করেছেন ।

যুক্তিও চায় যে, 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলা হোক। কেননা, 'আ-মী-ন' ক্বোরআন-ই করীমের আয়াত কিংবা কলেমা (বাক্য) নয় । একারণে, সেটাকে না জিব্রাঈল আমীন এনেছেন, না ক্বোরআন মজীদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বরং এটা দো'আ ও আল্লাহর যিকর । সুতরাং যেভাবে সানা, আত্তাহিয়্যাত, দুরূদ-ই ইব্রাহী-মী ও দো'আ-ই মা'সূরা ইত্যাদি নিম্নস্বরে পড়া হয়, তেমনি 'আ-মী-ন'ও নিম্নস্বরে বলা উচিত ।

এ কেমন ব্যাপার যে, সমস্ত যিকর নিম্নস্বরে বলা হয়ে থাকে, কিন্তু 'আ-মী-ন' কে সবাই জোরে শোরে চিৎকার করে বলবে? এভাবে চিৎকার করে বলা পবিত্র ক্বোরআনেরও বিরোধী, সহীহ হাদীসগুলোরও পরিপন্থী, সাহাবা-ই কেরামের 'আমলেরও বিরোধী । তাছাড়া, সুস্থ বিবেকের সমর্থনেরও বিরোধী । মহান রব সঠিক আমল করার সামর্থ্য দিন!

দ্বিতীয়ত: এজন্য যে, যদি মুক্বতাদীর উপর সূরা ফাতিহা পড়াও ফরয হয় এবং তাকে 'আ-মী-ন' বলারও নির্দেশ দেওয়া হয়, আর মুক্বতাদী যদি সূরা ফাতিহার মধ্যভাগে থাকে আর ইমাম 'ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া----ল্লী-ন' বলে ফেলেন, তবে এখন যদি মুক্বতাদী 'আ-মী-ন' না বলে, তাহলে ওই সুন্নাতের বিরোধিতা হলো; আর

যদি 'আ-মী-ন' বলে এবং চিৎকার করে বলে, তবে তো 'আ-মী-ন' (সূরা ফাতিহা পড়ার) মধ্যভাগে আসবে, ক্বোরআনে ক্বোরআন নয় এমন জিনিষকে সন্নিবিষ্ট করা হবে আর সূরা ফাতিহার মাধ্যভাগে শোর-চিৎকার করা হবে । (সুতরাং এর কোনটাই সমীচীন হবে না ।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন

এ পর্যন্ত আমরা 'গায়র মুক্বাল্লিদ' (লা-মাযহাবী)দের দিক থেকে এ মাসআলায় যেসব আপত্তি শুনেছি, সেগুলোর উল্লেখ খন্ডনসহকারে বিস্তারিতভাবে করার প্রয়াস পাচ্ছি ।

আপত্তি নম্বর-১

'আ-মী-ন' দো'আ নয় । সুতরাং যদি এটাকে উচ্চস্বরে বলা হয়, তবে ক্ষতি কি? মহান রবতো দো'আ নিম্নস্বরে করতে নির্দেশ দিয়েছেন; অন্য কোন যিক্রের বেলায় এ নির্দেশ দেন নি!

খন্ডন

'আ-মী-ন' তো দো'আই । এটা যে দো'আ, তা ক্বোরআন শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় । দেখুন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দো'আ করেছেন-

اطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ (৮৮)

তরজমা: হে আমাদের রব, তাদের সম্পদ বিনষ্ট করে দাও এবং তাদের হৃদয়কে কঠোর করে দাও যেন তারা ঈমান না আনে যতক্ষণ পর্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি দেখে নেয় । [সূরা ইয়ূনুস: আয়াত-৮৮, তরজমা: কান্যুল ঈমান]

[উল্লেখ্য, হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম দো'আ করেছিলেন আর হযরত হারূন আলায়হিস্ সালাম 'আ-মী-ন' (হে আল্লাহ্ ক্ববূল করো) বলেছিলেন ।

-তাফসীর নূরুল ইরফান]

মহান রব উভয়ের দো'আ কবুল করেছেন । আর তিনি এরশাদ করেছেন-

قَالَ قَدْ اُجِيْبَتْ دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَاتَتَّبِعَانِّ سَبِيْلَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ (৮৯)

তরজমা: তিনি (মহান রব) বললেন, 'তোমরা দু'জনের প্রার্থনা ক্বুবুল হয়েছে। সুতরাং তোমরা দৃঢ় থাকো এবং অজ্ঞদের সাথে চলোনা।' [প্রাগুক্ত: আয়াত-৮৯]

লক্ষ্য করুন! দো'আ তো করেছিলেন শুধু হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম; কিন্তু মহান রব বলেছেন, ''তোমরা উভয়ের দো'আ কবূল হয়েছে। অর্থাৎ তোমার ও হযরত হারূন (আলায়হিমাস্ সালাম)-এর। হযরত হারূন দো'আ কখন করলেন? এর কারণ এ ছিলো যে, তিনি হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর দো'আর উপর 'আ-মী-ন' বলেছিলেন। মহান রব 'আ-মী-ন'কে দো'আ বলেছেন। বুঝা গেলো যে, 'আ-মী-ন' দো'আই। আর দো'আ নিম্নস্বরে হওয়া চাই। এটা ক্বোরআন-ই করীমের মাসআলাগুলোর অন্যতম।

আপত্তি নম্বর -২

তিরমিযী শরীফে হযরত ওয়া-ইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ وَقَالَ آمِيْنَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَه

অর্থাৎ আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে (এভাবে পড়তে) শুনেছি-'গায়রিল মাগদূ-বি আলায়হিম ওয়ালাদ্ দ্বোয়া----ল্লী-ন।' আর 'আ-মী-ন' বলেছেন এবং আওয়াজকে এটা বলার সময় উঁচু করেছেন।

খন্ডন

হে লা-মাযহাবীরা, আপনারা হাদীস শরীফটার ভুল অনুবাদ করেছেন, তাতে مَدَّ (মাদ্দা) এরশাদ হয়েছে। مَدَّ (মাদ্দা) مَدٌّ (মাদ্দুন) থেকে গঠিত। এর অর্থ উঁচু করা নয়; বরং আওয়াজকে টেনে পাঠ করা। মর্মার্থ এ দাঁড়ালো যে, হুযূর-ই আক্রাম 'আ-মী-ন' কে 'কারীম' শব্দের সমুচ্চারিত করে ক্বসর করে (না টেনে) বলেননি, বরং 'ক্বা-লী-ন' (قالين)-এর মতো 'আ-মী-ন'-এর (الف) (আলিফ) ও 'م' (মীম)-কে খুব দীর্ঘ করে (টেনে) পড়েছেন। সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনায় (হাদীসে) আপনাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই; বরং আপনাদের অনুবাদে ত্রুটিই রয়েছে। স্মর্তব্য যে, مَدَّ (মাদ্)-এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে- قَصْرٌ (ক্বসর)। যেভাবে خِفاء (নিম্নস্বরে বলা)'র বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে جَهْرٌ (উচ্চস্বরে বলা)। অনুরূপ, رفع (উঁচু করা)-এর বিপরীতার্থক শব্দ হচ্ছে- خفض (নিচু করা)। যদি

এখানে جهر (জাহর বা উঁচু স্বরে বলা) উল্লেখ করা হতো, তাহলে আপনাদের দলীল শুদ্ধ হতো। অথচ جهر (জাহ্র) কোন রেওয়ায়তে নেই। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اِنَّه يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى (তরজমা: নিশ্চয় তিনি জানেন প্রত্যেক 'প্রকাশ্য' এবং 'অপ্রকাশ্যকে'ও। [সূরা আ'লা: আয়াত: ৭]

দেখুন, এখানে 'خفاء (নিম্নস্বরে বলা)'র বিপরীতে جهر (উচুঁস্বরে বলা) এরশাদ করেছেন; مَدَّ বলেননি।

আপত্তি নম্বর-৩

আবূ দাঊদ শরীফে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَه

অর্থ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন বলতেন, 'ওয়ালাদ্ দ্বোয়া----ল্লী-ন' তখন বলতেন, 'আ-মী-ন'। আর তাতে আওয়াজ শরীফকে উঁচু করতেন।

এখানে رَفَعَ বলেছেন, যার অর্থ 'উঁচু করেছেন'। বুঝা গেলো যে, 'আ-মী-ন' উঁচু আওয়াজে বলা সুন্নাত।

খন্ডন

এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়:

এক. হযরত ওয়াইল ইবনে হুজরের মূল রেওয়াতে আছে مَدَّ (মাদ্দা); যেমনটি তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ টেনে পড়া, উঁচু করা নয়। উল্লিখিত হাদীসের সনদে কোন বর্ণনাকারী روايت بالمعنى (নিজস্ব ব্যাখ্যা সম্বলিত বর্ণনা) করেছেন। তিনি مَدَّ কে رَفَعَ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তবুও অর্থ হবে ওই 'টেনে পড়া'; উঁচু করা নয়। روايت بالمعنى (নিজস্ব ব্যাখ্যা সম্বলিত বর্ণনা)'র সাধারণ প্রচলন তখনো ছিলো।

দুই. তিরমিযী ও আবূ দাউদের বর্ণনায় 'নামাযের মধ্যে' (এমনটি পড়তেন) বলে উল্লেখ করা হয়নি; বরং শুধু হুযূর-ই আক্রামের 'ক্বিরআত' (পড়া)'র উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত নামায ব্যতীত নামাযের বাইরে অন্য সময়ের ক্বিরআতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু যে বর্ণনাগুলো (প্রথম পরিচ্ছেদে) আমি পেশ করেছি, সেগুলোতে নামাযের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসগুলোতে

কোন দ্বন্দ্ব (স্ব-বিরোধিতা) নেই। আর বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত হাদীসগুলোও আমাদের বিরোধী নয়।

তিন. উচ্চস্বরে 'আ-মী-ন' বলা এবং নিম্নস্বরে 'আ-মী-ন' বলার বর্ণনা সম্বলিত রেওয়াত (হাদীস শরীফ)গুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে। এমতাবস্থায় উচ্চস্বরে 'আ-মী-ন' বলার বর্ণনাগুলো অনুসারে আমল করা যাবেনা; কারণ ওইগুলো ক্বোরআন মজীদের বিরোধী। আর নিম্নস্বরে বলার পক্ষে বর্ণিত হাদীস শরীফগুলো ক্বোরআন শরীফের অনুরূপ। তাই ওইগুলো অনুসারে আমল করা ওয়াজিব (অপরিহার্য)।

চার. নিম্নস্বরে 'আ-মী-ন' বলার হাদীসগুলো 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ' (শরীয়তসম্মত ক্বিয়াস)-এর অনুরূপ। আর উচ্চস্বরে বলার হাদীসগুলো সেটার পরিপন্থি। সুতরাং নিম্নস্বরে 'আ-মী-ন' বলার হাদীসগুলো অনুসারে আমল করার উপযোগী; এর পরিপন্থি বর্ণনাগুলো আমলযোগ্য নয়।

পাঁচ. উচ্চস্বরে 'আ-মী-ন' বলার হাদীস শরীফগুলো পবিত্র ক্বোরআন ও ওইসব হাদীস শরীফ দ্বারা, 'মানসূখ' (রহিত), যেগুলো আমি (প্রথম পরিচ্ছেদে) পেশ করেছি। এ কারণে সাহাবা-ই কেরাম সবসময় 'আ-মী-ন' নীরবে বলতেন। এবং নিম্নস্বরে বলার নির্দেশ দিতেন; উচ্চস্বরে 'আ-মী-ন' বলতে নিষেধ করতেন; যেমনটি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। যদি উচ্চস্বরে 'আ-মী-ন' বলার হাদীসগুলো 'মানসূখ' (রহিত) না হতো, তাহলে সাহাবা-ই কেরাম ওই আমল কেন ছেড়ে দিয়েছেন?

আপত্তি নম্বর- ৪

ইবনে মাজাহ্য় হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعَهَا اَهْلُ الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ -

অর্থ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন 'গায়রিল মাগদূ-বি 'আলায়হিম ওয়ালাদ্ব দ্বোয়া----ল্লী-ন' বলতেন, তখন 'আ-মী-ন' বলতেন, এমনকি প্রথম কাতারের মুসল্লিগণ তা শুনতে পেতেন, অতঃপর পূর্ণ মসজিদে তা ধ্বনিত হতো।

এ হাদীসে তো কোন প্রকার ভিন্ন ব্যাখ্যা (তা'ভীল)-এর প্রয়োজন নেই। এতে তো গোটা মসজিদ শরীফে ধ্বনিত হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চস্বর ব্যতীত ধ্বনিত হয় না।

খন্ডন

এ আপত্তির কয়েকটা জবাব রয়েছেঃ

প্রথমত: হে লা-মাযহাবীরা, আপনারা তো পূর্ণ হাদীস উল্লেখ করেননি, হাদীসের প্রথমাংশ ছেড়ে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّامِيْنَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الخ...

অর্থ: হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা 'আ-মী-ন' বলা ছেড়ে দিয়েছে; অথচ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম...।

এ বাক্য শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে। আম সাহাবা-ই কেরাম উচ্চস্বরে 'আ-মী-ন' বলা ছেড়ে দিয়েছিলেন; যা হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অভিযোগ আকারে উপস্থাপন করছেন। বস্তুত: সাহাবা-ই কেরাম হাদীস শরীফের উপর আমল ছেড়ে দেওয়া ওই হাদীস শরীফ মান্সূখ হয়ে যাবার প্রমাণবহ। এ হাদীস শরীফ তো আমাদের সমর্থন করছে, হে বিরুদ্ধবাদীরা, আপনাদের না।

দ্বিতীয়ত: যদি এ হাদীস শরীফকে সহীহ্ও মেনে নেওয়া হয়, তবুও তা যুক্তি ও বাস্তব দৃশ্যের পরিপন্থী। আর যে হাদীস শরীফ যুক্তি ও বাস্তব দৃশ্যের পরিপন্থী হয়, তা আমলযোগ্য নয়; বিশেষ করে যখন সমস্ত প্রসিদ্ধ (মাশহুর) হাদীস ও ক্বোরআনের আয়াতসমূহের পরিপন্থী হয়।

কেননা, এ হাদীস শরীফে মসজিদ ধ্বনিত হবার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; অথচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়, ছাদবিশিষ্ট মসজিদে এমনটি হয় না। হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মসজিদ শরীফ তাঁর পবিত্র যুগে (জীবদ্দশায়) মা'মূলী ছাদবিশিষ্ট ছিলো। ওখানে প্রতিধ্বনি সৃষ্টিই বা কিভাবে হতে পারতো? আজ কোন গায়র মুক্বাল্লিদ কোন ছাদ বিশিষ্ট ঘরে শোর-চিৎকার করে প্রতিধ্বনি করে দেখাক! ইনশা-আল্লাহ্, চিৎকার করতে করতে মারা যাবে, কিন্তু প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হবে না। এ আপত্তির অবশিষ্ট অংশের জবাব হবে তা-ই, যা আপত্তি নং-৩-এর জবাবে বলা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ এ হাদীস শরীফ ক্বোরআন-ই করীমেরও অনুরূপ নয়। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ... (তরজমা: হে ঈমানদারগণ, নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করোনা ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)'র কণ্ঠস্বর থেকে...। [সূরা হুজুরাত: আয়াত-২, কান্যুল ঈমান]

যদি সাহাবীগণ এত উঁচু আওয়াজে আ-মী-ন বলে থাকেন যে, মসজিদে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে গিয়েছিলো, তবে তো তাঁদের আওয়াজ হুযূর-ই আক্রামের আওয়াজ শরীফ থেকে উঁচু হয়ে গিয়েছিলো। এটা ক্বোরআন-ই করীমের প্রকাশ্য বিরোধিতা হলো। বস্তুত: যে হাদীস শরীফ ক্বোরআন-ই করীমের পরিপন্থী হয়, তা আমল করার মত নয়।

আপত্তি নম্বর- ৫

বোখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে-

فَقَالَ عَطَآءٌ آمِيْنْ دُعَآءٌ أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْر
وَمَنْ وَّ رَآئَه حَتّٰى اَنَّ فِى الْمَسْجِدِ لَجَّةً

অর্থাৎ হযরত আত্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, 'আ-মী-ন' একটি দো'আ। আর হযরত ইবনে যোবায়র ও তাঁর পেছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা 'আ-মী-ন' বলেছেন। এমনকি মসজিদে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো।

এ হাদীস শরীফ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হলো যে, 'আ-মী-ন' এত জোরে চিৎকার করে বলা দরকার, যাতে মসজিদ ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে যায়।

খন্ডন

এ আপত্তির কতিপয় জবাব দেওয়া যায়ঃ

এক. এ হাদীস শরীফের প্রথম বাক্য আমাদের (হানাফী মাযহাব)-এর অনুরূপ। অর্থাৎ 'আ-মী-ন' দো'আ। আর ক্বোরআন-ই করীমে এরশাদ হয়েছে, 'দো'আ নিম্নস্বরে করো।' 'প্রথম পরিচ্ছেদ'-এ দেখুন।

দুই. এ হাদীসে নামাযের উল্লেখ নেই। জানিনা, নামাযের বাইরে এ তিলাওয়াত হয়েছিলো, না নামাযের অভ্যন্তরে। প্রকাশ তো এটাই হলো যে, হয়তো এটা নামাযের বাইরে সম্পন্ন হয়েছিলো, যাতে ওই সব হাদীসের বিরোধী না হয়, যেগুলো আমরা পেশ করেছি। এবং

তিন. এ হাদীস শরীফ যুক্তি ও বাস্তব দর্শনেরও পরিপন্থী; কেননা, কাঁচা ছাদবিশিষ্ট মসজিদে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হতে পারে না। সুতরাং এটার ভিন্ন ব্যাখ্যা

(তা'ভীল) অপরিহার্য (ওয়াজিব)। আরে জনাব! যদি ক্বোরআন মজীদের কোন আয়াতও 'আক্বলে শর'ঈ' (শরীয়ত সমর্থিত যুক্তি) ও বাস্তবাবস্থার পরিপন্থী হয়, তবে ওখানেও তা'ভীল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। অন্যথায় 'কুফর' হওয়া অনিবার্য হয়ে যায়। 'আয়াত-ই সিফাত' (আল্লাহর গুণাবলীর আয়াতগুলো)কে 'মুতাশা-বিহ্' (দ্ব্যর্থবোধক) হিসেবে ধরে নিয়ে আমরা শুধু ঈমান আনি; সেগুলোর প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করি না। কেননা, সেগুলোর প্রকাশ্য অর্থ শরীয়তসম্মত যুক্তির বিরোধী। যেমন- يَدُ اللهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ **তরজমা:** তাদের হাতগুলোর উপর আল্লাহর হাত (দয়া) রয়েছে। [সূরা ফাত্হ: আয়াত-১০]

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ তরজমা: তোমরা যে দিকে ফিরবে সেদিকেই আল্লাহর চেহারা (ক্বেবলা)। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-১১৫]

আল্লাহ্ তা'আলার জন্য হাত-মুখ থাকা যুক্তি (বিবেক-বুদ্ধি)'র বাইরে।

সুতরাং এ আয়াতাংশ দু'টির তা'ভীল বা ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া ওয়াজিব। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِئَةٍ অর্থাৎ যুলক্বারনাঈন সূর্যকে কালো কাদাময় জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখতে পেলো। [সূরা কাহ্ফ: আয়াত-৮৬]

সূর্য অস্তমিত হবার সময় আসমান থেকে নেমে আসা এবং কাদাময় জলাশয়ে অস্ত যাওয়া যুক্তিগ্রাহ্য ছিলো না। সুতরাং সেটার তা'ভীল করা হয়। এ তা'ভীল 'হাশিয়াতুল ক্বোরআন'-এ দেখুন। বস্তুত: হাদীস পড়া এক জিনিষ, হাদীস বুঝা অন্য জিনিষ।

সারকথা হলো এমন কোন 'সহীহ্', মারফূ' হাদীস পাওয়া যায়নি, যাবেও না। যাতে নামাযে 'আ-মী-ন' উচ্চস্বরে বলার পক্ষে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। এমন সহীহ্ হাদীস পাওয়া যায়নি; পাওয়া যাবেও না, তাই ওহাবী, লা-মাযহাবীদের উচিৎ জেদ (হঠকারিতা) পরিহার করা এবং সত্য অন্তরে ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দামন (আঁচল) ধরা। তিনি যা বলেছেন, 'তা-ই হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রদর্শিত সরল-সঠিক পথ। এ মাসআলার আরো অধিক গবেষণাধর্মী বর্ণনা দেখতে চাইলে 'হাশিয়া-ই বোখারী' (আরবী) দেখুন।

আপত্তি নম্বর-৬

নিম্নস্বরে 'আ-মী-ন' বলার প্রসঙ্গে, হে হানাফী-সুন্নীরা, আপনারা যেসব হাদীস শরীফ পেশ করেছেন, ওইসব হাদীস দ্ব'ঈফ বা দুর্বল। আর দুর্বল হাদীস থেকে

দলীল গ্রহণ ও দলীল হিসেবে পেশ করা যায়না। (উল্লেখ্য, এটা ওহাবীদের পুরানা সবক, যা তারা মুখস্থ করে আওড়িয়ে আসছে। তারা আরো বলছে-) দেখুন, হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণিত ও তিরমিযী শরীফে উদ্ধৃত রেওয়াতে (হাদীস শরীফ) যা আপনারা পেশ করেছেন, সেটা সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী নিজেই বলেছেন-

حَدِيْثُ سُفْيَانَ اَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شُعْبَةَ فِيْ هٰذَا اِلَى اَنْ
وَقَالَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَه وَاِنَّمَا هُوَ مَدَّ بِهَا صَوْتَه

অর্থ: 'আ-মী-ন' বলা সম্পর্কে সুফিয়ানের হাদীস শো'বাহ্‌র হাদীস অপেক্ষা বেশী সহীহ্। শো'বাহ্ এখানে বলেছেন, 'খাফাদ্বা', অর্থাৎ হুযূর-ই আক্‌রাম নিম্নস্বরে বলেছেন, অথচ এখানে مد (মদ্দা) আছে। অর্থাৎ আওয়াজকে টেনে 'আ-মী-ন' বলেছেন।

খন্ডন

আল্লাহ্ তা'আলার শোকর যে, আপনারা আপনাদের এ বক্তব্যে অন্তত 'মুক্বাল্লিদ' তো হয়েছেন ইমাম-ই আ'যমের না হলেও, ইমাম তিরমিযীর, আর দেখা যাচ্ছে যে কোন সমালোচনা চোখ বন্ধ করে মেনে নিচ্ছেন! ওহে জনাব, ওই হাদীসের দুর্বলতার মূল কারণ হচ্ছে- এটা আপনাদের মতের বিপক্ষে। যদি সেটা আপনাদের পক্ষের হতো, তাহলে আপনারা সেটা চোখ বন্ধ করে মেনে নিতেন! আপনাদের এ আপত্তির কয়েকটা জবাব হতে পারেঃ

এক. আমরা 'আ-মী-ন' নিম্নস্বরে বলার পক্ষে ২৬ (ছাব্বিশ)টি 'সনদ' বা সূত্র পেশ করেছি। ওইগুলোর সব-ক'টিই কি দুর্বল? আর সব ক'টিতে কি শো'বাহ্ রাভী (বর্ণনাকারী) আসছেন? আর শো'বাহ্ কি সব জায়গায় ভুল-ত্রুটি করেছেন? এটা সম্ভবই নয়।

দুই. যদি এ ২৬টি সনদের প্রত্যেকটি (আপনাদের কথা মত) দুর্বলও হয়, তবুও সব মিলে একত্রে সবল হয়ে গেছে। যেমনটি আমি এ কিতাবের ভূমিকার উল্লেখ করেছি।

তিন. শো'বাহ্ ইমাম আবূ হানীফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পর সনদে শামিল হয়েছেন; যাঁর কারণে, এ হাদীস দুর্বল হয়েছে। ইমাম-ই আ'যম তো এ হাদীস একেবারে শুদ্ধরূপে পেয়েছিলেন। পরবর্তীদের দুর্বলতা পূর্ববর্তীদের বিশুদ্ধতার জন্য ক্ষতিকর নয়।

চার. যদি প্রথম থেকেই হাদীসটি দুর্বল হতো, তবুও ইমাম-ই আ'যম সিরাজুল উম্মাহ্ ইমাম আবূ হানীফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু হাদীসটি গ্রহণ করে নেওয়ার ফলে শক্তিশালী হয়ে গেছে; যেমনটি আমি ইতোপূর্বে আরয করেছি।

পাঁচ. যেহেতু এ হাদীস শরীফ অনুসারে আম মুসলিম উম্মাহ্ আমল করে এসেছেন, সেহেতু হাদীসটির 'দুর্বলতা' দূরীভূত হয়ে গেছে এবং হাদীস শক্তিশালী হয়ে গেছে; যেমন আমি ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

ছয়. এ হাদীসকে খোদ্ ক্বোরআন-ই করীম সমর্থন করছে। পক্ষান্তরে, উচ্চস্বরে 'আ-মী-ন' বলার হাদীসগুলো ক্বোরআনের পরিপন্থী। সুতরাং নিম্নস্বরে 'আ-মী-ন' বলার পক্ষের হাদীস ক্বোরআন করীমের সমর্থনের কারণে শক্তিশালী হয়ে গেছে; যেমন আমি ভূমিকায় আরয করেছি।

সাত. এ হাদীসের সমর্থন করছে ক্বিয়াস-ই শর'ঈও। পক্ষান্তরে, উচ্চস্বরে বলার হাদীস 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ' ও 'আক্বল-ই শর'ঈ'র বিপরীত। সুতরাং নিম্নস্বরে 'আ-মী-ন' বলার পক্ষের হাদীসগুলো শক্তিশালী। আর উচ্চস্বরে 'আ-মী-ন' বলার হাদীস আমলযোগ্য নয়। মোটকথা, নিরবে আ-মী-ন বলার হাদীস অত্যন্ত শক্তিশালী। সুতরাং আমলও এগুলো অনুসারে করা চাই।

আপত্তি নম্বর- ৭

আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর-ই আক্‌রাম যখন সূরা ফাতিহা সমাপ্ত করে নিতেন, তখন-

قَالَ اٰمِيْنْ حَتّٰى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيْه مِنَ الصَّفِّ الاَوَّل

অর্থাৎ তিনি 'আ-মী-ন' বলেছেন এতটুকু আওয়াজে যে, প্রথম কাতারের যিনি তাঁর নিকটে থাকতেন, তিনি শুনতে পেতেন।

খন্ডন

এর দু'টি জবাব দেওয়া যায়ঃ

এক. এ হাদীস শরীফ, হে আপত্তিকারীরা আপনাদেরও বিরোধী। কেননা, আপনাদের উপস্থাপিত রেওয়াতগুলোতে ছিলো যে, (আ-মী-ন-এর আওয়াজে) গোটা মসজিদ প্রতিধ্বনিত হতো। আর এ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, (আ-মী-ন) বলার আওয়াজ পেছনের দু'/একজন লোক শুনতে পেতেন। (সুতরাং এ গুলো পরস্পর বিরোধী হলো।)

দুই. এ হাদীসের সনদে বিশর ইবনে রাফি' আসছেন। তাঁকে ইমাম তিরমিযী 'জানা-ইয' পর্বে, হাফেয যাহাবী 'মীযান-এ'। অত্যন্ত দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমদ তাকে 'মুনকারুল হাদীস' বলেছেন। ইবনে মু'ঈন তাঁর বর্ণনাকে মওদ্বূ' (বানোয়াট) বলে সাব্যস্ত করেছেন। আর ইমাম নাসাঈ তাকে শক্তিশালী বলে মেনে নেননি। [আফ্তাব-ই মুহাম্মদী]

সুতরাং এ হাদীস অতিমাত্রায় দুর্বল। তাই আমল করার মতো নয়।

---o---

ষষ্ঠ অধ্যায়

[রফ'ই ইয়াদাঈন করা নিষিদ্ধ]

(তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য অতিরিক্ত তাকবিরগুলো বলার সময় হাত উঠাবে না)

রফ'ই ইয়াদাঈন নিষিদ্ধ

(তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য অতিরিক্ত তাকবিরগুলো বলার সময় হাত উঠাবে না)

আহলে সুন্নাতের মধ্যে হানাফী মাযহাবের ইমামগণের মতে, নামাযে রফ'ই ইয়াদাঈন অর্থাৎ রুকূ'তে যাবার সময় এবং রুকূ' থেকে ওঠার সময় উভয় হাত উঠানো সুন্নাতের পরিপন্থী ও নিষিদ্ধ; কিন্তু ওহাবী-গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) এ দু' সময়ে রফ'ই ইয়াদাঈন করে থাকে এবং এর উপর খুব জোর দেয়। সুতরাং আমি এ মাস্আলাকেও দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছি; প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাস্আলার পক্ষে আমাদের প্রমাণাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাস্আলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো এবং সেগুলোর খন্ডন উল্লেখ করছি। মহান রব কবূল করুন!

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামাযে রুকূ'তে যাওয়া ও তা থেকে মাথা ওঠানোর সময় রফ'ই ইয়াদাঈন করা মাক্রূহ ও সুন্নাতের পরিপন্থী। এর পক্ষে অনেক বিশুদ্ধ হাদীস ও মুজতাহিদ ইমামগণের ক্বিয়াস-এর সমর্থন রয়েছে। আমি তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

হাদীস শরীফ নম্বর : ১-৪

তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে আবী শায়বাহ্, হযরত আলক্বামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَلاَ اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلاَّ مَرَّةً وَّاحِدَةً مَعَ تَكْبِيْرَةِ الْاِفْتِتَاحِ - وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَبِهِ يَقُوْلُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ -

অর্থ: একবার আমাদেরকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ বললেন, "আমি কি তোমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নামায পড়বো না?" সুতরাং তিনি নামায পড়লেন। তাতে তিনি তাকবীর-ই তাহ্রীমাহ্ ব্যতীত কখনো হাত উঠাননি। ইমাম তিরমিযী বলেন, "হযরত ইবনে মাস'ঊদের

হাদীস 'হাসান' পর্যায়ের। এ 'রফ'ই ইয়াদাঈন' না করার উপর অনেক আলিম-সাহাবী ও আলিম-তাবে'ঈর আমল রয়েছে।''

স্মর্তব্য যে, এ হাদীস শরীফ অনেক কারণে অত্যন্ত শক্তিশালী। যেমন-

এক. এর রাভী (বর্ণনাকারী) হচ্ছেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, যিনি সাহাবীদের মধ্যে বড় ফক্বীহ্ আলিম।

দুই. তিনি সাহাবা-ই কেরামের একটি জামা'আত (দল)-এর সামনে হুযূর-ই আক্বরামের নামায পেশ করেছেন। আর কোন সাহাবী তা অস্বীকার করেননি। বুঝা গেলো যে, সবাই সেটা সমর্থন করেছেন। যদি 'রফ'ই ইয়াদাঈন' সুন্নাত হতো, তবে সাহাবীগণ তাঁর এ আমলের বিপক্ষে আপত্তি উত্থাপন করতেন; কারণ, তাঁরা সবাই হুযূর-ই আক্বরামের নামায দেখেছিলেন।

তিন. ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে 'দুর্বল' বলেননি, বরং 'হাসান' (সবল) বলেছেন।

চার. ইমাম তিরমিযী বলেছেন, অনেক সাহাবী আলিম ও তাবে'ঈ আলিম রফ'ই ইয়াদাঈন করতেন না। তাঁদের এ আমল এ হাদীস শরীফের সমর্থন করছে।

পাঁচ. ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতো যুগের মহা মর্যাদাবান আযীমুশ্শান মুজতাহিদ এটাকে গ্রহণ করেছেন এবং সেটা অনুসারে আমল করেছেন।

ছয়. রসূল করীমের আম উম্মত এ হাদীস শরীফ অনুসারে আমল করেছেন।

সাত. এ হাদীস শরীফ ক্বিয়াস ও আক্বল বা যুক্তির একেবারে অনুরূপ। সামনে আমিও এ সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশা-আল্লাহ্। এ সব কারণে তো দ্ব'ঈফ (দুর্বল) হাদীসও সবল হয়ে যায়; অথচ এ হাদীস শরীফ স্বয়ং 'হাসান' (উত্তম) পর্যায়ের আছেই।

হাদীস শরীফ-৫

ইবনে আবী শায়বাহ্ হযরত বারা ইবনে 'আ-যিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فْتَتَحَ الصَّلواةَ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ لاَ يَرْفَعُهُمَا حَتّٰى يَفْرُغَ -

অর্থ: হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন আপন হস্তযুগল শরীফ উঠাতেন, অতঃপর নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত হাত তুলতেন না।

স্মর্তব্য যে, হযরত বারা ইবনে 'আ-যিবের হাদীস শরীফকে ইমাম তিরমিযী এভাবে উদ্ধৃত করেছেন-فِى اَلْبَابِ عَنِ اَلْبَرَاءِ (এ অধ্যায়ে হযরত বারা ইবনে 'আ-যিবের হাদীস বর্ণিত)।

হাদীস শরীফ- ৬

ইমাম আবূ দাঊদ হযরত বারা ইবনে আ-যিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ اَفْتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى اِنْصَرَفَ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি- যখন তিনি নামায আরম্ভ করেছেন, তখন উভয় হাত তুলেছেন। তারপর নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত হাত দু'টি উঠাননি।

হাদীস শরীফ-৭

ত্বাহাভী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে-

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ

অর্থ: তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি প্রথম তাকবীরে হাত উঠাতেন। তারপর কখনো উঠাতেন না।

হাদীস শরীফ ৮- ১৪

৮. ইমাম হাকিম ও ৯. ইমাম বায়হাক্বী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْفَعُ الْاَيْدِى فِىْ سَبْعِ مَوَاطِنَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ وَاسْتِقْبَالِ الْبَيْتِ وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالْمَوْقِفَيْنِ وَالْجَمْرَتَيْنِ -

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সাতটি স্থানে হাত উঠানো হয়- ১. নামায আরম্ভ করার সময়, ২. কা'বা শরীফের সামনে মুখ করার সময়, ৩. সাফা ও মারওয়া পর্বত দু'টির

উপর, ৪. ও ৫. দু' মাওক্বিফে অর্থাৎ মীনা ও মুয্দালিফায় এবং ৬. ও ৭. দু' জামরার নিকটে।

এ হাদীস শরীফ ১০. বায্যার, হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে, ১১. ইবনে আবূ শায়বাহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে, ১২. ইমাম বায়হাক্বী হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে, ১৩. ইমাম ত্বাবরানী ও ১৪. ইমাম বোখারী 'কিতাবুল মুফরাদ'-এ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে কিছু পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় দু' ঈদের নামাযেরও উল্লেখ রয়েছে।

হাদীস শরীফ - ১৫

ইমাম ত্বাহাভী হযরত মুগীরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি ইব্রাহীম নাখ্'ঈ'র সমীপে আরয করলাম, "হযরত ওয়া-ইল তো হুযূর-ই আক্রামকে দেখেছেন যে, তিনি নামাযের প্রারম্ভে, রুকূ'তে ঝুঁকার সময় এবং রুকূ' থেকে ওঠার সময় উভয় হাত উঠাতেন, এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?" জবাবে তিনি বলেন-

اِنْ كَانَ وَائِلٌ رَاٰهُ مَرَّةً يَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَدْ رَاٰهُ عَبْدُ اللهِ خَمْسِيْنَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ -

অর্থ: যদি হযরত ওয়া-ইল হুযূর-ই আক্রামকে একবার 'রফ'ই ইয়াদাইন' করতে (উভয় হাত উঠাতে) দেখে থাকেন, তাহলে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ হুযূর-ই আক্রামকে পঞ্চাশ বার রফ'ই ইয়াদাঈন না করতে দেখেছেন। এ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ-এর হাদীস অত্যন্ত শক্তিশালী। কেননা, তিনি সাহাবীদের মধ্যে ফক্বীহ্ আলিম, হুযূর-ই আক্রামের সঙ্গে বেশীর ভাগ সময় অবস্থানকারী, নামাযে হুযূর-ই আক্রামের নিকটে দাঁড়াতেন এমন। কেননা, হুযূর-ই আক্রামের নিকটে তাঁরাই দাঁড়াতেন, যাঁরা আলিম ও অধিকতর বিবেকবান ছিলেন। এমনটি একাধিক বর্ণনায় এসেছে।

হাদীস শরীফ ১৬-১৭

ইমাম ত্বাহাভী ও ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ্ হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ اِبْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ -

অর্থ: আমি হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার পেছনে নামায পড়েছি। তিনি নামাযে প্রথম তাকবীর ছাড়া অন্য কোন সময় হাত উঠাতেন না।

হাদীস শরীফ- ১৮

আল্লামা আয়নী, বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারক হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র থেকে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّه رَاٰى رَجُلاً يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَالرُّكُوْعِ وَعِنْدَرَفْعِ رَاْسِه مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ لَه لَا تَفْعَلْ فَاِنَّه شَيْءٌ فَعَلَه رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَرَكَه

অর্থ: তিনি এক ব্যক্তিকে রুকূ'তে যাওয়া ও রুকূ' থেকে উঠার সময় হাত তুলতে দেখেছেন। তখন তিনি তাকে বললেন, এমন করোনা! কেননা, এটা এমন কাজ, যা হুযূর-ই আক্রাম প্রথমে করেছেন, তারপর ছেড়ে দিয়েছেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, রুকূ'র পূর্বে ও পরে রফ'ই ইয়াদাঈন (হাত তোলা) মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। যেসব সাহাবী এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে 'রফ'ই ইয়াদাঈন'-এর প্রমাণ পাওয়া যায়, তা প্রথমাবস্থার কর্ম; পরবর্তীতে মান্সূখ (রহিত) হয়ে গেছে।

হাদীস শরীফ-১৯-২০

ইমাম বায়হাক্বী ও ত্বাহাভী শরীফ প্রণেতা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى مِنَ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ فِىْ شَيْءٍ مِّنْهَا -

অর্থ: তিনি নামাযের প্রথম তাকবীরে হাত তুলতেন, তারপর কোন অবস্থাতেই হাঠ উঠাতেন না।

হাদীস শরীফ- ২১

ত্বাহাভী শরীফে হযরত আস্ওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করা হয়েছে -

قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِىْ اَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ -

অর্থ: আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)-কে দেখেছি, তিনি প্রথম তাকবীরে হাত তুলেছেন, তারপর আর উঠাননি। ইমাম ত্বাহাভী বলেছেন, এ হাদীস শরীফ সহীহ।

হাদীস শরীফ- ২২

আবূ দাঊদ শরীফে হযরত সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর সূত্রে

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ اِسْنَادُه بِهٰذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى اَوَّل مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً

অর্থ: হযরত সুফিয়ান এ-ই সনদে বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ প্রথমবারেই হাত তুলেছেন। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন, তিনি মাত্র একবার হাত তুলেছেন।

হাদীস শরীফ- ২৩

দারু কুত্বনী হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّه رَأَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى حَاذٰى بِهِمَا اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ اِلٰى شَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ حَتّٰى فَرَغَ مِنَ الصَّلوٰةِ -

অর্থ: তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, যখন হুযূর-ই আক্রাম নামায আরম্ভ করেছেন, তখন হাত এতটুকু উঠিয়েছেন যে, কান দু’টির বরাবর করে নিয়েছেন। তারপর নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত কোথাও হাত তুলেননি।

হাদীস শরীফ-২৪

ইমাম মুহাম্মদ ‘কিতাবুল আ-সা-র’-এ হযরত ইমাম আবূ হানীফা থেকে, তিনি হযরত হাম্মাদ থেকে, তিনি হযরত ইব্রাহীম নাখ্‘ঈ থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّه قَالَ لَاتَرْفَعِ الاَيْدِىْ فِيْ شَىْءٍ مِّنْ صَلوتِكَ بَعْدَ الْمَرَّةِ الْاُوْلٰى -

অর্থ: তিনি বলেন, প্রথমবার ব্যতীত নামাযের কোথাও হাত উঠাবে না।

হাদীস শরীফ-২৫

ইমাম আবূ দাঊদ হযরত বারা ইবনে ‘আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ مِّنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ

অর্থ: নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করলে উভয় কান শরীফের নিকট পর্যন্ত হাত উঠাতেন। তারপর আর কখনো এটা করতেন না।

উল্লেখ্য, হাত না উঠানো সম্পর্কে (রফ‘ই ইয়াদাঈন নিষেধ মর্মে) আরো অনেক হাদীস শরীফ রয়েছে। আমি এখানে সংক্ষেপে মাত্র পঁচিশটা হাদীস শরীফ পেশ করলাম। যদি আগ্রহ থাকে তাহলে মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ, ত্বাহাভী শরীফ ও সহীহুল বিহারী শরীফ পাঠ-পর্যালোচনা করুন।

পরিশেষে, আমি ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর ওই মুনাযারাহ্ (তর্কযুদ্ধ)-এর ঘটনা বর্ণনা করছি, যা ‘রফ‘ই ইয়াদাঈন’ সম্পর্কে মক্কা-ই মু‘আয্যামায় ইমাম আওযা‘ঈ’র সাথে হয়েছিলো। সম্মানিত পাঠকগণ! দেখুন ইমাম-ই আ’যম কত উঁচু পর্যায়ের মুহাদ্দিস ছিলেন এবং কত মজবূত ও সহীহ্ সনদের হাদীস শরীফ উপস্থাপন করছেন।

ইমাম আবূ মুহাম্মদ বোখারী মুহাদ্দিস রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি হযরত সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, একদিন হযরত ইমাম-ই আ’যম ও ইমাম আওযা‘ঈ রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হিমার মক্কা মু‘আয্যামার দারুল হানাত্বীন নামক স্থানে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। তখন এ উভয় বুযুর্গ ইমামের মধ্যে নিম্নলিখিত কথোপকথন হয়েছিলো। দেখুন ও ঈমান তাজা করুন!

এ মুনাযারাহ্ বা তর্কযুদ্ধের বিবরণ ‘ফাত্হুল ক্বাদীর’ এবং ‘মির্ক্বাত শরহে মিশকাত’ ইত্যাদিতেও উল্লেখ করা হয়েছে-

ইমাম আওযা‘ঈ: আপনারা রুকূ‘তে যাওয়া ও রুকূ‘ থেকে ওঠার সময় ‘রফ‘ই ইয়াদাঈন’ করেন না কেন?

ইমাম আবূ হানীফা: এ জন্য যে, ‘রফ‘ই ইয়াদা‘ঈন’ এসব স্থানে (সময়ে) হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়।

ইমাম আওযা‘ঈ: আপনি এ কি বললেন? আমি আপনাকে রফ‘ই ইয়াদাঈনের সহীহ্ হাদীস শুনাচ্ছি-

حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَعِنْدَ الرُّكُوْعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ مِنْهُ -

অর্থ: আমাকে যুহরী হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি সালিম থেকে, সালিম তাঁর পিতা থেকে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে যে, তিনি হাত উঠাতেন যখন নামায শুরু করতেন এবং রুকূ'তে যাবার করার সময় ও রুকূ' থেকে উঠার সময় ।

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা: আমার নিকট এটা থেকে অধিকতর মজবুত হাদীস এর বিপক্ষে মওজুদ আছে ।

ইমাম আওযা'ঈ: আচ্ছা, এক্ষুণি তা পেশ করুন!

ইমাম-ই আ'যম: এ নিন, শুনুন-

حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْعَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلاَّ عِنْدَافْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ ثُمَّ لاَ يَعُوْدُ لِشَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ -

অর্থ: আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত হাম্মাদ, তিনি ইব্রাহীম নাখ্'ঈ থেকে, তিনি হযরত 'আলক্বামাহ্ ও আস্ওয়াদ থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ থেকে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুধু নামাযের প্রারম্ভে হাত উঠাতেন, তারপর কখনো উঠাতেন না ।

ইমাম আওযা'ঈ: আপনার উপস্থাপিত হাদীসের, আমার পেশ কৃত হাদীসের উপর কিসের প্রাধান্য রয়েছে, যার কারণে আপনি ওটাকে গ্রহণ করেছেন, আর আমার পেশকৃত হাদীসকে ছেড়ে দিয়েছেন?

ইমাম-ই আ'যম: এ জন্য যে, হযরত হাম্মাদ ইমাম যুহ্রী থেকে বড়তর ফক্বীহ্-আলিম, হযরত ইব্রাহীম নাখ্'ঈ সালিম থেকে বড় আলিম-ফক্বীহ্, আলক্বামাহ্ সালিমের পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর অপেক্ষা নিম্ন পর্যায়ের আলিম নন; আস্ওয়াদ খুব বড় মুত্তাক্বী, ফক্বীহ্ ও শ্রেষ্ঠ । আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ ফিক্বহ্ এবং ক্বিরাআতেও, আর তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ অবলম্বনে হযরত ইবনে ওমর থেকে অনেক অনেক বড় মাপের । তিনি (হযরত ইবনে মাস'ঊদ) ছোটবেলা থেকে হুযূর-ই আক্রামের সঙ্গে ছিলেন । যেহেতু আমার উপস্থাপিত হাদীসের বর্ণনাকারীগণ তোমার উপস্থাপিত হাদীসের রাভীগণ অপেক্ষা বেশী জ্ঞানী ও অধিক গুণী, সেহেতু আমার পেশকৃত হাদীস শরীফ অনেক মজবুত ও অধিক গ্রহণযোগ্য ।

ইমাম আওযা'ঈ: নির্বাক । (মুনাযারাহ্ খতম)

হে গায়র মুক্বাল্লিদ, লা-মাযহাবী ওহাবী সম্প্রদায়! ইমাম-ই আ'যমের সনদ বর্ণনার ধরন দেখলেন তো? এ থেকে সম্ভব হলে কোন ত্রুটি বের করুন তো! ইমাম আওযা'ঈর মতো আলিমের খামোশ (নির্বাক) হয়ে যাওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিলো না । এমনই হলো ইমাম-ই আ'যমের হাদীস শাস্ত্রে দক্ষতা! হাদীসের সনদ সম্পর্কে এ-ই হচ্ছে ইমাম-ই আ'যমের নৈপূণ্য! আল্লাহ্ তা'আলা হক্বকে কবূল করার শক্তি দিন! জেদের কোন চিকিৎসা নেই । বস্তুত এ লম্বা লম্বা সনদ বা সূত্র এবং তাতে দুর্বল (দ্ব'ঈফ) বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্তি হযরত ইমাম-ই আ'যমের পরে সৃষ্টি হয়েছে । ইমাম-ই আ'যম যেসব হাদীস গ্রহণ করেছেন, সেগুলো অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ ।

আক্বল বা যুক্তির দাবীও এ যে, রুকূ'তে যাবার সময় রফ'ঈ ইয়াদাঈন করা হবেনা । কেননা, সবাই এ মর্মে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, শুধু তাকবীর-ই তাহরীমায় 'রফ'ঈ ইয়াদাঈন' হবে । আর এ মর্মেও সবাই ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, সাজদা ও ক্বা'দার তাকবীরগুলোতে 'রফ'ই ইয়াদাঈন' হবে না । রুকূ'র তাকবীরে মতবিরোধ আছে । সুতরাং দেখতে হবে রুকূ'র তাকবীর কি তাকবীর-ই তাহ্রীমার মতো, নাকি সাজদাহ্ ও আত্তাহিয়্যাতের তাকবীরের মতো! গভীরভাবে চিন্তা করলে জানা যায় যে, রুকূ'র তাকবীর তাকবীর-ই তাহ্রীমার মতো নয়, বরং সাজদাহ্ ও আত্তাহিয়্যাতের তাকবীরের মতো । কেননা, তাকবীর-ই তাহরীমা ফরয, যা ব্যতীত নামাযই হয়না । আর রুকূ' ও সাজদার তাকবীরগুলো হচ্ছে- সুন্নাত; এগুলো ছাড়াও নামায হয়ে যায় ।

তাকবীর-ই তাহরীমা নামাযে শুধু একবারই করা হয়, আর রুকূ'-সাজদার তাকবীরগুলো বলা হয় বারংবার । তাকবীর-ই তাহ্রীমা দ্বারা মূল নামায আরম্ভ হয়, আর রুকূ'-সাজদার তাকবীরগুলো দ্বারা নামাযের কয়েকটা রুক্ন আরম্ভ হয় মাত্র; মূল নামায নয় । তাকবীর-ই তাহ্রীমাহ্ নামাযীর উপর পার্থিব কাজ ও পানাহার ইত্যাদি হারাম করে দেয়; কিন্তু রুকূ'-সাজদার তাকবীরগুলোর কাজ বা অবস্থা এ নয় । এগুলোর পূর্বেই এ 'হারাম হওয়া' আরম্ভ হয়েছে ।

সুতরাং যখন রুকূ'র তাকবীর সাজদার তাকবীরের মত হলো, তাকবীর-ই তাহ্রীমার মতো হয়নি, তখন উচিৎ হবে রুকূ'র তাকবীরেরও ওই অবস্থা হওয়া, যা সাজদার তাকবীরেরই অবস্থা; অর্থাৎ হাত না উঠানো । সুতরাং সঠিক অভিমত হচ্ছে- রুকূ'তে যাওয়া (ও তা থেকে মাথা উঠানো)র সময় 'রফ'ই ইয়াদাঈন' মোটেই করবেনা । [তাহাভী শরীফ থেকে উদ্ধৃত]

সার সংক্ষেপঃ 'রফ'ই ইয়াদাঈন' (হাত উঠানো) রুকূ'তে যাবার সময়, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাতের এবং হযরাত সাহাবা-ই কেরাম, বিশেষত খোলাফা-ই রাশেদীন-এর আমলের পরিপন্থী শরীয়তের যুক্তিরও বিপরীত। যেসব বর্ণনায় রফ'ই ইয়াদা'ঈনের পক্ষে কথা এসেছে, সেগুলো মান্‌সূখ (রহিত); যেমনটি হাদীস নম্বর ১৮ তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা ওইসব হাদীস প্রাধান্যপ্রাপ্ত নয় এবং আমল করার উপযোগীও নয়; অন্যথায় হাদীসগুলোর মধ্যে কঠোর দ্বন্দ্ব হবে।

একথাও স্মর্তব্য যে, নামাযে প্রশান্তি ও একাগ্রচিত্ততা দরকার। বিনা কারণে নড়াচড়া মাকরূহ্ এবং সুন্নাতের পরিপন্থী। এ কারণেই নামাযে বিনা কারণে পা নাচানো ও আঙ্গুলগুলো নড়াচড়া করা নিষিদ্ধ। রফ'ই ইয়াদাঈনেও বিনা কারণে হাত দু'টি উঠানামা করা হয়। সুতরাং রফ'ই ইয়াদাঈনের হাদীসগুলো নামাযের মধ্যে প্রশান্তির বরখেলাফ। পক্ষান্তরে, রফ'ঈ ইয়াদাঈন বর্জনের হাদীসগুলো নামাযের প্রশান্তির অনুরূপ। সুতরাং যুক্তির দাবীও হচ্ছে এটাই যে, 'রফ'ঈ ইয়াদাঈন' না করা বা হাত না উঠানোর পক্ষের হাদীস শরীফগুলো অনুসারেই আমল করা হবে।

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলায় বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন

গায়র মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবী ওহাবীদের দিক থেকে এ পর্যন্ত 'রফ'ই ইয়াদাঈন' (তাকবীর-ই তাহরীমাহ্ ব্যতীত অন্যান্য তাকবীর বলার সময় হাত উঠানো) নিষিদ্ধ হবার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি আমাদের নিকট পৌঁছেছে, আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সেগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে সেগুলোর জবাব বা খন্ডন সহকারে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি। মহান রব আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন! আ-মী-ন।

আপত্তি-১

রফ'ঈ ইয়াদায়ন না করার পক্ষে যত রেওয়ায়ত পেশ করা হয়েছে, ওই সবই দ্ব'ঈফ বা দুর্বল। দুর্বল হাদীস আমলযোগ্য নয়। (ওই পুরানা সবক!)

খণ্ডন

জ্বী-হাঁ। ওইগুলো শুধু এজন্য দুর্বল যে, ওইগুলো আপনাদের বিপক্ষে। আর যদি আপনাদের পক্ষে হতো, তবে যদিও বানোয়াট বা মনগড়াও হতো, তবে আপনাদের মাথা ও চোখের উপর স্থান পেতো। জনাব! আল্লাহর দোহাই! আপনাদের 'দ্ব'ঈফ দ্ব'ঈফ' (দুর্বল, দুর্বল) বলতে থাকা লোকজনকে হাদীস অস্বীকারকারী করে ছেড়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে এ বদ-অভ্যাস ত্যাগ করুন! আমরা আপনাদের এ 'দ্ব'ঈফ'-এর অনেক খণ্ডন পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে করেছি।

আপত্তি-২.

ইমাম আবূ দাঊদ-এর হযরত বারা ইবনে 'আ-যিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস শরীফ সম্পর্কে খোদ্ ইমাম আবূ দাঊদ বলেছেন- هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِصَحِيْحٍ অর্থাৎ 'এ হাদীস সহীহ্ নয়।' বুঝা গেলো যে, এ হাদীস দ্ব'ঈফ (দুর্বল)। এতদ্‌সত্ত্বেও আপনারা (হানাফীগণ) সেটাকে কেন দলীল হিসেবে উপস্থাপন করছেন?

খণ্ডন

এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়ঃ

এক. কোন হাদীস 'সহীহ্' না হলে একথা অনিবার্য হয় না যে, সেটা 'দ্ব'ঈফ' (দুর্বল) হবে; 'সহীহ্' ও 'দ্ব'ঈফ'-এর মধ্যভাগে حسن بنفسه (হাসান বিনাফসিহী) ও حسن بغيره (হাসান বিগায়রিহী), যথাক্রমে, 'স্বয়ং হাসান' ও 'পরোক্ষভাবে হাসান'-দু'টি পর্যায়ও রয়েছে। ইমাম আবূ দাঊদ উক্ত হাদীস 'সহীহ' হবার পর্যায়টা অস্বীকার করেছেন মাত্র। তিনি সেটা দ্ব'ঈফ (দুর্বল) বলে দাবী করেননি।

দুই. ইমাম আবূ দাউদের 'এ হাদীস সহীহ্ নয়' বলা (হাদীসের পরিভাষায়) جرح مبهم (বা অস্পষ্ট সমালোচনা) বৈ-কিছু নয়। কারণ, তিনি তা সহীহ্ না হবার কারণ বলেননি। অর্থাৎ কোন্ রাভী (বর্ণনাকারী) দুর্বল এবং তিনি কেন দুর্বল তাও বলেননি। এমন সমালোচনা (جرح مبهم) গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি, আমরা ইমাম আবূ দাঊদের 'মুক্বাল্লিদ' নই; তাই তাঁর যে কোন সমালোচনা চোখ বুঝে মেনে নেওয়া আমাদের জন্য জরুরী নয়।

আপত্তি-৩.

ইমাম আবূ দাঊদ আপনাদের উপস্থাপিত হাদীস নম্বর ২৫ সম্পর্কে বলেন, "এ হাদীসের সনদে ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ রয়েছেন, যাঁর মধ্যে শেষ বয়সে ভুলে যাবার রোগ হয়েছিলো। তিনি তাঁর বার্দ্ধক্যে বলেছেন, ثُمَّ لَا يَعُوْدُ (অতঃপর এ হাত উঠানোর কাজ পুনরায় করতেন না)। অন্যথায় মূল হাদীসে এ বাক্যটির উল্লেখ নেই। এ নিন, جرح مفصل (বিস্তারিত সমালোচনা) হাযির! এখনতো এ হাদীস নিশ্চিতভাবে দুর্বল হলো; যা আমল করার যোগ্য থাকেনি।

খণ্ডন

এরও কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়ঃ

প্রথমত, ইয়াযীদ ইবনে আবূ যিয়াদ আবূ দাঊদের ওই বর্ণনার সূত্রের মধ্যে রয়েছেন; কিন্তু ইমাম-ই আ'যম হযরত আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সনদে নেই। সুতরাং এ সনদ ইমাম আবূ দাঊদ দুর্বল হিসেবে পেয়েছেন, কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'সহীহ' হিসেবে পেয়েছেন। ইমাম আবূ দাঊদের কোন বর্ণনাকারীর 'দুর্বলতা' ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জন্য ক্ষতিকর হবে কেন? অর্থাৎ হবে না।

দ্বিতীয়ত, রফ'ই ইয়াদাঈন না করার হাদীস অনেক সূত্রে বর্ণিত, সব ক'টিতে ইয়াযীদ ইবনে যিয়াদ নেই। যদিও এ সনদ দুর্বল হয়, তবে অন্য সনদগুলো কেন দুর্বল হবে?

তৃতীয়ত, ইমাম তিরমিযী 'রফ'ই ইয়াদাঈন' না করার হাদীসকে 'হাসান' (উত্তম) বলেছেন এবং অনেক সাহাবীর এর উপর আমল রয়েছে মর্মে বর্ণনা করেছেন। হে লা-মাযহাবীরা, আপনাদের দৃষ্টি ইমাম আবূ দাউদের এ হাদীসকে দুর্বল বলার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু ইমাম তিরমিযীর 'হাসান' (উত্তম) বলার উপর পড়েলানা, সাহাবীগণের আমলের প্রতিও গেলোনা। এটা কেন?

চতুর্থত, যদি এ হাদীসের সমস্ত সনদও দুর্বল হয়, তবুও সব দুর্বল সনদ মিলে সবল হয়ে গেছে, যেমনটি ইতোপূর্বেও ভূমিকায় বলা হয়েছে।

পঞ্চমত, আম ওলামা, আউলিয়া ও প্রায় সব (জমহুর) মিল্লাত-ই ইসলামিয়াহ্র আমল রফ'ই ইয়াদাঈন না করার পক্ষে ছিলো এবং রয়েছে। (অর্থাৎ, তাঁরা রফ'ই ইয়াদাঈন করেননি ও করছেন না।) এটা দ্বারাও এ হাদীস শরীফ সবল হয়ে গেছে; মুষ্ঠি পরিমাণ ওহাবী ব্যতীত সবাই এ আমল করে আসছেন।

আশ্চর্যের বিষয় যে, হে লা-মাযহাবীরা! আপনাদের দেড়জন লোকের দল কি সত্যের উপর আছে, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আম উম্মত কি গোমরাহীর উপর?

মনে রাখবেন এক পরিসংখ্যান অনুসারে, দুনিয়ার শতকরা পচান্নব্বই ভাগ মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী; আর পাঁচ ভাগ অন্যান্য মাযহাবের অনুসারী। এ পরিসংখ্যানের সত্যতা হেরমাঈন শরীফাঈনে গেলে বুঝা যায়। সেখানে প্রত্যেক দেশের মুসলমান একত্রিত হন। বেচারা ওহাবী সম্প্রদায় তো কোন গণনায়ই আসেনা। এরা হয়তো হাজারে একজন হবে।

হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করছেন-

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ যাকে আম মু'মিনগণ ভালো বলে, তা আল্লাহর দরবারেও ভালো।

হুযূর-ই আক্রাম আরো এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

اَلْزِمُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّه مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّار

অর্থাৎ আমার উম্মতের বড় দলের অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি বড় দল থেকে পৃথক হবে সে পৃথক হয়ে দোযখে যাবে।

স্মর্তব্য যে, শাফে'ঈ, মালেকী, হাম্বলী ও হানাফী- সবাই একদলভুক্ত। সবার আক্বীদা এক, সবাই 'মুক্বাল্লিদ' (মাযহাবের অনুসারী)। পক্ষান্তরে, 'গায়র মুক্বাল্লিদ' (লা-মাযহাবী) হচ্ছে মুষ্ঠি পরিমাণ। তারা মুসলমানদের জমা'আত বা দল থেকে আক্বীদায়ও পৃথক, আমলেও আলাদা। সুতরাং হানাফীদের কোন হাদীস দুর্বল হতেই পারেনা। উম্মতের আমল দ্বারা তা সবল। এ কিতাবের ভূমিকায় দেখুন।

আপত্তি-৪.

আপনাদের পেশকৃত হাদীস নম্বর-১, যা ইমাম তিরমিযী প্রমুখ হযরত ইবনে মাস'ঊদ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'মুজমাল' (সংক্ষিপ্ত)। কেননা, তাতে নামাযের সব নিয়ম বর্ণনা করা হয়নি; শুধু একথা বলা হয়েছে যে, ইবনে মাস'ঊদ শুধু একবার হাত তুলেছেন। তারপর কি করেছেন তা উল্লেখ করা হয়নি। আর 'মুজমাল' (সংক্ষিপ্ত) হাদীস আমলযোগ্য হয়না। (প্রশ্নকর্তা হলো ডেরা গাযীখানের এক কট্টর ওহাবী- লা-মাযহাবী।)

খণ্ডন

এ হাদীস শরীফ 'মুজমাল' নয়, 'মুত্বলাক্ব'ও নয়, 'আম'ও নয়, অর্থগত ও শব্দগত মুশতারাকও নয়; বরং হাদীসখানা 'মুখতাসার' বা দীর্ঘ হাদীস থেকে একাংশ উদ্ধৃত মাত্র। 'মুখতাসার' (সংক্ষেপিত) হাদীসের উপর আমল করতে কে নিষেধ করেছে? আর 'মুজমাল' হাদীসও বর্ণনাকারীর বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পর আমলযোগ্য হয়ে যায়; বরং তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য হয়ে যায়; কারণ, 'মুজমাল' বর্ণনাকারীর সবিস্তারে বর্ণনার পর 'মুহকাম' (স্পষ্ট ও আমলযোগ্য) হয়ে যায়।

আমাদের ঘোষণা

সারা দুনিয়ার ওহাবী, গায়র-মুক্বাল্লিদদের প্রতি ঘোষণা রইলো যে, আপনারা মুত্বলাক্ব, আম, মুজমাল ও মুশতারাক-ই মা'নাভী ও মুশতারাক-ই লফযীর মধ্যে পার্থক্যটা বলুন দেখি! আর সেগুলোর প্রত্যেকটির পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিন; কিন্তু ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে; উসূলে ফিক্বহ্ ও মানত্বিক্বে হাত লাগাবেন না।

হে ওহাবীরা! আপনারা তো হাদীসের ভুল অনুবাদই করে যাচ্ছেন। আপনাদের এসব ইল্‌মগত বিষয়াদির সাথে কিসের সম্পর্ক? হয়তো কোন হানাফী আলিমের নিকট 'মুজমাল' শব্দটা শুনেছেন। অতঃপর বানোয়াট দাপট দেখানোর জন্য

এখানে এ আপত্তিটা জুড়ে দিয়েছেন। আর তাতে এ শ্রুত শব্দটা ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইল্‌মের সমুদ্রতো মুক্বাল্লিদদের বুকেই প্রবাহিত করেছেন।

আপত্তি-৫.

আবূ দাঊদ, তিরমিযী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্ হযরত আবূ হুমায়দ সা-'ইদী থেকে এক দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যাতে রফ'ই ইয়াদাঈন সম্পর্কে ইবারত এভাবে রয়েছে-

ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ فَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ الخ

অর্থ: অতঃপর তিনি তাকবীর বলতেন এবং নিজের হাত এতটুকু উঠাতেন যে, দু' কাঁধের বরাবর হয়ে যেতো। আর আপন দু'হাতের তালু আপন হাঁটুযুগলের উপর রাখতেন। তারপর আপন শির উঠাতেন। তারপর বলতেন, 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্'। তারপর আবার হাত দু'টি উঠাতেন, এ পর্যন্ত যে, দু' কাঁধের বরাবর হয়ে যেতো।

আবূ হুমায়দ সা-'ইদী সাহাবীদের জমা'আতে এ হাদীস পেশ করেছেন, যাতে রুকূ'র সময় দু' হাত উঠানোর উল্লেখ রয়েছে। আর সবাই সেটার সত্যায়ন করেছেন। বুঝা গেলো যে, রফ'ই ইয়াদাঈন হুযূর-ই আক্বরামেরই আমল এবং এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে সাহাবা-ই কেরামের সত্যায়ন ও আমল। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ তদনুযায়ী আমল করা।

নোট: এ হাদীস এ ক্ষেত্রে ওহাবী-গায়র মুক্বাল্লিদদের চূড়ান্ত দলীল, যা নিয়ে তারা অত্যন্ত গর্ব করে থাকে।

খণ্ডন

এরও কতিপয় জবাব রয়েছে। ওইগুলো অতি গভীর মনযোগ সহকারে দেখুন-

প্রথমত, আপত্তিকারীদের উক্ত হাদীস সনদের দিক দিয়ে আমলযোগ্য নয়। কারণ, ওই হাদীসের সনদ আবূ দাঊদ ইত্যাদিতে এভাবে রয়েছে-

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْىٰ وَهٰذَا حَدِيْثُ اَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُالْحَمِيْدِ يَعْنِىْ اِبْنَ جَعْفَرٍ اَخْبَرَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدِ نِ السَّاعِدِىَّ فِىْ عَشَرَةٍ الخ

অর্থঃ আমাদেরকে মুসাদ্দাদ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, আমাদেরকে ইয়াহিয়া হাদীস শুনিয়েছেন। আহমদ বলেছেন, আমাদেরকে আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফর বলেছেন, তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আত্বা খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ হুমায়দ সা-'ইদী থেকে দশজন সাহাবীর জমা'আতে শুনেছি।

তাঁদের মধ্যে আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফর কঠোরভাবে সমালোচিত ও দুর্বল ব্যক্তি। দেখুন ত্বাহাভী শরীফ। দ্বিতীয় ব্যক্তি মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আত্বা আবূ হোমায়দ সা-'ইদীর সাথে সাক্ষাতই করেননি। আর বলে দিয়েছেন, আমি তাঁর নিকট শুনেছি। সুতরাং এটা ভুল। নিশ্চয় মধ্যভাগে কোন বর্ণনাকারী ছুটে গেছেন, যিনি 'মাজহুল' (একেবারে অপরিচিত)ও হতে পারেন। (ত্বাহাভী) এ দু' ত্রুটির কারণে এ হাদীস আমলযোগ্য নয়। কিন্তু যেহেতু, হে লা-মাযহাবীরা, এটা আপনাদের অনুকূলে, সেহেতু তা আপনাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে গেছে! একটু লজ্জাবোধ করুন!

দ্বিতীয়ত, হে আহলে হাদীস লা-মাযহাবীরা, এ হাদীস আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, এ হাদীসে একথাও আছে-

ثُمَّ اِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ

অর্থঃ অতঃপর যখন দু' রাক্আ'ত পড়ে উঠতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং আপন হাত উঠাতেন এ পর্যন্ত যে, ওই দু'টি দু' স্কন্ধের বরাবর হয়ে যেতো, যেমনিভাবে নামায শুরু করার সময় করেছিলেন।

এখন বলুন, আপনারা দু'রাক্'আত পড়ে উঠার সময় রফ'ই ইয়াদায়ন করেন না কেন?

তৃতীয়ত, যখন আবূ হুমায়দ সা-'ইদী এ হাদীস সাহাবীদের জমা'আতে পেশ করেছেন, তখন ওই সব বুযুর্গ তা-ই বলেছেন, যা আবূ দাঊদ শরীফে রয়েছে-

قَالُوْا فَلَمَّا فَوَاللّٰهِ مَا كُنْتَ بِاَكْثَرَنَا لَهٗ تَبَعَةً وَاَقْدَمَنَا لَهٗ صُحْبَةً قَالَ بَلٰى

অর্থঃ তাঁরা বলেন, "তুমি আমাদের থেকে বেশী হুযূরের নামায সম্পর্কে কীভাবে জেনে গেছো? তুমি না আমাদের থেকে বেশি হুযূরের সাথে রয়েছো, না আমাদের পূর্বে তুমি সাহাবী হয়েছো।" তখন আবূ হুমায়দ বলেন, "নিশ্চয় এমনই।"

এ থেকে বুঝা গেলো যে, আবূ হুমায়দ না সাহাবীদের মধ্যে ফক্বীহ্ ও আলিম, না হুযূরের সঙ্গ তাঁর বেশী পাওয়া সম্ভব হয়েছে। আর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হলেন আলিম ও ফক্বীহ্ সাহাবী, যিনি হুযূর-ই আক্রামের সাথে ছায়ার মতো থাকতেন। তিনি রফ'ই ইয়াদাঈনের বিরুদ্ধে রেওয়াত করেছেন। সুতরাং নিশ্চিতভাবেই আবূ হুমায়দের বর্ণনার মোকাবেলায় হযরত ইবনে মাস'ঊদের বর্ণনা বেশী গ্রহণযোগ্য; দু' হাদীসের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে মীমাংসা এমনিভাবেই দেওয়া হয়। সুতরাং হে লা-মাযহাবীরা, আপনাদের উপস্থাপিত এ হাদীস একেবারে আমলযোগ্য নয়।

চতুর্থত, আবূ হুমায়দ সা-'ইদী একথা বলেন নি যে, হুযূর এ পার্থিব হায়াত শরীফের শেষ পর্যন্ত 'রফ'ই ইয়াদাঈন করেছেন। তিনি তো শুধু এতটুকু বলেছেন যে, 'হুযূর এমন করতেন।' কিন্তু কতদিন যাবৎ করেছেন তার বর্ণনা নেই। এ সম্পর্কে তিনি কিছুই এরশাদ করেননি। আমি প্রথম পরিচ্ছেদে এ মর্মে হাদীস পেশ করেছি যে, রফ'ঈ ইয়াদায়নের হাদীসগুলো মান্সূখ (রহিত)। সুতরাং এটা ওই মানসূখ হাদীসেরই বর্ণনা বা অবতারণা মাত্র। কেননা, এক যুগে হুযূর-ই আক্রাম এমনটি করতেন। (পরবর্তীতে তা করেননি)। তাই এখন তা আমলযোগ্য নয়।

পঞ্চমত, এ হাদীস 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ' (শরীয়তসম্মত ক্বিয়াস' বা অনুমান)-এরও পরিপন্থী, আর সাইয়্যেদুনা ইবনে মাস্'ঊদের রেওয়ায়ত ক্বিয়াসের অনুরূপ। সুতরাং ওই হাদীস অনুসারে আমল করা ওয়াজিব বা অপরিহার্য। আর হে লা-মাযহাবীরা, আপনাদের উপস্থাপিত এ হাদীস বর্জন করা ওয়াজিব। কেননা, যখন হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ হয়, তখন 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ'র মাধ্যমে একটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এর অনেক উদাহরণ মওজূদ রয়েছে। দেখুন, এক হাদীসে আছে- اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ অর্থাৎ "আগুনে সিদ্ধ বা রান্নাকৃত জিনিষ আহার করলে ওযূ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।" আর অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- "হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম খানা খেয়ে ওযূ না করেই নামায সম্পন্ন করেছেন।" এখানে দু' হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা দিয়েছে। তখন প্রথমোক্ত হাদীসকে বর্জন করা হয়েছে। কারণ তা ক্বিয়াসের বিরোধী; দিবরাত্রি গরম পানি দ্বারা ওযূ করা হয় (ইত্যাদি)। দ্বিতীয় হাদীস অনুসারে আমল করা ওয়াজিব হয়ে গেছে। কারণ, তা ক্বিয়াসের অনুরূপ। এখানেও তেমনি।

ষষ্ঠত, আম সাহাবা-ই কেরামের আমল আপনাদের পেশকৃত হাদীসের পরিপন্থী হয়েছে; যেমনটি আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। বুঝা গেলো যে, সাহাবা-ই কেরামের দৃষ্টিতে 'রফ'ই ইয়াদাঈনের হাদীস মানসূখ (রহিত) ।

সপ্তমত, আবূ হুমায়দ সা-'ইদীর এ হাদীসের সনদে আবদুল হামীদ ইবনে জা'ফর এবং মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আত্বা এমনই অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী (রাভী) যে, আল্লাহরই পানাহ্! সুতরাং ইমাম মারেদী 'জাওহার-ই নাক্বী' নামক কিতাবে লিখেছেন, "আবদুল হামীদ মুন্কারুল হাদীস।" (আবদুল হামীদের বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয় ।) এ ইমাম মারেদী হলেন তিনি, যাঁর সম্পর্কে ইয়াহিয়া ইবনে সা'ঈদ বলেছেন- هُوَ اِمَامُ النَّاسِ فِىْ هٰذَاالْبَابِ অর্থাৎ তিনি হাদীস শাস্ত্রের ইমাম। আর মুহাম্মদ ইবনে আমর এমন মিথ্যুক যে, তার সাক্ষাৎ আবূ হুমায়দ সা-'ইদীর সাথে হয়নি, কিন্তু তিনি বলেছেন, سَمِعْتُ (আমি তার নিকট শুনেছি)। এমন মিথ্যুক লোকের বর্ণনা (রেওয়ায়ত) হয়তো বানোয়াট, নতুবা তিনি কমপক্ষে প্রথম শ্রেণীর 'মুদাল্লিস'। তাছাড়া এ হাদীসের সনদে রয়েছে কঠোর 'ইদ্বত্বিরাব'। সনদও 'মুদ্বতারাব' পর্যায়ের এবং মতনও। সুতরাং 'আত্তাফ ইবনে খালিদ যখন এটা বর্ণনা করলেন, তখন মুহাম্মদ ইবনে আমর এবং আবূ হুমায়দ সা-'ইদীর মধ্যভাগে একজন অজানা অবস্থার বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ হাদীস 'মাজহুল' (অপরিচিত)-ও। মোটকথা, এ হাদীসের মধ্যে একটি নয়, বরং অনেক ত্রুটি রয়েছে। এটা 'মুনকারও', 'মুদ্বত্বারাব'ও। মুদাল্লাস কিংবা মওদ্বূ'ও। সর্বোপরি 'মাজহুল' (অপরিচিত)ও।

দেখুন, আবূ দাউদ শরীফের হাশিয়া (পার্শ্বটীকা)'য়-এ স্থানে আছে- "এমন বর্ণনা নামেমাত্র উল্লেখ করার উপযোগীও নয়; তা থেকে দলীল গ্রহণ তো দূরের কথা।

অষ্টমত, ইমাম বোখারীও আবূ হুমায়দ সা-'ইদীর বর্ণনা নিয়েছেন বটে, কিন্তু তাতে না এমন রাভী রয়েছেন, না সেখানে রফ'ই ইয়াদায়নের উল্লেখ আছে। দেখুন- 'মিশকাত শরীফ: বাবু সিফাতিস্ সালাত'। যদি তাঁর বর্ণনায় রফ'ই ইয়াদায়নের উল্লেখ বিশুদ্ধ হতো, তাহলে ইমাম বোখারী অবশ্যই তা বাদ দিতেন না। মোটকথা, তোমাদের উপস্থাপিত এ হাদীস কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই দৃষ্টিপাত করার উপযোগী নয়।

হানাফী ভাইয়েরা!

'রফ'ই ইয়াদায়ন' গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের উঁচু স্তরের মাসআলা। আর এ আবূ হুমায়দ সা-'ইদীর এ হাদীস তাদের অতি গর্বের দলীল, যাকে ওহাবীদের শিশুরা

পর্যন্ত মুখস্থ করে নেয়, আর আম হানাফীগণ তাদের দৃঢ়তাগুলো দেখে মনে করেন, তাদের দলীল হয়তো অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ্, তাদের এ দলীলের নাটাইসহ উড়ে গেছে। এখন থেকে ওহাবী, লা-মাযহাবীরা এ হাদীস পেশ করার সাহস করবে না।

স্মর্তব্য যে, ওহাবীদের কোন সনদ (সূত্র) সমালোচিত (অগ্রহণযোগ্য) হয়ে যাওয়া ওহাবাদীদের জন্য ক্বিয়ামত তুল্যই। কেননা তাদের মাযহাবের বুনিয়াদ শুধু ওই সনদ বা সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি একটি সনদ (সূত্র) ভুল বলে প্রমাণিত হয়, তখন মনে করবেন- তাদের মাযহাবের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। কারণ ওই বেচারাদের এ সনদগুলো ব্যতীত অন্য কোন উপায় থাকেনা। এসব পীরবিহীন, মুরশিদবিহীন ও আলোবিহীন লোকের বেলায় তো নিম্নলিখিত আয়াতই প্রযোজ্য। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَه وَلِيًّا مُّرْشِدًا

অর্থাৎ "যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথভ্রষ্ট করেন, সে না কোন ওলী পায়, না পীর-মুরশিদ।" আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেন- وَمَنْ يَّلْعَنْهُ فَلَنْ تَجِدَ لَه نَصِيْرًا (অর্থাৎ যার উপর আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন, তার কোন মদদগার নেই)।

কিন্তু হানাফীদের উপস্থাপিত হাদীসের কোন সনদ সমালোচিত হলেও তাঁদের উপর সেটার কোন প্রভাব পড়ে না। কারণ, আমাদের ফিক্বহী মাসআলাগুলোর ভিত্তি সনদগুলোর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং হযরত ইমামুল আইম্মাহ্ (ইমামদের ইমাম), কাশিফুল গুম্মাহ্ (মেঘ দূরীভূতকারী) ও সিরাজে উম্মাহ্ (উম্মতের চেরাগ) ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পবিত্র বাণীর উপরই। ওই ইমাম-ই আ'যম, যিনি উম্মতের প্রদীপ, ইমাম বোখারীসহ আম মুহাদ্দিসগণের ওস্তাদদেরও ওস্তাদ, যাঁর দামনের নিচে হাজারো ওলী ও বিজ্ঞ আলিম রয়েছেন। যাঁর মাযহাব ওইসব জায়গায় মওজুদ রয়েছে, যেখানে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীন মওজুদ রয়েছে। তাঁর বাণী বা অভিমত আমাদের মাসআলাগুলোর দলীল। ইমাম আ'যমের দলীলগুলো ক্বোরআনের আয়াতসমূহ ও সহীহ্ হাদীসসমূহেরই অনুরূপ; যেগুলোর ব্যাপারে না কোন সন্দেহ আছে, না কোন অস্পষ্টতা। কেননা, ইমাম-ই আ'যম হলেন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অতি নিকটবর্তী যুগেরই।

উদাহরণ, দেখুন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর 'মীরাস' বন্টন করেননি; অথচ ক্বোরআন-ই করীমে মীরাস বন্টনের নির্দেশ রয়েছে। তখন তাঁর দরবারে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি বলেছিলেন, আমি হুযূর-ই আক্রাম থেকে শুনেছি, 'নবীগণের মীরাস বন্টন করা হয় না।' যেহেতু সিদ্দীক্ব-ই আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিজে সরাসরি এ হাদীস শুনেছিলেন, সেহেতু তিনি নির্দ্বিধায় সেটা অনুযায়ী আমল করেছেন। যদি এ হাদীস শরীফ থেকে আমরা দলীল গ্রহণ করতাম, তবে আমরা হাজারো মুসীবতের সম্মুখীন হতাম। যেমন- সনদগুলোর উপর হাজারো সমালোচনা হতো। কিন্তু সিদ্দীক্ব-ই আকবারের চক্ষুযুগল নীরব ক্বোরআনে মীরাস বন্টনের হুকুম দেখেছেন, কিন্তু তাঁর কানগুলো সবাক ক্বোরআন (নবী করীম) সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছেন যে, নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম ওই হুকুমের আওতাভুক্ত নন। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবারের হাদীস শরীফ সমালোচনা থেকে পবিত্র। তেমনি ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনাগুলোও সমালোচনা থেকে পবিত্র। কারণ তাঁর যুগ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমানা বা যুগের সাথে মিলিত। সুতরাং ওহাবীদের জন্য এ সনদগুলো মহাবিপদই। আমরা মুক্বাল্লিদদের উপর ওইসব সমালোচনার কোন প্রভাবই পড়েনা। দেখুন, আমি প্রথম পরিচ্ছেদে, ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যেই সনদ পেশ করেছি, তা সুবহা-নাল্লাহ্, কতই পবিত্র সনদ! কোন ওহাবীর কি এ সাহস আছে এ সনদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করার? মোটেই নেই।

আপত্তি-৬

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى تَكُوْنَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا اِفْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ اِذَا رَفَعَ رَأْسَه مِنَ الرَّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذٰلِكَ فِى السُّجُوْدِ -

অর্থা: নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাত শরীফ দু' কাঁধ শরীফ পর্যন্ত উঠাতেন যখন নামায শুরু করতেন এবং যখন রুকূ'র জন্য

তাকবীর বলতেন। আর যখন রুকূ' থেকে শির মুবারক উঠাতেন, তখনও তেমনি দু'হাত উঠাতেন এবং বলতেন, 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্, রাব্বানা লাকাল হাম্দ।' আর সাজদায় রফ'ই ইয়াদায়ন করতেন না।

এ হাদীস শরীফ বোখারী ও মুসলিমের। এর সনদও অতিমাত্রায় সহীহ্ (বিশুদ্ধ)। এটা দ্বারা রুকূ'র সময় ও রুকূ'র পর রফ'ই ইয়াদাঈন (দু'হাত উঠানো) প্রমাণিত হয়।

খন্ডন (জবাব)

এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়ঃ

এক. এ হাদীস শরীফে এ কথার উল্লেখ তো আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রুকূ'তে যাবার সময় রফ'ই ইয়াদায়ন করতেন, কিন্তু একথার উল্লেখ নেই যে, শেষ সময় পর্যন্ত হুযূর-ই আক্রামের এ আমল শরীফ বহাল ছিলো কিনা। আমরাও বলি যে, বাস্তবিকপক্ষে ইসলামে রফ'ই ইয়াদায়ন প্রাথমিক পর্যায়ে ছিলো; কিন্তু পরবর্তীতে এটা মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে। বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত এ হাদীস শরীফে ওই মানসূখ (রহিত) কর্ম শরীফের উল্লেখ রয়েছে। আর এটা মানসূখ হবার কথা আমি 'প্রথম পরিচ্ছেদ'-এ বর্ণনা করেছি।

দুই. সাহাবা-ই কেরাম রফ'ই ইয়াদায়ন করা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর কারণও শুধু এটাই যে, তাঁদের দৃষ্টিতে রফ'ই ইয়াদায়ন মান্সূখ। সুতরাং 'দারে ক্বুত্বনী'র ১১১ পৃষ্ঠায় সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে-

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ اِلاَّ عِنْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى فِىْ اِفْتِتَاحِ الصَّلٰوةِ-

অর্থ: তিনি (হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ) বলেন, আমি হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সাথে নামায পড়েছি। তাঁরা নামাযের শুরুতে 'তাকবীর-ই ঊলা' (তাকবীর-ই তাহ্রীমাহ্) ব্যতীত অন্য কোন সময়ে হাত তুলেন নি।

যদি 'রফ'ই ইয়াদাঈন'-এর সুন্নাতটি বহাল থাকতো, তাহলে এ বুযুর্গগণ আমলটি কেন ছেড়ে দিয়েছেন? (বস্তুত আমলটি মান্সূখ বলেই তো তাঁরা পরবর্তীতে তা করেন নি।)

তিন. এ হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর। আর খোদ্ তাঁর আমল এর বিপরীত। কারণ, তিনি রফ'ই ইয়াঈায়ন করতেন না। যেমন আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। বস্তুত যখন বর্ণনাকারীর আমল (কর্ম) তার বর্ণনার বিপরীত হয়, তখন একথা বুঝা যাবে যে, এ হাদীস খোদ্ বর্ণনাকারীর মতেও মান্সূখ। তাছাড়া, আমি প্রথম পরিচ্ছেদে একথাও দেখিয়েছি যে, হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও রফ'ই ইয়াদাঈন করতেন না। এ সাহাবীদের আমল এ হাদীসের 'মান্সূখ' বা রহিত হওয়া প্রমাণ করেছে।

চার. 'রিসালাহ-ই আফতাব-ই মুহাম্মদী'তে আছে- এ হাদীস হযরত ইবনে ওমর থেকে কয়েকটা সনদ বা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। আর সেটা অত্যন্ত দুর্বলও। কেননা, এক বর্ণনায় 'ইয়ূনুস' আছেন; যিনি অত্যন্ত দুর্বল বর্ণনাকারী। যেমন 'তাহযীব' কিতাবে আছে। এর দ্বিতীয় সনদে আবূ ক্বিলাবাহ্ রয়েছে; লোকটি খারেজী মতবাদের ছিলো। দেখুন 'তাহযীব'। আর তৃতীয় সনদে রয়েছে 'আবদুল্লাহ্', সে ছিলো কট্টর রাফেযী (শিয়া)। চতুর্থ সনদে রয়েছে শো'আয়ব ইবনে ইসহাক্ব। সেও মুর্জিয়া মতবাদের লোক ছিলো। মোটকথা, রফ'ই ইয়াদায়নের পক্ষের হাদীসগুলোর বর্ণনাকারীদের মধ্যে রাফেযীও রয়েছে। কেননা, এটা রাফেযীদের আমল। তারা রফ'ই ইয়াদায়ন করে থাকে।

আপত্তি-৭

বোখারী শরীফে হযরত নাফি' থেকে বর্ণিত-

اَنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه رَفَعَهُمَا وَاِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذٰلِكَ اِبْنُ عُمَرَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, তখন তাকবীর বলতেন এবং উভয় হাত উঠাতেন। আর যখন 'সামি'আল্লাহু-লিমান হামিদাহু' বলতেন, তখনও উভয় হাত উঠাতেন। আবার যখন দু'রাক্'আত থেকে দাঁড়াতেন, তখনও উভয় হাত উঠাতেন। সর্বোপরি, তিনি এ কর্ম শরীফকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে সম্পৃক্ত করতেন। (মারফূ' বলে সাব্যস্ত করতেন)। দেখুন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রুকূ'তে যাবার সময় রফ'ই ইয়াদাঈন করতেন, কাজেই রফ'ই ইয়াদাঈন সাহাবীগণের সুন্নাতও।

খন্ডন.

এর দু'টি জবাব দেওয়া যায়ঃ

এক. এ হাদীস আপনাদের (বিরুদ্ধবাদীগণ)ও বিপরীত। কারণ এ'তে দু' রাক্'আত থেকে উঠার সময়ও রফ'ই ইয়াদাঈনের প্রমাণ মিলে। বিরুদ্ধবাদীরা শুধু রুকূ'র সময় রফ'ই ইয়াদাঈন করে থাকে, দু'রাক্'আত থেকে ওঠার সময় করে না।

দুই. আমি প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীস বর্ণনা করেছি- হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন- আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি শুধু তাকবীর-ই তাহ্রীমার সময় হাত উঠাতেন। সুতরাং এখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের দু'ধরনের কর্ম বর্ণিত হয়েছে- রুকূ'র সময় হাত উঠানো এবং না উঠানো। সুতরাং এ উভয় হাদীসের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, মান্সূখ হবার খবর পাবার পূর্বে তিনি হাত উঠাতেন, মানসূখ হবার খবর পাওয়ার পর থেকে তিনি হাত উঠাতেন না। কেননা, এ হাদীসে সময়ের উল্লেখ নেই- কখন ও কোন্ সময় পর্যন্ত তিনি হাত উঠাতেন। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে গেছে। সুতরাং ত্বাহাভী শরীফে আছে-

فَقَدْ يَجُوْزُ اَنْ يَّكُوْنَ اِبْنُ عُمَرَ فَعَلَ مَا رَاٰهُ طَاؤُسٌ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ الْحُجَّةُ عِنْدَه بِنُسْخِه وَتَرَكَه وَفَعَلَ مَا ذَكَرَه عَنْهُ مُجَاهِدٌ ثُمَّ قَامَتِ الْحُجَّةُ عِنْدَه بِنُسْخِه

অর্থঃ এটাও হতে পারে যে, সাইয়্যেদুনা ইবনে ওমর রফ'ই ইয়াদাঈন, যা ত্বাঊস দেখেছেন, মান্সূখ হবার প্রমাণ পাওয়ার পূর্বে করেছেন। অতঃপর যখন সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের নিকট রফ'ই ইয়াদাঈন মান্সূখ হওয়া নিশ্চিত হয়ে গেলো, তখন তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন। আর তা-ই করেছেন, যা হযরত মুজাহিদ দেখেছেন। (তিনি রফ'ঈ ইয়াদায়ন করতেন না।)

মোটকথা, আমাদের মতে, উভয় হাদীস শরীফ বিশুদ্ধ; তাও এ মর্মে যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আমল কিন্তু ওহাবী-লামাযহাবীদেরকে একটা হাদীস ছেড়ে দিতে হয়। বস্তুত কোন হাদীসকে ছেড়ে দেওয়া (অস্তিত্বকে মেনে না নেওয়া)'র চেয়ে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা উত্তম।

---o---

আপত্তি-৮

মুসলিম শরীফে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা রয়েছে- সেটার কিছু সংখ্যক শব্দ নিম্নরূপ-

فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ

অর্থ: যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ‘সামি‘আল্লাহু লিমান হামিদাহ্’ বলেছেন, তখন উভয় হাত শরীফ উঠিয়েছেন আর যখন সাজদাহ্ করেছেন, তখন উভয় হাতের মধ্যখানে সাজদাহ্ করেছেন।
এথেকেও ‘রফ‘ই ইয়াদাঈন’ প্রমাণিত হয়।

খন্ডন

হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর এ বর্ণনা (হাদীস) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদের রেওয়ায়ত (হাদীস)-এর মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর শুধু একবার হাত উঠানোর কথা বর্ণনা করেছেন। কারণ, ইবনে হুজর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি এক/আধবার হুযূর-ই আক্রামের পেছনে নামায পড়েছেন। কোন বিধান মানসূখ হবার খবর অতি কষ্টে পেতেন; কিন্তু হযরত ইবনে মাস‘ঊদ সবসময় হুযূর-ই আক্রামের সাথে থাকতেন। বড় আলিম ও ফক্বীহ্ সাহাবী ছিলেন। তাছাড়া, হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর হয়তো হুযূর-ই আক্রামের পেছনে সর্বশেষ কাতারে দন্ডায়মান হয়েছিলেন। হযরত ইবনে মাস্‘ঊদ তো প্রথম কাতারে বিশেষ করে হুযূর-ই আক্রামের পেছনে দন্ডায়মান হন এমন সাহাবী। কেননা, হুযূর-ই আক্রামের পেছনে আলিম-ফক্বীহ্ সাহাবীগণ দন্ডায়মান হতেন। খোদ্ সরকার-ই দু’আলম নির্দেশ দিয়েছিলেন- لِيَلِيَنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى অর্থাৎ তোমাদের থেকে আমার নিকটে তারাই যেন থাকে, যারা ইল্ম ও বিবেক সম্পন্ন।

সুতরাং ‘মুসনাদ-ই ইমাম আ’যম-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ সাইয়্যেদুনা ইব্রাহীম নাখ‘ঈকে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজরের ওই বর্ণনা (হাদীস) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, যাতে তিনি ‘রফ‘ই ইয়াদাঈন’-এর উল্লেখ করেছেন। তখন হযরত ইব্রাহীম নাখ‘ঈ অতি উত্তম জবাব দিয়েছেন। তা নিম্নরূপ-

فَقَالَ اَعْرَابِىٌّ لاَ يَعْرِفُ شَرَائِعَ الْاِسْلَامِ وَلَمْ يُصَلِّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ صَلٰوةً وَّاحِدَةً وَقَدْ حَدَّثَنِىْ مَنْ لاَ اُحْصِىْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّه كَانَ يَرْفَعُ فِىْ بَدْءِ الصَّلٰوةِ فَقَطْ وَحَكَاهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللهِ عَالِمٌ بِشَرَائِعِ الْاِسْلَامِ وَحُدُوْدِه مُتَفَقِّدٌ لِاَحْوَالِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلاَزِمٌ لَه فِىْ اِقَامَتِه وَاَسْفَاره وَقَدْ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لاَ يُحْصٰى -

অর্থ: তিনি বলেন, ওয়াইল ইবনে হুজর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন না। হুযূর-ই আক্রামের সাথে কয়েকবার মাত্র নামায পড়তে পেরেছেন। আর আমার নিকট অগণিত লোক হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ থেকে বর্ণনা করছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ ইসলামের বিধানাবলী সম্পর্কে ওয়াক্বিফহাল; হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থাদির নিশ্চিত খবর তিনি রাখতেন। তিনি সফরে ও নিজ অবস্থানস্থলে হুযূর-ই আক্রামের সাথে থাকতেন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে অগণিত নামায পড়েছেন।

সারকথা হলো- আলিম, ফক্বীহ্ ও হুযূর-ই আক্রামের সাথে সর্বদা অবস্থানকারী সাহাবীর বর্ণনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। সুতরাং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর বর্ণনাই আমল করার উপযোগী। তাঁর এ বর্ণনার মোকাবেলায় হযরত ওয়া-ইল ইবনে হুজরের বর্ণনা (হাদীস) আমলের উপযোগী নয়। তিনি রফ‘ই ইয়াদায়ন মানসূখ হবার পূর্বেকার কাজ দেখেছেন। সুতরাং সেটাই তিনি বর্ণনা করেছেন।

আপত্তি -৯

যদি তাকবীর-ই তাহ্রীমাহ্ ব্যতীত রফ‘ই ইয়াদাঈন না করাই সমীচীন হয়, তাহলে আপনারা ঈদের নামায ও বিতরের নামাযে রুকূ’র সময় রফ‘ই ইয়াদাঈন করেন কেন? ওই দু’নামায কি নামায নয়?

খন্ডন

এ প্রশ্ন থেকে বিরুদ্ধবাদী আপত্তিকারীদের অসহায়ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে তো তারা লা-জাওয়াব হয়ে গেছে, এখন ভিত্তিহীন বাহানা গড়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আরে জনাব! এখানে কথা হচ্ছে- ওই রফ‘ই ইয়াদাঈন সম্পর্কে, যাকে আপনারা নামাযের সুন্নাত কিংবা রুকূ’র সুন্নাত মনে করেন। দু’ ঈদ ও বিত্‌রের রফ‘ই ইয়াদাঈন তো রুকূ’র সুন্নাত নয়; বরং ঈদের নামায ও দো‘আ ক্বুনূতের সুন্নাতই। এ কারণেই ঈদের নামাযের একেক রাক্‘আতে তিনবার করে রফ‘ই ইয়াদায়ন (হাত উত্তোলন) করতে হয়। আর বিতরের নামাযে রুকূ’র পূর্বে নয়, বরং দো‘আ ক্বুনূতের পূর্বে করা হয়। যেমন ঈদের নামাযে খোৎবা, জামা‘আত ইত্যাদি আর বিতরের নামাযে দো‘আ ক্বুনূত,

তিন রাক'আত ইত্যাদি বিশেষ নিয়ম রয়েছে, অনুরূপ ছয় তাকবীর এবং ছয়বার রফ'ই ইয়াদাঈন ঈদের নামাযেরই বৈশিষ্ট্য। যদি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযকে ঈদের নামায কিংবা বিত্‌রের নামাযের উপর অনুমান করে থাকেন, তবে হে ওহাবী লা-মাযহাবীরা, প্রত্যেক রুকূ'তে তিনবার করে রফ'ই ইয়াদায়ন করে নিন এবং প্রত্যেক নামাযে দো'আ ক্বুনূত পড়তে থাকুন।

আপত্তি -১০

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যখন 'সূরা কাওসার শরীফ' নাযিল হলো, তখন হুযূর-ই আক্‌রাম হযরত জিব্রাইলকে বললেন, "হে জিব্রাঈল, 'নাহ্‌র' কী জিনিস, যা করতে আমাকে নামাযের সাথে নির্দেশ দিয়েছেন?" তখন হযরত জিব্রাঈল বললেন, "এ নাহর মানে ক্বোরবানী নয়; বরং اِذَارَتَّحْتَ لِلصَّلٰوةِ اَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ اِذَا كَبَّرْتَ وَاِذَا رَكَعْتَ وَاِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَاِنَّهَا صَلٰوتُنَا وَصَلٰوةُ الْمَلٰئِكَةِ الَّذِيْنَ فِى السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ -

অর্থাৎ যখন আপনি নামাযের জন্য তাকবীর-ই তাহ্‌রীমাহ্‌ বলবেন, তখন আপন দু' হাত উঠাবেন আর যখন রুকূ' করবেন এবং শির মুবারক উঠাবেন। কেননা, এটাই আমাদের নামায এবং ওইসব ফেরেশতার নামায, যাঁরা সাত আসমানে রয়েছেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, ক্বোরআন করীম যেভাবে নামায পড়ার হুকুম দিয়েছে, তেমনিভাবে রফ'ই ইয়াদাঈনেরও হুকুম দিয়েছে। সুতরাং রফ'ই ইয়াদাঈন তেমনি জরুরী যেমন নামায জরুরী। কারণ, মহান রব এরশাদ করেছেন- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (অর্থাৎ তাদের মতে, অতঃপর আপনার রবের জন্য নামাযও পড়ুন, রফ'ই ইয়াদাঈনও করুন!) একথাও বুঝা গেলো যে, ফিরিশ্‌তাগণও রফ'ই ইয়াদাঈন করেন। সুতরাং যেসব লোক রফ'ই ইয়াদাঈন করে না, তারা হুযূর-ই আক্‌রামেরও বিরোধী, সাহাবা-ই কেরামেরও, ফিরিশতাদেরও। ফরশ ও আরশের উপর রফ'ই ইয়াদাঈন হয়। আপনারা এক ইমাম আবূ হানীফার অনুসরণে ওইসব পবিত্রাত্মার বিরোধিতা করবেন না!

জরুরী নোট:

ডেরাগাযী খানের গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের পক্ষ থেকে রফ'ই ইয়াদাঈন সম্পর্কে একটি একটি প্রচারপত্র বিনামূল্যে বিলি করা হয়েছে। আমার নিকটও

একটি প্রেরণ করা হয়েছে। এ'তে এ আপত্তিটা অতি জোরে শোরে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা তাদের এমন এক আপত্তি, যা পুরানা ওহাবীরা চিন্তাও করেননি।

খন্ডন

ওহে লা-মাযহাবী ওহাবীরা! আপনারা অথবা আপনাদের কোন গুরু ঠাকুর মিথ্যা হাদীস তো রচনা করে নিয়েছেন; কিন্তু রচনাও করতে জানেন নি। মিথ্যা বলার জন্যও একটা ধরন আছে। আপনাদের রচিত এ হাদীসই আপনাদের ভ্রান্ত মতবাদের নৌযানকে ডুবিয়ে ছেড়েছে। যেহেতু আপনারা সেটার সনদ বর্ণনা করেননি, সেহেতু সনদের উপর আলোচনা করা যাচ্ছে না, একথাও বলা যাচ্ছে না যে, সেটার রচয়িতা কে? অবশ্য হাদীসটার (!) মতনের উপর কয়েক প্রকারে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন-

প্রথমত, আপনারা وَانْحَرْ -এর অনুবাদ করেছেন রুকূ'র পূর্বে ও রুকূ'র পরে হাত উঠানো। এটা কোন অভিধান গ্রন্থ থেকে প্রমাণিত? نحر (নাহ্‌র)-এর অর্থ 'হাত উঠানো, রুকূ'র পূর্বে ও পরে' কোত্থেকে নিয়েছেন? এতগুলো অর্থের পুট্‌লী একটি মাত্র শব্দ 'নাহর' (نحر)-এর মধ্যে কে ভর্তি করে দিলো?

হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্‌ সালাম কি আরবী ভাষার অভিধান সম্পর্কেও জানতেন না? যিনি نحر (নাহ্‌র) শব্দের এ অর্থ বলে গেলেন? তারপর হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র আহলে বায়তও জিজ্ঞাসা করলেন না- হে জিব্রাঈল, 'নাহ্‌র' শব্দের এ বিরল অর্থ (!) কোত্থেকে নেওয়া হয়েছে? কিভাবে নেওয়া হয়েছে? অভিধানগ্রন্থের বরাত পেশ করুন! যদি ক্বোরআন ও হাদীসের অর্থ এভাবে করা আরম্ভ হয়ে যায়, তবে তো এ দ্বীনকে মহান রবই হিফাযত করবেন! যদি বলা হয়- 'সালাত' মানে 'রুটি খাওয়া, যাকাত মানে পানি পান করা, হজ্জ মানে কাপড় পরা, 'রোযা' মানে খাটের উপর শয়ন করা, জিহাদ মানে দোকানদারী করা ইত্যাদি, তা হলে তো দ্বীনের পাঁচটি স্তম্ভই খতম হয়ে যাবে! একটু লজ্জাবোধ করুন! আপনাদের ভ্রান্ত মতবাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য 'হাদীস' কেন রচনা করতে আরম্ভ করেছেন?

দ্বিতীয়ত, এখানে 'নাহ্‌র' -এর عطف 'সালাত-এর উপর করা হয়েছে। معطوف ও معطوف عليه পরস্পর ভিন্নই হয়। সুতরাং এটা অনিবার্য যে, 'নাহ্‌র'-এর অর্থ দু'হাত উঠানো না হওয়া। কারণ এটা তো নামাযের অংশ, নামাযের বাইরের কোন কাজ নয়।

তৃতীয়ত, যখন তোমাদের মতে, وَانْحَر -এর অর্থ رفع يدين (রফ'ই ইয়াদাঈন) হলো, আর এ নির্দেশ ক্বোরআনে করীমে নামাযের হুকুমের সাথে করা হলো, তখন তো উচিত হবে- নামায যেমন অকাট্য ফরয, যার অস্বীকারকারী দ্বীন থেকে খারিজ হয়ে যায়, তেমনি 'দু'হাত উঠানো'ও অকাট্য ফরয হওয়া; যার সব অস্বীকারকারী কাফির হবে, আর আপনারা কেন এটাকে (রফ'ই ইয়াদাঈন) ফরয বলছেন না? শুধু সুন্নাত-ই বা কেন বলছেন? আর যখন হানাফীদের এসব প্রশ্নের জবাব দিতে পারছেন না, তখন 'রফ'ই ইয়াদায়ন' ছাড়ছোনা কেন? তাও একথা বলে যে, 'রফ'ই ইয়াদায়ন করাও সুন্নাত, না করাও সুন্নাত। তোমাদের যা ইচ্ছা হয়- আমল করো।'

এখন বলুন, এটা ফরয বলে এটা অস্বীকার করে 'কাফির' কে হলো?

চতুর্থত, কোন মুহাদ্দিস 'রফ'ই ইয়াদাঈন'কে 'অকাট্য ফরয' বলেননি। ইমাম তিরমিযী 'রফ'ই ইয়াদাঈন' না করার হাদীসকে 'হাসান' (উত্তম) বলেছেন, আর বলেছেন, এ হাদীসের উপর অনেক আলিম, সাহাবী, তাবে'ঈর আমল ছিলো ও রয়েছে। সুতরাং এখন আপনারা ইমাম তিরমিযী ও সমস্ত মুহাদ্দিসকে কী বলবেন? তাঁরা তো রফ'ই ইয়াদায়নকে ফরয বলেন নি। তাঁরা এখন আপনাদের মতে ইসলামের গন্ডিতে আছেন কিনা? এখন তাঁদের কিতাব থেকে হাদীস গ্রহণ করা জায়েয কিনা?

পঞ্চমত, আমি প্রথম পরিচ্ছেদে দলীলাদি দ্বারা প্রমাণ করেছি যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, হযরত ওমর ফারূক্ব, হযরত আলী মুরতাদ্বা, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমা'ঈন-এর মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবীগণ 'রফ'ই ইয়াদাঈন' করতেন না বরং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তা করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। হে লা-মাযহাবীরা, আপনাদের কথানুসারে এমন একটি ক্বোরআনী ফরয, যা নামাযের মতো ফরয, ওই সাহাবা-ই কেরামের নিকট থেকে গোপন ছিলো, আর চৌদ্দশ' বছরাধিককাল পরে তা ডেরা গাযী খানের এক মৌলভী জানতে পারলো এটা হতভম্ব করার মতো বিষয় নয় কি?

ষষ্ঠত, আপনারা হাদীস রচনা করে তা মাওলা-ই কায়েনাত হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, খোদ্ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খোদ্ এটা বর্ণনা করছেন আর

আমল করেন সেটার বিপরীত। অর্থাৎ তিনি রফ'ঈ ইয়াদায়ন করতেন না। তা কেন?

সপ্তমত, আপনাদের কথা মতো, খোদ্ হুযূর-ই আক্রাম وَانْحَرْ -এর অর্থ হযরত জিব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর নিজেই তদনুযায়ী আমল করেন নি বলে প্রমাণ মিলে। যেমন আমি প্রথম পরিচ্ছেদে আরয করেছি। সুতরাং 'রফ'ই ইয়াদাঈন'-এর বিষয়টিও নামাযের 'ফরয হওয়া'র মতো প্রচার করা উচিত ছিলো, 'রফ'ই ইয়াদাঈন' না করলে, তাদের বিরুদ্ধে তেমনি জিহাদ করা ফরয হতো, যেমন হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে করেছিলেন। মোল্লাজি! হাদীসটি রচনা করার পূর্বে উচুঁ-নিচু তথা পরিণতি সম্পর্কে ভেবে দেখা দরকার ছিলো!

মুসলিম ভাইয়েরা!

গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, এ-ই হলো এসব লোকের হাদীসের অনুসরণ! তারা আমাদের থেকে প্রত্যেক মাসআলায় বোখারী মুসলিমের হাদীস দাবী করে, আর নিজের জন্য এমন ভিত্তিহীন হাদীস গড়ার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে না। হয়তো 'আহলে হাদীস' মানে বানোয়াট হাদীস রচনাকারী।

আপত্তি-১১

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি) বলেন, اِذَا ثَبَتَ حَدِيْثٌ فَهُوَ مَذْهَبِىْ (যখন কোন হাদীস প্রমাণিত হয়, তখন সেটাই আমার মাযহাব)।

যেহেতু 'রফ'ই ইয়াদাঈন' এবং ইমামের পেছনে ক্বিরআত পড়া সম্পর্কে প্রমাণিত হলো যে, ইমাম আবূ হানীফার অভিমত হাদীসের বিরোধী, সেহেতু আমরা তাঁর অভিমতকে বর্জন করেছি এবং রসূলের হাদীসের উপর আমল করেছি। নিজে অনুসন্ধান করে হাদীসের উপর আমল করাই তো হানাফী মাযহাব। (আম ওহাবী-লা মাযহাবী)

খন্ডন

জ্বী-হাঁ, আর বিশেষ করে যখন হাদীসের গবেষক (মুহাক্বিক্বিক্ব) আপনাদের মতো 'মুহাক্বাক্বক্ব' (হুক্কাপায়ী) হয়, যারা উত্তমরূপে শৌচকর্ম সম্পন্ন করতে জানে না,

যারা 'বোখারী'কে 'বুক্‌খারী' 'মুসলিম'কে মুসাল্লুম' এবং 'হাদীস'কে 'হাদ্দীস' বলে, তখনতো কথাই নেই!

জনাব! হযরত ইমাম-ই আ'যম আপনাদের মতো 'বুযের গু' দেরকে এমন খোলাখুলি অনুমতি দেয়নি। বরং ইমাম-ই আ'যমের উক্ত বাণীর সঠিক অনুবাদ (মর্মার্থ) হচ্ছে- اِذَا ثَبَتَ حَدِيْثٌ فَهُوَ مَذْهَبِىْ। অর্থ: "যখন হাদীস প্রমাণিত হয়ে গেলো, তখন সেটা আমার মাহযাব হলো।"

"হে মুসলমানরা, আমি প্রতিটি মাসআলার জন্য হাদীস-ই রসূল তালাশ করেছি এবং সেটার প্রতিটি দিক গভীরভাবে যাচাই-বাছাই ও চিন্তা-গবেষণা করেছি। সনদ ও মতনের উপর চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। যখন সব ক'টি দিক দিয়ে সেটা হাদীস বলে প্রমাণ পেয়েছি তখনই সেটাকে আমার মাযহাব সাব্যস্ত করেছি।"

সুতরাং এ মাযহাব অতিমাত্রায় মজবুত ও গবেষণালব্ধ। সুতরাং আপনারা হাদীসের সমুদ্রে নিজেরা লাফিয়ে পড়বেন না। ঈমান থাকলে সেটা হারিয়ে যাবে; বরং আমাদের বের করা মুক্তাগুলো ব্যবহার করুন! সমুদ্র থেকে মুক্তা বের করা প্রত্যেকের কাজ নয়। শুধু ডুবুরীরাই এ কাজ করতে পারে। ডিস্‌পিনসারী থেকে ওষুধ যদি রোগী নিজে বের করে সেবন করে, তবে তো তার মৃত্যু অনিবার্য। অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুসারে ওষুধ সেবন করুন! ক্বোরআন-হাদীস হচ্ছে রূহানী ঔষধের দাওয়াখানা। ইমাম-ই আ'যম হলেন ত্বীবে আ'যম (মহা চিকিৎসক)। যদি ক্বোরআন ও হাদীস ওষুধ হয়, সত্যিকার অর্থে মুজতাহিদ ইমাম যদি ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন, তবেই দেখো উপকার পাওয়া যায় কিনা!

ইমামে আ'যমের উক্ত বাণীর অর্থ এ নয় যে, 'আমি শরীয়তের সব কানূন ও মাসআলা চিন্তা ভাবনা না করে নিছক মনগড়াভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। ওহে বোধশক্তিহীন মুর্খরা! তোমরা শুধু হাদীসের ভুল অনুবাদ করতে জেনেছো, ধর্মের মধ্যে ফিৎনা ছড়াতে জেনেছো! যেখানে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অনুসন্ধান ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়া রোগীর জন্য যেনতেনভাবে ব্যবস্থাপত্র দেন না, সেখানে ইমামে আ'যম আলায়হির রাহ্‌মাহ্‌র মতো হাকীমে মিল্লাত, সিরাজে উম্মাত চোখ বন্ধ করে ক্বোরআন হাদীস না দেখে রূহানী ব্যবস্থাপত্র ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানের জন্য কিভাবে লিখে দিলেন? এমনটির কখনো কল্পনাও করা যেতে পারে না। আল্লাহ্‌ পাক বুঝ শক্তি দান করুন। আ-মী-ন।

সপ্তম অধ্যায়

[বিতর নামায ওয়াজিব এবং তিন রাক'আত]

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিতর নামায ওয়াজিব ও তিন রাক্‘আত

আরবীতে وِتْرٌ (বিত্‌র) শব্দের আভিধানিক অর্থ বিজোড় সংখ্যা; অর্থাৎ যা সমান দু’ভাগে বিভক্ত হতে পারে না। যেমন- তিন, পাঁচ ও সাত ইত্যাদি। এর বিপরীতে আরবীতে আসে شَفْعٌ (শাফ‘উন)। অর্থাৎ জোড় সংখ্যা, যা সমান দু’ভাগে বিভক্ত হতে পারে।

শরীয়তের পরিভাষায় বিত্‌র (وِتْرٌ) ওই বিজোড় রাক্‘আত বিশিষ্ট নামাযকে বলা হয়, যা এশা নামাযের পর, চাই তাহাজ্জুদের সময় অথবা এশার নামাযের পরপর সম্পন্ন করা হয়।

আমাদের হানাফী মাযহাবের বিধান অনুযায়ী ‘বিত্‌র’ নামায ওয়াজিব। এ নামায বর্জনকারী জঘন্য গুনাহ্‌গার। সেটা ছুটে গেলে ক্বাযা দেওয়া অপরিহার্য। আর বিতর নামায তিন রাক্‘আত। পক্ষান্তরে, গায়র মুকাল্লিদ, লা-মাযহাবী ওহাবীরা বলে বেড়ায়- বিত্‌র নামায ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাত, তাও গায়র মুআক্কাদাহ্‌, অর্থাৎ নফল। তদুপরি বিত্‌র এক রাক্‘আত।

এ উভয় পক্ষের বর্ণনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আমাদের হানাফী মাযহাবের বক্তব্য সত্য ও সঠিক, আর ওহাবী-লা-মাযহাবীদের কথা ভুল ও নিছক বাতিল। এখানে মূলত বিত্‌র নামায তিন রাক্‘আত মর্মে সপ্রমাণ আলোচনা করবো এবং প্রাসঙ্গিকভাবে বিত্‌র ওয়াজিব মর্মে বর্ণিত কয়েকটা বিশুদ্ধ হাদীসও উল্লেখ করবো- ইন্‌শা-আল্লাহ্‌!

বিত্‌র নামায ওয়াজিব

হাদীস নম্বর ১-৩

সর্ব ইমাম আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্‌ হযরত আবূ আইয়ূব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ-

অর্থ: তিনি বলেন, হুযূর রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর বিত্‌র অপরিহার্য।

হাদীস নম্বর- ৪

বায্‌যার হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ-

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, বিত্‌র প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব (অপরিহার্য)।

হাদীস নম্বর- ৫-৬

আবূ দাঊদ ও হাকিম হযরত বুরায়দাহ্‌ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَّمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا-

অর্থ: আমি হুযূর রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি- বিত্‌র অপরিহার্য ও জরুরি। সুতরাং যে ব্যক্তি বিত্‌র পড়েনা সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হাদীস নম্বর-৭

হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আহমদ হযরত আবদুর রাহমান ইবনে রাফি’ তানূখী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মু‘আয ইবনে জবল যখন সিরিয়ায় তাশরীফ আনয়ন করলেন, তখন দেখলেন যে, সিরিয়ায় লোকেরা বিতরের নামাযে অলসতা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করছে। তিনি হযরত আমীর মু‘আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর নিকট এর অভিযোগ করলেন। আর বললেন, ‘‘সিরিয়ার লোকেরা বিত্‌র পড়ে না কেন?’’

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اَوَاجِبٌ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ زَادَنِىْ رَبِّىْ عَزَّوَجَلَّ صَلٰوةً هِىَ الْوِتْرُ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ -

অর্থ: তখন হযরত আমীর মু‘আভিয়া বললেন, ‘‘মুসলমানদের উপর কি বিত্‌র ওয়াজিব?’’ হযরত মু‘আয ইবনে জবল বললেন, ‘‘হ্যাঁ।’’ আমি হুযূর-ই আকরামকে এ মর্মে এরশাদ করতে শুনেছি, ‘‘আমাকে মহান রব আরো একটি নামায দিয়েছেন যা বিত্‌রই; এশা ও ফজর উদিত হবার মধ্যভাগে।

হাদীস নম্বর-৮

ইমাম তিরমিযী হযরত যায়দ ইবনে আসলাম থেকে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهٖ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ-

অর্থ: যে ব্যক্তি বিত্‌র না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে সে যেন সকালে সেটার ক্বাযা করে দেয়।

হাদীস নম্বর-৯-১৪

আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, আহমদ, ইবনে হাব্বান ও হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন, আর হাকিম বলেছেন, এ হাদীস বিশুদ্ধ - শায়খায়ন (ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম)-এর শর্তানুসারে:

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ-

অর্থ: হুযূর-ই আকরাম রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, বিত্‌র অপরিহার্য, ওয়াজিব প্রত্যেক মুসলমানের উপর।

এসব হাদীস শরীফ থেকে দু'টি কথা প্রমাণিত হলো-

এক. বিত্‌র নফল নয়; বরং ওয়াজিব।

দুই. বিত্‌র ছুটে গেলে ক্বাযা দেওয়া ওয়াজিব। প্রকাশ থাকে যে, ক্বাযা দেওয়া হয় শুধু ফরয কিংবা ওয়াজিবের, নফলের ক্বাযা নেই। বিত্‌র ওয়াজিব মর্মে বহু হাদীস শরীফও বর্ণিত হয়েছে। আমি শুধু ১৪ (চৌদ্দ)টি উল্লেখ করলাম।

বিত্‌রের নামায তিন রাক্'আত

হাদীস নম্বর-১-৪

নাসাঈ শরীফ, ত্বাহাভী ও ত্বাবরানী 'সগীর'-এ, হাকিম তাঁর 'মুস্তাদরাক'-এ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, ইমাম হাকিম বলেছেন, এ হাদীস সহীহ (বিশুদ্ধ) বোখারী ও মুসলিমের শর্তানুসারে-

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِيْ اٰخِرِهِنَّ-

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিন রাক্'আত বিত্‌র পড়তেন। তিনি সর্বশেষ রাক্'আতেই সালাম ফেরাতেন।

হাদীস- ৫ ও ৬

ইমাম দারু কুত্বনী ও বায়হাক্বী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِتْرُ اللَّيْلِ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ-

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- রাতের বিত্‌র তিন রাক্'আত দিনের বিত্‌র মাগরিবের নামাযের মতো।

হাদীস-৭

ত্বাহাভী শরীফ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছে-

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ-

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিত্‌র পড়তেন তিন রাক্'আত।

হাদীস- ৮

নাসাঈ শরীফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছে যে, এক রাতে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে হাযির ছিলাম। তিনি রাতে জাগ্রত হলেন এবং ওযূ করলেন, (এর আগে) মিস্‌ওয়াক করলেন। আর এ আয়াত শরীফ তিলাওয়াত করছিলেন-

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الاية-

(ইন্না ফী খাল্‌ক্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি...আল্ আয়াত)

তারপর দু'রাক্'আত নফল পড়লেন। তারপর তিনি শুয়ে পড়লেন, তারপর ফিরে আসলেন, তারপর আবার শুয়ে পড়লেন এ পর্যন্ত যে,

حَتّٰى سَمِعْتُ نَفْخَهٗ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَلَسْتَاكَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَاكَ وَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَوْتَرَ بِثَلَاثٍ-

অর্থ: আমি হুযূর-ই আকরামের নাক মুবারকের শব্দ শুনেছি। তারপর তিনি উঠলেন এবং মিস্‌ওয়াক করলেন, তারপর দু'রাক্'আত নামায পড়লেন তারপর উঠলেন এবং মিসওয়াক সহকারে ওযূ করলেন আর দু'রাক্'আত নামায পড়লেন এবং তিন রাক্'আত বিত্‌র পড়লেন।

হাদীস-৯ -১৩

তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, ইবনে মাজাহ্ ও ইবনে আবী শায়বাহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ فِىْ رَكْعَةٍ-

অর্থ: তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিত্র নামাযে 'সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা-', 'ক্বুল ইয়া--- আইয়্যুহাল কা-ফিরূ-ন' এবং 'ক্বুল হুয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন- একেক রাক্'আতে একেক সূরা করে ।

হাদীস ১৪-১৮

তিরমিযী শরীফ, আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্, নাসাঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হযরত আবদুল আযীয ইবনে জুরাইজ হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আবযা থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ سَاَلْنَا عَائِشَةَ بِاَىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوْتِرُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ يَقْرَأُ فِى الْاُوْلَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ-

অর্থ: আমরা হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে জিজ্ঞাসা করলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামাযে কি পড়তেন । তিনি বললেন, প্রথম রাক্'আতে 'সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা, দ্বিতীয় রাক্'আতে 'ক্বুল ইয়া---আইয়্যুহাল কা-ফিরূ-ন', তৃতীয় রাক্'আতে 'ক্বুল হুয়াল্লা-হু আহাদ এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়তেন ।

হাদীস- ১৯

নাসাঈ শরীফে হযরত উবাই ইবনে ক্বা'ব থেকে বর্ণিত-

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِى الْوِتْرِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى وَفِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قُلْ يَاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ وَلَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِى اٰخِرِهِنَّ-

অর্থ: তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিত্রের প্রথম রাক্'আতে 'সাব্বিহিস্মা রাব্বিকাল আ'লা', দ্বিতীয় রাক্'আতে 'ক্বুল ইয়া--- আইয়্যুহাল কাফিরূ-ন' এবং তৃতীয় রাক্ব'আতে 'ক্বুল হুয়াল্লা-হু আহাদ' পড়তেন ।আর সালাম ফেরাতেন এ তিন রাক্'আতের শেষেই ।

হাদীস- ২০

ইবনে আবী শায়বাহ্ হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اَجْمَعَ الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى الْوِتْرِ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهُنَّ-

অর্থ: এর উপর সমস্ত মুসলমান এক মত যে, বিত্রের নামায তিন রাক্'আত । সালাম ফেরাবে না, কিন্তু একেবারে শেষভাগে ।

হাদীস- ২১

ইমাম ত্বাহাভী তাঁর ত্বাহাভী শরীফে হযরত খালিদ থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ سَاَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ عَلِمْنَا اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ هٰذَا وِتْرُ اللَّيْلِ وَهٰذَا وِتْرُ النَّهَارِ-

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হযরত আবুল আলিয়াকে বিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি । তদুত্তরে তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সাহাবী তো একথা জানি যে, বিতরের নামায মাগরিবের নামাযের মতো । এটা হলো রাতের বিত্র আর মাগরিব হলো দিনের বিত্র ।

এ একুশ হাদীস নমুনা স্বরূপ পেশ করা হলো । অধিকন্তু 'বিতরের নামায তিন রাক্'আত' মর্মে অনেক হাদীস শরীফ রয়েছে । যদি বিস্তারিতভাবে দেখতে চান, তবে 'ত্বাহাভী শরীফ' ও 'সহীহুল বিহারী'তে দেখুন! এখানে উদ্ধৃত হাদীস শরীফ গুলো থেকে একথা জানা গেলো যে, হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আমল শরীফ তিন রাক্'আত বিত্র ছিলো । সমস্ত সাহাবীরও এ আমল ছিলো । আর এ তিন রাক্'আত বিতরের উপর সমস্ত মুসলমানের ঐকমত্য রয়েছে ।

হানাফী মাযহাবের ইমামগণ বলেন, এ তিন রাক্'আত বিত্র এক সালামেই পড়া হবে । কিন্তু যেহেতু 'নাফসে আম্মারাহ্'র উপর নামায ভারী, সেহেতু মনের কুপ্রবৃত্তিসম্পন্নরা শুধু এক রাক্'আত বিত্র পড়ে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ে নিয়েছে । সম্মানিত পাঠকগণ উপারিউক্ত হাদীস শরীফগুলোতে দেখেছেন, হুযূর-ই আক্রাম বিত্রের প্রথম রাক্'আতে কোন্ সূরা পড়তেন, দ্বিতীয় রাক্'আতে কোন্ সূরা, আর তৃতীয় রাক্'আতে কোন্ সূরা পড়তেন । লা-মাযহাবী ওহাবীরা বলুন, যদি বিত্র এক রাক্'আত হতো, তবে এ সূরাগুলো কিভাবে পড়া যাবে?

যুক্তির দাবীও হচ্ছে- বিত্‌র এক রাক্‌'আত না হওয়া। কেননা, বিতরের নামায না ফরয, না নফল, বরং ওয়াজিব। এ নামায সম্পন্ন করা জরুরি; বর্জনকারী ফাসিক্ব, তবে সেটা অস্বীকার করলে কাফির হবে না, যা ওয়াজিবের বিধান। তাছাড়া প্রত্যেক ফরয নয় এমন ইবাদত ফরয ইবাদতের মতো হওয়া জরুরি; এটা হতে পারে না যে, ফরয নয় এমন কোন ইবাদতই একেবারে পৃথক ধরনের হবে, যার কোন উপমাই ফরয ইবাদতে থাকবে না। বস্তুত এটা শরীয়তের আম নিয়ম, যা যাকাত ও হজ্ব ইত্যাদিতে জারী রয়েছে। যদি বিত্‌র এক রাক্‌'আত হতো, তবে এমনটি হওয়া উচিত ছিলো যে, কোন ফরয নামাযও এক রাক্‌'আত বিশিষ্ট হতো; অথচ ফরয নামায এক রাক্‌'আত বিশিষ্ট নেই। শুধু ফরয কেন? কোন নফল, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌, সুন্নাতে যা-ইদাহ্‌ (গায়র মুআক্কাদাহ্‌)ও এক রাক্‌'আতবিশিষ্ট নেই। ফরয নামায হয়তো দু'রাক্‌'আত, যেমন ফজরের নামায, অথবা চার রাক্‌'আত বিশিষ্ট, যেমন যোহর, আসর ও এশার নামায, অথবা তিন রাক্‌'আত বিশিষ্ট, যেমন মাগরিব ও বিতরের নামায। এখন দেখুন, বিতরের নামায না চার রাক্‌'আত বিশিষ্ট হতে পারে, না দু'রাক্‌'আত বিশিষ্ট। কারণ চার ও দু'হচ্ছে জোড় সংখ্যা, বিজোড় সংখ্যা নয়। সুতরাং বিত্‌র অবশ্যই তিন রাক্‌'আত বিশিষ্ট হওয়া চাই। এক রাক্‌'আত নামায ইসলামী আইনের বিরোধী। এর উদাহরণ কোন নামাযেই পাওয়া যায় না। এক রাক্‌'আত অসম্পূর্ণও।

মোটকথা, এক রাক্‌'আত বিতর বিবেক বা যুক্তিরও বিরোধী, শরীয়তের উদ্ধৃতিগত দলীলাদিরও বিপরীত। উম্মতের ইজমা' এবং সাহাবা-ই কেরামের আমল, সর্বোপরি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ফরমান (বাণী শরীফ) সবই বিতর এক রাক্‌'আত হবার বিরোধী। (অতএব, একথা সুস্পষ্ট হলো যে, বিতরের নামায ওয়াজিব এবং তিন রাক্‌'আতবিশিষ্টও।)

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন

বিত্‌রের নামায সম্পর্কে এ পর্যন্ত গায়র মুক্বাল্লিদ-ওহাবীদের পক্ষ থেকে যত আপত্তি ও তাদের উপস্থাপিত প্রমাণ তাদের পক্ষ থেকে আমরা পেয়েছি, সেগুলো আমি এ নিবন্ধে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করছি ও সেগুলোর খণ্ডন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

আপত্তি -১

ইমাম ইবনে মাজাহ্‌ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্‌ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ الخ

অর্থঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক রাক'আত বিত্‌র পড়তেন, বিতরের পর দু'রাক্‌'আত নফল পড়তেন।

বুঝা গেলো যে, বিত্‌র এক রাক্‌'আত পড়া চাই। কারণ, হুযূর-ই আক্‌রাম এটাই পড়েছেন।

জবাব (খণ্ডন)

হে আপত্তিকারী, আপনি তো হাদীস শরীফের ভুল অনুবাদ করেছেন। এর ফলে এ হাদীস অন্য ওই সব হাদীসের বিপরীতার্থক হয়ে গেছে, যেগুলোতে বিত্‌রের নামায তিন রাক্‌'আত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে, হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী হয়ে গেলো। সুতরাং হাদীসের অনুবাদ এভাবে করা চাই, যাতে হাদীসগুলো পরস্পর এক হয়ে যায়। উপরোক্ত হাদীসে 'ب' অক্ষরটি استعانت (মাধ্যম) বুঝানোর জন্য। যেমন- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ (আমি ক্বলম দ্বারা লিখেছি)। কেননা, اَوْتَرَ-يُوْتِرُ 'বাবে ইফ্‌'আল' থেকে متعدى بنفسه ; সুতরাং উপরিউক্ত হাদীসের অর্থ এ দাঁড়ালো- "হুযূর-ই আকরাম তাহাজ্জুদের নামাযকে 'বিত্‌র' অর্থাৎ বিজোড় করেছেন- এক রাক'আত দ্বারা।" তা এভাবে যে, দু'রাক্‌'আতের সাথে এক রাক্‌'আত কে সংযুক্ত করেছেন। ফলে তাহাজ্জুদের নামাযের

রাক্'আতগুলোর সংখ্যা জোড় থেকে বিজোড় হয়ে গেছে। যেমন আট রাক্'আত তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন। এ সংখ্যা জোড় ছিলো। তারপর তিন রাক্'আত বিত্র পড়েছেন। সুতরাং বিতরের তৃতীয় রাক্'আতের কারণে সর্বমোট এগার রাক্'আত হলো, যা বিজোড় সংখ্যাই। এ সমস্ত নামাযকে বিজোড় করে দিলো বিতরের এ এক রাক্'আত, যা দু'-এর সাথে মিলেমিশে সম্পন্ন হয়েছে। এমতাবস্থায় এ হাদীস পুর্বোল্লিখিত সমস্ত হাদীসের অনুরূপ হয়ে গেলো।

আমি, গায়র মুক্বাল্লিদদের জিজ্ঞাসা করছি- যদি আপনাদের মতো অনুবাদ করা হয়, তাহলে আপনারা ওইসব হাদীসের কী জবাব দেবেন, যেগুলোতে সুস্পষ্ট ভাষায় (বিতরের নামায) তিন রাক্'আত বলে উল্লেখ করা হয়েছে? অথবা যেগুলোতে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর-ই আকরাম (বিতরের) প্রথম রাক্'আতে অমুক সূরা পড়তেন, দ্বিতীয় রাক্'আতে অমুক সূরা পড়তেন এবং তৃতীয় রাক্'আতে অমুক সূরা পড়তেন, যেগুলো এ নিবন্ধের 'প্রথম পরিচ্ছেদ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে?

আপত্তি- ২

মুসলিম শরীফে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত -

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُلَهٗ مَاقَدْ صَلّٰى-

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তাহাজ্জুদের নামায দু'দু' রাক্'আত। যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ভোর হয়ে যাবার আশঙ্কা করো, তবে এক রাক্'আত পড়ে নাও। এক রাক্'আত পূর্ববর্তী নামাযগুলোকে বিজোড় করে দেবে।

এ থেকে চারটা মাসআলা প্রতীয়মান হয়

১. তাহাজ্জুদের মধ্যে দু'দু' রাক্'আত নফল সম্পন্ন করা চাই।
২.তাহাজ্জুদের নামায রাতের বেলায় সম্পন্ন হওয়া চাই।
৩. বিতরের নামায তাহাজ্জুদের নামাযের পরে পড়া উত্তম।
৪. বিতরের নামায (এক) রাক্'আত।

হানাফীরা প্রথম তিনটি মাসআলা তো মানেন, কিন্তু চতুর্থটা মানতে অস্বীকার করেন। যদি এ হাদীস সহীহ হয়, তাহলে যেন তাঁরা চারটা মাসআলাই মান্য করেন। আর যদি বিশুদ্ধ (সহীহ) না হয়, তা হলে যেন চারটাই না মানেন।

খণ্ডন

গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা তো এ হাদীসের অনুবাদ করে এভাবে- 'যখন ভোর হয়ে যাবার আশঙ্কা করে, তখন এক রাক্'আত পৃথকভাবে একাকী পড়ে নেবে।' এ অনুবাদের কারণে এ হাদীস ওই সব হাদীসের বিপরীত হয়ে যায়, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আর উভয় প্রকারের হাদীস অনুসারে আমল করা অসম্ভব হয়ে গেছে। হানাফী মাযহাবের ইমামগণ ওই হাদীসের অনুবাদ এভাবে করেন- যখন ভোর হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দেয়, তখন দু'-এর সাথে আরো এক রাক্'আত মিলিত করে পড়ে নেবে, যেগুলোর কথা আলোচনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ رَكْعَةً وَّاحِدَةً-এর পর مَعَ الرَّكْعَتَيْنِ উহ্য রয়েছে। কেননা ইতোপূর্বে দু'দু' (مثنى مثنى)-এর উল্লেখ করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ (تعارض) থাকছে না। আর উভয় প্রকারের হাদীসগুলো অনুসারে আমল করাও সম্ভব হয়ে গেলো। যেমন মহান রব এরশাদ করেছেন-

وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مَائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعًا-

তরজমা: আসহাব-ই কাহফ তাদের গুহায় তিনশ' বছর অবস্থান করেছে। আরো নয় বছর বেশী। [সূরা কাহাফ: আয়াত-২৫, কান্যুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফে এ নয় বছর তিনশ' বছর থেকে আলাদা নয়, বরং সেগুলোর সাথেই রয়েছে। অর্থ এ হলো যে, 'তাঁরা তিনশ' নয় বছর অবস্থান করেছেন।' যেহেতু তিনশ' সৌরসাল ছিলো এবং তিনশ' নয় বছর ছিলো চান্দ্র, সেহেতু মহান রব এভাবে এরশাদ করেছেন।

অনুরূপ, বিতরের এ রাক্'আত ওই দু'দু' রাক্'আত থেকে আলাদা নয়, বরং ওইগুলো থেকে শেষ مثنى অর্থাৎ দু'-এর সাথে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু ওই দু'দু' রাক্'আত তাহাজ্জুদের এবং নফল, আর এ তিন রাক'আত বিতরের ছিলো এবং ওয়াজিবই ছিলো, সেহেতু এ পূর্ব ও পরবর্তী সকল সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী ও সৃষ্টিকুল সেরা ভাষা বিশারদ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এভাবে এরশাদ করেছেন।

ওহাবী জ্বী! বলুনতো হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধী করে রাখা উত্তম, নাকি হাদীস শরীফগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সবক'টি অনুসারে আমল করা উত্তম? আহা! যদি আপনারা কোন মুক্বাল্লিদ মুহাদ্দিস ওস্তাদের নিকট হাদীস শরীফ পড়তেন!

আপত্তি- ৩

মুসলিম শরীফে হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত,

اَلْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ

অর্থঃ বিতর শেষ রাতে এক রাক'আত।

এ' থেকে বুঝা গেলো যে, বিত্‌র শুধু এক রাক্'আত।

খণ্ডন

এর জবাবও দ্বিতীয় আপত্তির জবাব থেকে বুঝা গেছে। অর্থাৎ লা-মাযহাবী ওহাবীরা এর অর্থ বলে- 'বিতর এক রাক'আত মাত্র।' তাও একাকী সব রাক'আত থেকে পৃথক। এমতাবস্থায় এ হাদীস শরীফ অনেক হাদীসের বিরোধী হয়ে যায় এবং হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব হয়ে যায়। হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা এর অর্থ বলেন- "বিতর এক রাক'আত- দু'এর সাথে।" এ ব্যাখ্যা অপর ওইসব হাদীসে রয়েছে, যা আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

অথবা এ হাদীসে وتر শব্দটি اسم فاعل (কর্তৃবাচ্য) অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযকে বিজোড়কারী এক রাক'আত; এভাবে যে, এটা দু'-এর সাথে মিলে সমগ্র নামাযকে বিজোড় করে দেয়। নামাযী আট রাক'আত তাহাজ্জুদ পড়লেন, অতঃপর যখন বিতরের নিয়্যত বাধঁলেন, তখন যতক্ষণ পর্যন্ত দু'রাক'আত পড়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত নামাযটা জোড় রাক'আত বিশিষ্ট রইলো, আর যখন ওই দু' রাক'আতের সাথে আরো এক রাক'আত মিলালেন, তখন বিজোড় হয়ে গেলো। অর্থাৎ এগার রাক'আত হয়ে গেলো। এমতাবস্থায় এ হাদীস অন্য সব হাদীসের অনুরূপ হয়ে গেলো। হাদীসগুলোর মধ্যেকার পরস্পর বিরোধ দূর করা জরুরী।

আপত্তি- ৪

আবূ দাউদ ও নাসাঈ শরীফে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত -

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ فَاَوْتِرُوْا يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ-

অর্থঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- আল্লাহ্ বিজোড়, তিনি বিজোড়কে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরাও বিতর পড়তে থাকো, হে ক্বোরআনকে মান্যকারীগণ!

সুতরাং হে হানাফীরা বলুন, আল্লাহ্ এক না, তিন? তিনি যেহেতু এক, সেহেতু বিতরও এক রাক'আত হওয়া চাই, তিন রাক'আত নয়। হুযূর-ই আকরামও বিতরের নামাযকে মহান রব বিতর (বিজোড়) হওয়ার সাথে উপমা দিয়েছেন।

খণ্ডন

এ আপত্তির দু'টি জবাব দেয়া যায়: একটি তাদের কথা থেকে (الزامى) আর অপরটি দলীল- প্রমাণ ভিত্তিক (تحقيقى)।

প্রথমোক্ত জবাবঃ লা-মাযহাবী ওহাবীদের কথা মতো তো তাদের মাগরিবের ফরযও এক রাক'আত পড়তে হবে; তিন রাক'আত নয়। কারণ, মাগরিবের ফরয হচ্ছে দিনের বিতর, আর এ বিতর হচ্ছে রাতের বিতর। যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। আর আমি প্রথম পরিচ্ছেদে ওই হাদীস শরীফও পেশ করেছি। যদি ওহাবী লা-মাযহাবীরা বলেন যে, অন্য বর্ণনাদিতে এসেছে যে, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরয নামায তিন রাক'আত পড়তেন, তাহলে আমরাও বলবো যে, এও বর্ণনাদিতে এসেছে যে, হুযূর-ই আকরাম বিতরের নামাযও তিন রাক'আত পড়তেন। প্রথম পরিচ্ছেদ দেখুন!

আর শেষোক্ত (প্রমাণভিত্তিক) জবাব হচ্ছে- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর বিজোড় হবার মধ্যে উপমা দিয়েছেন, এক হবার মধ্যে দেননি। তিনও তো বিতর! একও বিতর (বিজোড়)। উপমার মধ্যে কিঞ্চিত সামঞ্জস্যই যথেষ্ট, সব দিকে এক ধরনের হওয়া জরুরী নয়। এ কারণে হুযূর-ই আকরাম وَتْرٌ বলেছেন وَاحِدٌ বলেননি। অর্থাৎ একথা বলেননি যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা এক, তিনি এক রাক'আতকে পছন্দ করেন।' দেখুন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

তরজমা: আল্লাহর নূরের উপমা তেমনি, যেমন একটা থাক (দ্বীপাধার), যাতে চেরাগ (প্রদীপ) রয়েছে। [২৪:৩৫]

এখানে মহান রব আপন নূরের উপমা চেরাগ (প্রদীপ)-এর সাথে দিয়েছেন- নিছক নূরানিয়াত (আলোকিত হওয়া)-এর মধ্যে। এখন যদি কেউ বলে, 'চেরাগে তো তেল-ফিতা থাকে, সুতরাং আল্লাহ তা'আলার নূরের মধ্যেও তেল-ফিতা থাকা চাই,' তাহলে তা হবে বোকামী (আহম্মকী)।

তাছাড়া, আমরা বলি, 'অমুক তো বাঘ'। তখন এর অর্থ হয় শুধু শক্তি ও সাহসের মাধ্যে বাঘের মতো, এ অর্থ নয় যে, তারও লেজ এবং পাঞ্জা রয়েছে।

আপত্তি-৫

বোখারী শরীফে হযরত ইবনে আবী মুলায়কাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

اَوْتَرَمُعَاوِيَةُ بَعْدَالْعِشَاءِ بِرَكْعَةٍوَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِعَبَّاسٍ فَاَتَى ابْنُعَبَّاسٍ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ دَعْهُفَاِنَّهُ قَدْ صَحِبَالنَّبِيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

অর্থ: সাইয়্যেদুনা আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এশার নামাযের পর এক রাক'আত বিত্‌র পড়েছেন। তখন তাঁর নিকট সাইয়্যেদুনা ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার ক্রীতদাস হাযির ছিলেন। তিনি হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট একথা উল্লেখ করেছেন। তখন তিনি বলেন, "তাঁকে কিছু বলোনা, তিনি রসূলে আকরামের সাহাবী।"

বুঝা গেলো যে, হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক রাক'আত বিতর পড়তেন। এটা সাহাবীর আমল।

খণ্ডন

এ হাদীস শরীফ তো হানাফী মাযহাবের মজবুত দলীল। তাও এমর্মে যে, বিতর তিন রাক'আত। কেননা, যখন আমীর মু'আভিয়া এক রাক'আত বিতর পড়েছেন, তখন সাইয়্যেদুনা ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার ক্রীতদাস হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন, যার অভিযোগ তিনি হযরত ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে করেছিলেন। মানুষ আশ্চর্য ও হতভম্ব ওই কাজের উপর হয়, যা বিরল আর আজব ধরনের হয়। এথেকে বুঝা যায় যে,

অন্য কোন সাহাবী এক রাক'আত বিতর পড়তেন না। অন্যথায় তিনি না আশ্চর্যান্বিত হতেন, না অভিযোগ করতেন।

অবশ্য হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা আপত্তি করতে নিষেধ করেছেন। কেননা আমীর মু'আভিয়া মুজতাহিদ-ফক্বীহ সাহাবী ছিলেন। ফক্বীহ-মুজাহিদের ভুলের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি করা বৈধ নয়। এর উল্লেখ এ বোখারী শরীফের অন্য বর্ণনায় এভাবে আছে-

عَنْ اِبْنِعَبَّاسٍ قِيْلَ لَهُ هَلْ لَكَ فِىْ اَمِيْرِالْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ مَا اَوْتَرَ اِلَّابِوَاحِدَةٍ قَالَ اَصَابَ اِنَّهُفَقِيْهٌ-

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাসের নিকট আরয করা হলো- আপনার কি হযরত আমীর মু'আভিয়ার বিপক্ষে কোন আপত্তি আছে? তিনি বিতরের নামায এক রাক'আত পড়েন। তিনি বললেন, 'তিনি ঠিক কাজই করেন, তিনি মুজতাহিদ, আলিম ও ফক্বীহ।'

এ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেলো যে, বিতরের নামায সমস্ত সাহাবী এবং খোদ সাইয়্যেদুনা ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তিন রাক'আত পড়তেন। এ কারণেই হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক রাক'আত পড়লে অভিযোগ করা হয়েছে, কিন্তু যেহেতু সাইয়্যেদুনা আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একাধারে সাহাবী, আলিম, মুজতাহিদ, আর মুজতাহিদ-ফক্বীহর ভুল-ত্রুটিও সঠিক হয়, সেহেতু তিনি বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি করো না। বস্তুত এ হাদীস তো হানাফীদের পক্ষের দলীল, লা-মাযহাবীরা ধোঁকা খেয়ে সেটাকে তাদের পক্ষে দলীল মনে করে বসেছে, হে লা-মাযহাবীরা, এটাতো আপনাদের বিপক্ষেই।

আপত্তি - ৬

হানাফীদের আজব অবস্থা যে, আমরা এক রাক'আত বিতর পড়লে আপত্তি করেন। হযরত আমীর মু'আভিয়া এক রাক'আত বিতর পড়েছেন, অথচ তাঁর বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করেন না। আমরা রফ'ই ইয়াদায়ন করি, উচ্চ আওয়াজে 'আ-মী-ন' বলি, একারণে আমাদের সমালোচনা করেন। ইমাম শাফে'ঈ আমাদের মতো নামায পড়তেন; অথচ তাঁকে না ওহাবী বলা হয়, না তাঁর বিপক্ষে কোন আপত্তি করেন। এ দ্বিমুখী পলিসি কেমন? আর দৃষ্টিভঙ্গির এ পার্থক্য কেন? (আম ওহাবী)

খণ্ডন

জ্বী-হাঁ, একেবারে সঠিক কথা। আলিম, ফক্বীহ্, মুজতাহিদ, ফক্বীহ ভুল করলেও সাওয়াব পান, কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি যখন দেখে ও জেনেশুনে আলিমদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ভুল করে তখন সে তজ্জন্য শাস্তি পায়। সে এর উপযোগী। যদি সিভিল সার্জন সনদপ্রাপ্ত সরকারী ডাক্তার কোন রোগীকে ভুল ওষুধ দেন, তবে তাঁর জন্য শাস্তি নেই। কিন্তু যদি কোন মূর্খ লোক নিছক নিজ খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কাউকে ভুল ওষুধ সেবন করায়, তাহলে সে শরীয়ত ও দেশীয় আইনে অপরাধী। যেমন ভ্রাম্যমান আদালতে ভুয়া ডাক্তার চিহ্নিত হলে তাকে জরিমানা করা হয় ও সাজা দেয়া হয়। জজ বা হাকিম কোন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার রাখেন, যদিও বিচার কার্য কখনো ভুল হতে পারে; কিন্তু যদি সাধারণ লোক কানুনকে হাতে নিয়েই মানুষকে শাস্তি দিতে থাকে, তাহলে সে অপরাধী ও শাস্তির উপযোগী, জেলের উপযুক্ত।

দেখুন, হযরত আলী ও হযরত মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে, যাতে নিশ্চিতভাবে হযরত আলী সঠিক পথে ছিলেন। আর হযরত আমীর মু'আভিয়ার ইজতিহাদী ভুল ছিলো, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই গুনাহগার ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে কাউকে যদি কেউ মন্দ বলে, তবে ওই মন্দ মন্তব্যকারী বে-ঈমান হয়ে যাবে। ক্বোরআন-ই করীম হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান আলায়হিমাস্ সালাম-এর এক মুকাদ্দমায় পরস্পর বিরোধী ফয়সালার উল্লেখ করেছে-

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ
شَاهِدِيْنَ-فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا ز

তরজমা:৭৮. এবং দাঊদ ও সুলায়মানকে স্মরণ করুন, যখন তারা শস্য ক্ষেত্রের এক বিবাদ মীমাংসা করছিলো, যখন রাতের বেলায় তাতে কিছু লোকের মেষগুলো প্রবেশ করেছিলো, এবং আমি তাদের বিচারের সময় উপস্থিত ছিলাম। ৭৯. আমি ওই বিষয় সুলায়মানকে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং উভয়কে রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছি; [সূরা আম্বিয়া: আয়াত- ৭৮-৭৯, কানযুল ঈমান]

দেখুন, ক্ষেতের এ মুকাদ্দমায় হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান আলায়হিমাস্ সালাম উভয় বুযুর্গ ভিন্ন ভিন্ন ফয়সালা দিয়েছেন। হযরত সুলায়মানের ফয়সালা সঠিক ছিলো, যার সমর্থন খোদ্ মহান রব করেছেন। হযরত দাঊদ আলায়হিস্

সালাম-এর ফয়সালায় ইজতিহাদগত ব্যতিক্রম ছিলো। কিন্তু এ জন্য কি তাঁকে তিরস্কার করা হয়েছে? মোটেই না। কেন? কারণ, তিনি 'মুজতাহিদ-ই মুত্বলাক্ব' (মৌলিক ও নিঃশর্ত মুজতাহিদ) ছিলেন। আর মুজতাহিদের ভুলের জন্য তিরস্কার নেই।

হে লা-মাযহাবী ওহাবীরা, যদি আপনারা রফ'ই ইয়াদায়ন ও উচ্চ স্বরে আ-মী-ন বলা শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী হয়ে সম্পন্ন করেন, তবে আপনাদেরকে ওহাবী বলা যাবে না, না আপনাদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করা হবে। কিন্তু আপনারা জ্ঞানশূন্য হয়ে কানুন নিজের হাতে নিয়ে নিচ্ছেন। আর নিজ থেকে, নিজ দায়িত্বে এ সব কাজ করে দ্বীনে ফিৎনা ছড়াচ্ছেন। এজন্যই আজ আপনাদের এ দুর্গতি!

আপত্তি-৭

তিন রাক'আত বিত্রের বর্ণনা সম্বলিত যত হাদীস রয়েছে, সবই দুর্বল। দুর্বল হাদীস দলীল হতে পারে না।

খণ্ডন

হ্যাঁ, দুর্বলও এজন্য বলেছেন যে, ওইগুলো আপনাদের বিপরীত! অথবা এ জন্য যে, সমস্ত হাদীস চৌদ্দশতাধিক বছরের পুরানা হয়ে গেছে। মানুষতো ষাট বছরে বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে যায়, কাজেই চৌদ্দশতাধিক বছরের হাদীস শরীফগুলো দুর্বল কেন হবে না? এই হলো আপনাদের দুর্বল বলার কারণ। আপনারা এভাবে দুর্বল দুর্বল বলতে বলতে সরলপ্রাণ মানুষকে হাদীসের অস্বীকারকারী করে ফেলেছেন। আপনাদের এ আপত্তির দাঁতভাঙ্গা জবাব আমি এ কিতাবে অনেকবার দিয়েছি। (তা হচ্ছে- এটা আপনাদের একটা বদ-অভ্যাস। কারণ কোন হাদীসকে দুর্বল বলতে হলে নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য কারণ দর্শাতে হয়। নিজের ইচ্ছার বিপরীত হলে মনগড়াভাবে দুর্বল বলে দিলে কোন হাদীস দুর্বল হয় না। তদুপরি, অন্য হাদীসের সমর্থন থাকলে দুর্বল হাদীসও সবল হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাক হিদায়ত নসীব করুন!! আ-মী-ন।)

---o---

অষ্টম অধ্যায়

[ক্বুনূত-ই না-যিলাহ্ পড়া নিষিদ্ধ]

‘ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্’ পড়া নিষিদ্ধ

বিত্‌রের নামাযের তৃতীয় রাক্‌‘আতে রুকূ’র পূর্বক্ষণে সর্বদা ‘দো‘আ-ই ক্বুনূত’ পড়া সুন্নাত; কিন্তু ফজরের ফরয নামাযের দ্বিতীয় রাক‘আতে রুকূ’র পর ‘ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্’ পড়া ঘজন্য মাকরূহ এবং সুন্নাতের পরিপন্থী; কিন্তু ‘গায়র মুকাল্লিদ’ (লা-মাযহাবী ওহাবী তথা আহলে হাদীস নামধারীগণ)-এর আমল (কর্ম)-এর বিপরীত। তারা বিত্‌রের নামাযে দো‘আ-ই ক্বুনূত সব সময় পড়ে না, বরং রমযান মাসের কোন কোন তারিখে পড়ে থাকে; তবে ফজরের নামাযে সব সময় ‘ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্’ পড়ে থাকে- দ্বিতীয় রাক‘আতের রুকূ’র পরক্ষণে। কোন কোন দেওবন্দী-ওহাবীও, যারা মূলত ও নেপথ্যে গায়র মুক্বাল্লিদ, বাহানা বানিয়ে ফজরের নামাযে ‘ক্বুনূতে নাযিলাহ্’ পড়তে আরম্ভ করেছে। এ কারণে এ অধ্যায়েও বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়াস পেলাম। এ মাসআলা দু’টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে- প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলার প্রমাণাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর উপর প্রশ্নাবলী উল্লেখ করে সেগুলোর সপ্রমাণ জবাব দেওয়া হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

‘ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্’র অর্থঃ এর অর্থ হচ্ছে বিপদাপদ ও বালা-মুসীবতের সময়কার দো‘আ। হুযূর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম একবার এক বিশেষ মুসীবতের সময় কয়েকদিন এ ‘দো‘আ-ই ক্বুনূত’ ফজরের দ্বিতীয় রাক‘আতে রুকূ’র পর পড়েছিলেন। তারপর ক্বোরআন-ই করীমের আয়াত নাযিল হলে এ দো‘আ ‘মানসূখ’ বা রহিত হয়ে গেছে। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা ওয়াসাল্লাম আর কখনো এটা পড়েননি। প্রমাণাদি নিম্নরূপ:

হাদীস নম্বর- ১-২

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি হযরত ‘আসিম আহ্‌ওয়ালের এক প্রশ্নের জবাবে এরশাদ করেন-

اِنَّمَا قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا اِنَّهُ كَانَ بَعَثَ اُنَاسًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ سَبْعُوْنَ رَجُلًا فَاُصِيْبُوْا فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ-

অর্থ: হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' শুধু এক মাস পড়েছিলেন। তিনি সত্তরজন সাহাবীকে, যাঁরা 'ক্বারী' ছিলেন, এক জায়গায় 'দ্বীন প্রচার'-এর জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁদেরকে শহীদ করে ফেলা হয়। অতঃপর হুযূর-ই আকরাম এক মাস যাবৎ রুকূ'র পর ওইসব কাফিরের বিরুদ্ধে দো'আ করে 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়েছিলেন।

এক মাসের শর্তারোপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর-ই আকরামের এ কর্ম শরীফ সর্বদা ছিলো না। ওযরের কারণে শুধু এক মাস ছিলো, অতঃপর মানসূখ হয়ে গেছে।

হাদীস- ৩

'ত্বাহাভী শরীফ'-এ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَ ذَكْوَانَ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوْتَ-

অর্থ: হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুধু এক মাস যাবৎ 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়েছেন- রি'ল ও যাক্ওয়ান গোত্র দু'টির বিপক্ষে দো'আ করেছেন। যখন হুযূর-ই আকরাম তাদের উপর জয়ী হলেন, তখন তা ('ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্') ছেড়ে দিয়েছেন। এ হাদীস শরীফে 'ছেড়ে দেওয়া'র কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস-৪-৭

সর্বইমাম আবূ ইয়া'লা মূসেলী, আবূ বকর বায্যার ও ত্বাবরানী 'কাবীর'-এ, আর ইমাম বায়হাক্বী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ شَهْرًا- فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهِمْ تَرَكَ الْقُنُوْتَ وَقَالَ الْبَزَّارُ فِىْ رِوَايَتِهِ لَمْ يَقْنُتِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا لَمْ يُقْنُتْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ-

অর্থ: তিনি বলেন, হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুধু এক মাস 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়েছেন, যাতে তিনি 'উসাইয়্যাহ্' ও 'যাক্ওয়ান' গোত্র দু'টির বিপক্ষে দো'আ করেছেন। যখন তাদের উপর বিজয়ী হয়ে গিয়েছিলেন, তখন থেকে তা ছেড়ে দিয়েছেন। ইমাম বায্যার তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, হুযূর-ই আকরাম শুধু এক মাস যাবৎ 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়েছেন। এরপূর্বে কিংবা পরে আর কখনো তা পড়েননি।

হাদীস-৮-৯

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম নাসাঈ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ-

অর্থ: নিঃসন্দেহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুধু এক মাস যাবৎ 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়েছেন, তারপর ছেড়ে দিয়েছেন।

হাদীস-১০-১২

সর্ব ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ হযরত আবূ মালিক আশ্জা'ঈর সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ يَا اَبَتِ اِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِىٍّ هٰهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ كَانُوْا يَقْنُتُوْنَ قَالَ يَابُنَىَّ مُحْدَثٌ-

অর্থ: তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেছি- হে আববাজান, আপনি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর পেছনে কূফায় প্রায় পাঁচ বছর নামায পড়েছেন। এসব হযরত কি 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়েতেন? তিনি বলেছেন, "হে আমার স্নেহের পুত্র! এটা বিদ্'আত।" অর্থাৎ সব সময় 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়া সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং বিদ্'আত-ই সাইয়্যেআহ্ (মন্দ ও বর্জনীয় বিদ্'আত)।

হাদীস-১৩-১৪

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে এক দীর্ঘ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন, সেটার শেষভাগের শব্দগুলো নিম্নরূপ-

وَكَانَ يَقُوْلُ فِىْ بَعْضِ صَلٰوتِهٖ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِاَحْيَاءٍ مِّنَ الْعَرَبِ حَتّٰى اَنْزَلَ اللهُ ((لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ))

অর্থঃ হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন কোন কোন নামাযে বলছিলেন- ''হে খোদা, আরবের অমুক অমুক গোত্রের অমুক অমুক লোকের উপর লা'নত (অভিসম্পাত) করো! এ পর্যন্ত যে, এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে- ''লায়সা লাকা মিনাল আমরি শায়উন... আল্ আয়াত।''

এ হাদীস শরীফ থেকে কতিপয় মাসআলা প্রতীয়মান হয়-

এক. 'দো'আ-ই কুনূত-ই নাযিলাহ্' ফজরের নামাযে পড়া 'মানসূখ' (রহিত) হয়ে গেছে।

দুই. হাদীস শরীফ ক্বোরআনের আয়াত দ্বারা মানসূখ হতে পারে। অর্থাৎ কুনূত-ই নাযিলাহ্ পড়া হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর সেটা মানসুখ হবার বিধান ক্বোরআন-ই করীম দ্বারা প্রমাণিত হয়।

তিন. দ্বীনের শত্রুদের ওপর বদ-দো'আ কিংবা লা'নত করা জায়েয। যেসব লোকের বিপক্ষে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালাম দো'আ করেছেন, তারা হুযূর-ই আকরামের যাত বা সত্তা মুবারকের শত্রু ছিলো না; বরং দ্বীন ইসলামের শত্রু ছিলো। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (জিহাদ) করা যেতো, তখন বদ-দো'আও করা যেতে পারে। অবশ্য, হুযূর-ই আকরাম আপন যাত বা সত্তার শত্রুদের ক্ষমাও করে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ নেই।

হাদীস -১৫

হাফেয ত্বালহা ইবনে মুহাম্মদ মুহাদ্দিস তাঁর 'মুসনাদ'-এ ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সনদে (সূত্র) বর্ণনা করেছেন-

عَنِ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ عَنْ اَبَّانَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ لَمْ يَقْنُتْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْفَجْرِ اِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا لِاَنَّهُ حَارَبَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَنَتَ يَدْعُوْ عَلَيْهِمْ-

অর্থঃ ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা হযরত আববান ইবনে আইয়্যাশ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে, তিনি হযরত 'আলক্বামাহ্ থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হুযূর-ই আকরাম ফজরের নামাযে 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' কখনো পড়েননি এক মাস

ব্যতীত। কেননা, হুযূর-ই আকরাম তখন মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন তাদের বিরুদ্ধে এক মাস যাবৎ (তাদের শাস্তির জন্য) দো'আ করেছিলেন।

হাদীস-১৬-১৭

হাফেয ইবনে খুসরু আপন 'মুসনাদ'-এ এবং ক্বাযী ওমর ইবনে হাসান আশনানী হযরত ইমাম আবূ হানীফা থেকে, তিনি হযরত হাম্মাদ থেকে, তিনি হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ مَا قَنَتَ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ وَلَاعُثْمَانُ وَلَاعَلِىٌّ حَتّٰى حَارَبَ اَهْلَ الشَّامِ فَكَانَ يَقْنُتُ

অর্থঃ না হযরত আবূ বকর, না হযরত ওমর, না হযরত ওসমান, না হযরত আলী মুরতাদ্বা কুনূত-ই নাযিলাহ্ পড়েছেন- এ পর্যন্ত যে, হযরত আলী সিরিয়া (শামদেশ) বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তখন কুনুত-ই নাযিলাহ্ পড়ছিলেন।

হাদীস -১৮

আবূ মুহাম্মদ বোখারী ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা থেকে, তিনি আত্বিয়্যাহ্ 'আঊফী থেকে, তিনি হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ لَمْ يَقْنُتْ اِلَّا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يَّدْعُوْ عَلٰى عُصَيَّةَ وَذَكْوَانَ ثُمَّ لَمْ يَقْنُتْ اِلٰى اَنْ مَاتَ-

অর্থঃ তিনি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, হুযূর-ই আকরাম চল্লিশ দিন ব্যতীত কুনূত-ই নাযিলাহ্ পড়েননি। এ চল্লিশ দিনে তিনি 'উসাইয়্যাহ্ ও যাক্ওয়ানের বিপক্ষে দো'আ করেছেন। তারপর ওফাত পর্যন্ত আর কখনো পড়েননি।

এ আঠার হাদীস নমুনাস্বরূপ পেশ করা হলো। অন্যথায় কুনূত-ই নাযিলাহ্ না পড়া সম্পর্কে অনেক হাদীস শরীফ মওজুদ রয়েছে। যদি আগ্রহ থাকে, তবে 'ত্বাহাভী শরীফ' ও 'সহীহুল বিহারী' ইত্যাদি পাঠ-পর্যালোচনা করে নিন।

যুক্তির নিরীখে

যুক্তি বা বিবেকের দাবী হচ্ছে 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' নামাযে না পড়া। তা-ও নিম্নলিখিত কয়েকটা কারণে:

এক. পাঁচ ওয়াক্বত ফরয নামাযের মধ্যে প্রত্যেক ওয়াক্বতের নামাযের রাক্'আতগুলোর সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- ফজরের দু'ই রাক্'আত, যোহর, আসর ও এশার চার রাক্'আত, মাগরিবের তিন রাক্'আত। কিন্তু কোন ফরয নামায 'আরকান' (অভ্যন্তরীণ ফরযগুলো) ও দো'আ ইত্যাদিতে পরস্পর ভিন্ন নয়; সব ক'টির আরকান ও দো'আগুলো ইত্যাদি অভিন্ন, এক ধরনের। সুতরাং যখন চার ওয়াক্বতের নামাযগুলোতে 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' নেই, তখন ফজরের ফরয নামাযেও সেটা না হওয়া চাই।

দুই. জামা'আত সহকারে সম্পন্ন করার ফরয নামাযগুলোতে দো'আসমূহ ও যিক্র সংক্ষিপ্ত হয়, নফল নামাযগুলোতে এক্ষেত্রে আযাদী রয়েছে। দেখুন, রুকু' থেকে ওঠার সময় একাকী নামায সম্পন্নকারী 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্'ও বলে থাকে এবং 'রাববানা লাকাল হামদু'ও বলে। কিন্তু যখন সে জমা'আত সহকারে নামায সম্পন্ন করে, তখন ইমাম 'রাব্বানা লাকাল হামদু' বলেন না, শুধু সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্' বলেন। আর মুক্বতাদী এর বিপরীত। অর্থাৎ সে 'রাববানা লাকাল হাম্দ' তো বলে, কিন্তু 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্' বলে না। যখন এসব নামাযে এ পরিমাণ সংক্ষিপ্ত করা কাঙ্ক্ষিত হয়, তখন ফজরের রুকূ'র পরে এত দীর্ঘ, অর্থাৎ 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়বে কেন? মোটকথা, এটা শরীয়তের উদ্দেশ্যের একেবারে পরিপন্থী।

তিন. নামায, বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্বতের নামাযের ফরযগুলোর আরকান (অভ্যন্তরীণ ফরযসমূহ) একটা অপরটার সাথে মিলিত হওয়া চাই। যেমন- ক্বিয়ামের পর সাথে সাথে সাজদাহ্, সাজদার পর তাৎক্ষণিকভাবে ক্বিয়াম অথবা 'জলসাহ্' (বৈঠক) হওয়া চাই; এগুলোর মধ্যখানে বিরতি দেওয়া শরীয়তের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। ফজরের রুকূ'র পর যে 'ক্বাওমাহ্' (দাঁড়ানো) রয়েছে তাতে শুধু 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্'র পরিমাণ দাঁড়ানো চাই। যদি তাতে 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়া হয়, তাহলে সাজদায় যেতে, যা নামাযের সর্বোচ্চ রুকন, দেরী হয়ে যাবে। ফরয আদায় করতে দেরী হলে, যদি ভুল বশত: হয় তবে সাজদাহ্-ই সাহ্ভ অপরিহার্য হয়, আর যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তবে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। সুতরাং নামাযের অভ্যন্তরে 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' না পড়া চাই, যাতে নামাযের 'আরকান' পরস্পর মিলিতভাবে সম্পন্ন করা যায়।

ফিক্বহী মাসআলা

হানাফী মাযহাব মতে, যুদ্ধ অথবা ব্যাপক বিপদাপদের সময় উত্তম হচ্ছে 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' নামাযের বাইরে পড়বে, যাতে সাহাবা-ই কেরামের মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকা যায়। কেননা, কোন কোন সাহাবী বিপদাপদ কালে ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলাকালে ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্ পড়তেন, আর কেউ কেউ সেটাকে একেবারে 'মানসূখ' (রহিত) বলে মনে করতেন, কিন্তু যদি ফজরের ফরযগুলোর দ্বিতীয় রাক্'আতে রুকূ'র পর 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়ে, তবে যদিও উত্তম কাজটুকু করেনি, কিন্তু জায়েয কাজটি করেছে। প্রয়োজনের তাগিদে নিষিদ্ধ কাজও মুবাহ্ হয়ে যায়; কিন্তু নিম্নস্বরে পড়বে, উচ্চস্বরে পড়বে না। ফজর ব্যতীত অন্য কোন নামাযে পড়লে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা, সে বিনা কারণে স্বেচ্ছায় সাজদায় যেতে বিলম্ব করেছে। ফরযে বিলম্ব করলে তা নামায ভঙ্গ করে দেয়।

একটি সংশয়

কেউ কেউ বলে, ব্যাপক আপদকালে অথবা যুদ্ধকালীন সময়ে প্রত্যেক 'জাহ্রী নামায' (যেসব নামাযের উচ্চস্বরে ক্বিরআত পড়া হয়), যেমন- ফজর, মাগরিব, এশার নামাযে 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়া চাই। কেননা 'শরহে নিক্বায়াহ্' ও 'গায়াতুল আওত্বার'-এ আছে-

قَنَتَ الْاِمَامُ فِى صَلٰوةِالْفَجْرِ وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِىِّ وَاَحْمَدَ

অর্থ: এসব সময়ে ইমাম 'জাহ্রী নামাযগুলো'তে ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্ পড়বেন। এটা ইমাম সওরী ও ইমাম আহমদের অভিমত। পাঞ্জাবে অনেক দিন যাবৎ কিছু সংখ্যক অজ্ঞ ইমাম এ দলীলের অজুহাতে মাগরিব, এশা ও ফজরের নামাযে 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়ে মুসলমানদের নামায বরবাদ করেছে বলে জানা যায়।

সংশয়ের অপেনোদন

'শরহে নিক্বায়াহ্' ও 'গায়াতুল আওত্বার'-এ এখানে (কাতিব) ভুল বশত; ফজর (فجر) শব্দের স্থলে জাহর (جهر) লিখে ফেলেছে। অর্থাৎ- 'ফা' (ف)-কে জীম (ج) করে ফেলেছে। সুতরাং 'আশবাহ্ ওয়ান্ নাযা-ইর'-এ এখানে 'সালাত-ই জাহর'-এর স্থলে 'সালাত-ই ফজর' এবং 'তাহত্বাভী 'আলাদ্ দুররিল মুখতার'-এ আর আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী 'মিনহাতুল খালিক্ব 'আলাল বাহ্রির রাইক্ব'-এ বলেছেন- وَلَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنِ الْفَجْرِ অর্থাৎ হয়তো 'জাহ্র' শব্দে 'ফজর' শব্দটি বিকৃত হয়ে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখন দেখুন 'ত্বাহাভী'র ইবারত-

وَالَّذِىْ يَظْهَرُ لِىْ قَوْلُهٗ فِى الْبَحْرِ وَاِنْ نَزَلَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ نَازِلَةٌ قَنَتَ الْاِمَامُ فِىْ صَلٰوةِ الْجَهْرِ تَحْرِيْفٌ مِّنَ النَّاسِخِ وَصَوَابُهُ الْفَجْرُ

অর্থাৎ 'বাহরুর রাইক্ব' প্রেণেতা মহোদয় যা বলেছেন তা এ যে, যদি মুসলমানদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তবে ইমাম 'জাহরী নামায'-এ 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়বে,' আমার মনে হয় এটা লিপিকার (কাতিব)-এর ভুল। সঠিক ও শুদ্ধ কথা হচ্ছে এখানে 'ফজর' (فجر)।

আমি অত্যন্ত সংক্ষেপে এ সম্পর্কে কিছুটা লিখে দিলাম। যদি 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' সম্পর্কে আরো বেশী বিশ্লেষণ জানতে চান, তবে আমার 'ফাতাওয়া-ই ন'ঈমিয়াহ্' দেখতে পারেন। যেহেতু দেওবন্দী ওহাবীরা কোথাও বর্তমানে 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়তে আরম্ভ করেছে, সেহেতু এজন্য উক্ত কিতাবে খুব উত্তমরূপে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ সহকারে এ মাসআলা আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর জবাব

গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের দিক থেকে এ পর্যন্ত যে সব আপত্তি আমাদের নিকট পৌঁছেছে, ওইগুলোর জবাব আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ও প্রমাণাদি সহকারে দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছিঃ

আপত্তি-১

আপনারা 'ক্বুনূত-ই নাযিলাহ্' না পড়ার পক্ষে যতগুলো হাদীস পেশ করেছেন সেগুলোর সব ক'টিই দ্ব'ঈফ (দুর্বল)। দুর্বল হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করা যায় না। [ওহাবীদের পুরানা সবক্ব]

জবাব

এর সপ্রমাণ জবাব আমরা অনেকবার দিয়েছি। এখন একটা মীমাংসাকারী জবাব দিচ্ছি। তা হচ্ছে- আমাদের দলীল এ রেওয়াতগুলো নয়। আমাদের আসল দলীল তো ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অভিমত। আমরা এ আয়াতগুলো ও হাদীসমূহ মাসআলাগুলোর সমর্থনের জন্য পেশ করে থাকি। আয়াতগুলো ও হাদীসসমূহ হচ্ছে ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রমাণাদি। তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর সনদও এগুলো নয়, তাঁর সনদ তো অতি সংক্ষিপ্ত এবং অতি খাঁটি টাকশালে যাচাইকৃত। ওইগুলোতে দু'/তিনজন রাভী (বর্ণনাকারী) হয়ে থাকেন। তাঁরাও হন অতিমাত্রায় নির্ভরযোগ্য।

এ অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আপনারা হাদীস নম্বর ১৮ দেখেছেন। অর্থাৎ ইমাম-ই আ'যমের সনদে শুধু দু'জন রাভী (বর্ণনাকারী) রয়েছেন- হযরত আত্বিয়্যাহ্ আওফী ও হযরত আবূ সা'ঈদ খুদ্রী। আর হাদীস নম্বর ১৫ তে শুধু চারজন রাভী (বর্ণনাকারী) আছেন- সর্ব হযরত আবান ইবনে 'আইয়্যাশ, ইব্রাহীম নাখ'ঈ, আলক্বামাহ্ এবং ইবনে মাস'ঊদ। বলুন তো তাঁদের মধ্যে কেউ দ্ব'ঈফ (দুর্বল) আছেন কিনা! যেহেতু ইমাম-ই আ'যমের যমানা তিন শ্রেষ্ঠ যুগের একটি, তাঁর বর্ণিত হাদীসগুলোর সনদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক রাভী (বর্ণনাকারী)

রয়েছেন, সেহেতু সেখানে দ্ব'ঈফ (দুর্বল) কেউ থাকার প্রশ্নই আসেনা। 'দুর্বলতা' ও 'তাদলীস' (সাহাবী বাদ দিয়ে বর্ণনা করা) ইত্যাদি রোগব্যাধি পরবর্তীতে লেগেছে। অবশ্য আপনাদের উপস্থাপিত কোন বর্ণনা দুর্বল সাব্যস্ত হওয়াতো আপনাদের জন্য ক্বিয়ামতই; কারণ এ রেওয়াতগুলোই আপনাদের দলীল, যেগুলোর উপর আপনাদের মাযহাব (!) প্রতিষ্ঠিত। আর আপনাদের যমানা হুযূর-ই আক্রামের যমানা শরীফ থেকে বহু দূরে। তদুপরি আপনাদের উপস্থাপিত রেওয়াতগুলোর সনদও অনেক দীর্ঘ, যেগুলোর মধ্যে সব ধরনের রোগব্যাধি রয়েছে। সুতরাং 'দুর্বল' 'দুর্বল' বলে কোন গায়র-মুক্বাল্লিদকে ভয় দেখান, হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা এটাকে কোনরূপ ভয় করে না। অন্যান্য জবাব তেমনি, যেমনটি আমি পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে দিয়েছি। আমি প্রত্যেক হাদীসের, আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে এত বেশী সনদ বর্ণনা করেছি, যেগুলোর কারণে ওইগুলো 'হাসান' পর্যায়ের হয়ে গেছে, দুর্বলতা থাকলেও তা দূরীভূত হয়ে গেছে।

আপত্তি-২

ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, কেউ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করলো, হুযূর-ই আক্রাম কখন কুনূত পড়েছেন? তখন তিনি জবাবে বলেছেন-

قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَالرُّكُوْعِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَبْلَ الرُّكُوْعِ وَبَعْدَهٗ

অর্থঃ হুযূর-ই আক্রাম রুকূ'র পর কুনূত পড়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, রুকূ'র পূর্বেও কুনূত পড়েছেন এবং পরেও।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়া সুন্নাত-ই রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

জবাব

এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীসে 'কুনূত-ই নাযিলাহ'র উল্লেখ নেই। আর মিশকাত প্রণেতা এ হাদীস 'দো'আ-ই কুনূত'-এর অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, যা বিতর নামাযগুলোতে পড়া হয়। এ থেকে বুঝা গেলো যে, এখানে 'দো'আ-ই কুনূত'-এর কথা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হে লা-মাযহাবীরা! আপনাদের দলীল গ্রহণই ভুল।

দুই. যদি তা দ্বারা 'কুনূত-ই নাযিলাহ্'ই বুঝায়, তবে এখানে এ কথার উল্লেখ নেই যে, হুযূর-ই আক্রাম তা সব সময় পড়েছেন। আর আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে একথা প্রমাণ করেছি যে, হুযূর-ই আক্রাম 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' শুধু একমাস কিংবা সোয়া এক মাস পড়েছেন; তারপর সব সময়ের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীস মান্সূখ। আর মান্সূখ হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা বড় অপরাধ।

তিন. যদি এ হাদীসে 'কুনূত-ই নাযিলাহ্'ই বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তাতে এ মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়নি যে, রুকূ'র পূর্বে পড়েছেন, না পরে পড়েছেন। এতদ্সত্ত্বেও আপনারা 'রুকূ'র পরে পড়ার সিদ্ধান্ত কীভাবে নিলেন? এ হাদীস শরীফ তো আপনাদেরও বিপক্ষে।

চার. এ হাদীস শরীফ ইবনে মাজাহ্ কর্তৃক বর্ণিত। এর 'সনদ' সমালোচিত। এ কারণেই সেটাকে ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের কিতাব দু'টিতে সন্নিবিষ্ট করেননি। ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমের বর্ণনা সেটার বিপরীত। একথা আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। সুতরাং এ হাদীস শরীফ সমালোচিত। মোটকথা, এ হাদীস শরীফ কোন মতেই, হে বিরুদ্ধবাদীরা, আপনাদের জন্য হুজ্জাত (দলীল) নয়।

আপত্তি-৩

ইমাম ত্বাহাভী তাঁর কিতাবে অনেক সনদে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে নিম্নলিখিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতগুলো সনদসম্বলিত হাদীস দুর্বল হতে পারে না। (হাদীসটি নিম্নরূপ)

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهٗ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ اَللّٰهُمَّ اَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ

অর্থঃ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামাযের 'ক্বিরাআত' সমাপ্ত করতেন এবং তাকবীর বলে রুকূ'তে যেতেন, আর রুকূ' থেকে শির মুবারক উঠাতেন এবং 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহু' বলতেন, তখন দন্ডায়মান হতেন আর এ দো'আ পড়তেন, "হে আল্লাহ, ওয়ালীদ ইবনে ওয়ালীদকে নাজাত দাও।"

ত্বাহাভী শরীফ হানাফীদের কিতাব। এটা দ্বারা 'কুনূত-ই নাযিলাহ' প্রমাণিত হয়।

জবাব

হয়তো আপনারা ত্বাহাভী শরীফের একই পৃষ্ঠায় হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকরের নিম্নলিখিত বর্ণনা দেখেননি। দেখবেনও কিভাবে? এটাতো আপনাদের বিপরীত! আমি সেটার শেষাংশ উল্লেখ করছি, আপনারা দেখে নিন-

..فَاَنْزَلَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ فَمَا دُعَآءُ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَآءٍ عَلٰى اَحَدٍ

অর্থঃ হুযূর-ই আক্রাম ফজরের নামাযে 'কুনূত-ই নাযিলাহ' পড়তেন। অতঃপর এ আয়াত শরীফ নাযিল হলো- "লায়সা লাকা মিনাল আমরি... ।" এরপর হুযূর-ই আক্রাম আর কখনো কারো বিপক্ষে নামাযে দো'আ করেন নি।

সুতরাং আপনাদের উপস্থাপিত সব ক'টি হাদীসই এ আয়াত শরীফ দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে। আর 'মানসূখ হাদীসগুলো' নিজেদের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ করা আপনাদের মতো লোকদের জন্য শোভা পায় বৈ-কি!

আপত্তি-৪

একাধিক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময় ফজরের নামাযে 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়তেন। কোন কোন বর্ণনায় হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়েছেন মর্মে প্রমাণ মিলে। এমন মহা মর্যাদাশীল সাহাবীগণের 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়া সেটা সুন্নাত হওয়ার পক্ষে উজ্জ্বল প্রমাণই।

জবাব

এর দু'টি জবাব দেওয়া যায়ঃ ১. ইলযামী ও ২. তাহক্বীক্বী। (যথাক্রমে, বিরুদ্ধবাদীদের কথা থেকে পাল্টা জবাব এবং গবেষণাধর্মী জবাব।)

প্রথমোক্ত জবাব হচ্ছে- 'ওই বর্ণনাগুলো, হে বিরুদ্ধবাদীরা, আপনাদেরও বিপরীত। কেননা, সেগুলোতে 'যুদ্ধ চলাকালে'-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলাকালে এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খারেজীদের বিরুদ্ধে কিংবা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় এ দো'আ পড়তেন। বুঝা গেলো যে, নিরাপত্তা থাকাকালে পড়তেন না। কিন্তু আপনারা সব সময় পড়ছেন? আপনারা এ পর্যন্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে কয়টি যুদ্ধ করেছেন? আপনারা তো

মুসলমানদেরকে মুশরিক বানানো এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ব্যতীত কোন্ জিহাদ করেছেন?

শেষোক্ত (গবেষণাধর্মী) জবাব হচ্ছে- আমি প্রথম পরিচ্ছেদে আরয করেছি যে, 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' সম্পর্কে সম্মানিত সাহাবীদের মধ্যে মতবিরোধ ছিলো। কোন কোন সাহাবী তো সেটাকে একেবারে মানসূখ মানেন এবং বিদ'আত বলেন, যেমন হযরত আবূ মালিক আশজা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনা আমি নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ শরীফের বরাতে প্রথম পরিচ্ছেদে আরয করেছি। আর কিছু সংখ্যক সম্মানিত সাহাবী যুদ্ধ চলাকালে 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়তেন। যেমন হযরত ওমর ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। এ কারণে আমাদের ফক্বীহ্গণ বলেন, "এখনো যুদ্ধ চলাকালে 'কুনূত-ই নাযিলাহ্' পড়া জায়েয, যদিও উত্তম নয়। কিন্তু সবসময় পড়া কোন সাহাবীর অভিমত নয়। আমাদের সমস্ত কথোপকথন তো 'সবসময় পড়ার' ব্যাপারে। আর আপনাদের দাবী একটা, দলীল অন্যটার পক্ষে। সমগ্র ওহাবী সম্প্রদায়ের প্রতি আম ঘোষণা দিচ্ছি- একটি মাত্র হাদীস-ই মারফূ'-ই সহীহ্ এমনটি দেখান, যা'তে সবসময় 'কুনূত-ই নাযিলাহ্ পড়ার নির্দেশ কিংবা উল্লেখ রয়েছে। ইন্শা-আল্লাহ্, ক্বিয়ামত পর্যন্ত পাবেন না। সুতরাং কেন জেদ ধরেছেন! 'মুক্বাল্লিদ' হয়ে যান। সহীহ্ (বিশুদ্ধ) নামায পড়ুন।

---o---

পরিশিষ্ট
বিতরের নামাযে 'দো'আ-ই কুনূত' সর্বদা পড়ুন

যেহেতু গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা বিত্‌রের নামাযগুলোতে সর্বদা দো'আ কুনূত পড়তে নিষেধ করছেন, তারা শুধু রমযান মাসের শেষ পনের দিন 'দো'আ-ই কুনূত' পড়ে থাকেন, আর আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা সব সময়, সারা বছর পড়ে থাকি, সেহেতু সংক্ষেপে এ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। সবসময় দো'আ-ই কুনূত বিতরের শেষ রাক্'আতের পর রুকূ'র পূর্বক্ষণে পড়া সুন্নাত। এর বিপরীত করা জঘন্য মন্দ।
হাদীসসমূহ দেখুন-

হাদীস নম্বর-১ - ২
ইমাম মুহাম্মদ তাঁর 'আ-সার' নামক কিতাবে এবং হাফিয ইবনে খুসরু মুহদ্দিস ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে, তিনি হযরত হাম্মাদ থেকে, তিনি হযরত ইব্রাহীম নাখ্'ঈ থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম, সাহাবা-ই রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّهٗ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِى الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ

অর্থ: যে, তিনি বিতরের নামাযগুলোতে গোটা বছর রুকূ'র পূর্বে দো'আ-ই কুনূত পড়তেন।

হাদীস নম্বর- ৩ - ৪
দার-ই কুতনী ও বায়হাক্বী হযরত সুয়াইদ ইবনে গাফলাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَقْنُتُوْنَ فَقَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اٰخِرِ الْوِتْرِ وَكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি সর্ব হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, ওমর ফারূক্ব, ওসমান গণী ও আলী মুরতাদ্বাকে শুনেছি, ওই সব হযরত বলছিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিত্‌রের সর্বশেষ রাক্'আতে দো'আ-ই কুনূত পড়তেন সমস্ত সাহাবীও এটাই করতেন।

হাদীস নম্বর- ৫ - ৮
সর্ব হযরত আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ হযরত আমীরুল মু'মিনীন আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِىْ اٰخِرِ وِتْرِهٖ :اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ الخ

অর্থ: নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিতরের নামাযের শেষ রাক্'আতে এ দো'আ পড়তেন- 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট পানাহ্ (আশ্রয়) চাই... ।'
এ হাদীস শরীফগুলো আমি নমূনা স্বরূপ আরয করলাম। অন্যথায় এ প্রসঙ্গে হাদীস শরীফ অনেক রয়েছে। ওইগুলোর কোথাও একথার উল্লেখ নেই যে, হুযূর-ই আক্বরাম অথবা সাহাবা-ই কেরাম শুধু রমযান মাসের শেষার্ধে দো'আ-ই কুনূত পড়েছেন; এর আগে কিংবা পরে পড়েননি; বরং সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সারা বছর দো'আ-ই কুনূত পড়তেন। বুঝা গেলো যে, সারা বছর বিতরের নামাযগুলোতে রুকূ'র পূর্বে দো'আ কুনূত পড়া হুযূর-ই আক্বরামেরও সুন্নাত, সাহাবা-ই কেরামেরও সুন্নাত।
স্মর্তব্য যে, গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের নিকট শুধু রমযানের শেষার্ধে দো'আ কুনূত পড়ার কেবল একটি হাদীস আছে, যা ইমাম আবূ দাঊদ হযরত হাসান বসরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, সেটা নিম্নরূপ-

اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ النَّاسَ عَلٰى اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّىْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَلَا يَقْنُتُ بِهِمْ اِلَّا فِى النِّصْفِ الْبَاقِىْ

অর্থ: হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব লোকদেরকে হযরত উবাই ইবনে কা'বের পেছনে একত্রিত করেছেন। তিনি তাঁদেরকে বিশ রাত যাবৎ তারাবীহ্‌র নামায পড়াচ্ছিলেন এবং কুনূত পড়তেন অবশিষ্ট অর্ধ রমযানে।
গায়র মুক্বাল্লিদগণ বলে বেড়ায় যে, রমযান মাসের শেষার্ধে দো'আ-ই কুনূত পড়া সুন্নাত-ই সাহাবা।

জবাব : এর দু'টি জবাব রয়েছে-
এক. হে ওহাবীরা! আপনাদের কি পূর্ণ হাদীসের উপর ঈমান আছে, না অর্ধেক হাদীসের উপর? যদি অর্ধেকের উপর থাকে, তাহলে কেন? আর যদি পূর্ণ হাদীসের উপর থাকে, তাহলে তাতে এ কথারও উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব

সমস্ত সাহাবীকে বিশ রাত যাবৎ তারাবীহ্ পড়াতেন। আপনারা তারাবীহর নামায সর্বদা আট রাক্'আত কেন পড়েন? শুধু বিশ রাত কেন পড়েন না? এ ধরনের কাজ যারা করে তাদের সম্পর্কে ক্বোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে-

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ

তরজমা: তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশের উপর ঈমান রাখো, আর কিছু অংশকে অস্বীকার করছো?

যদি এ হাদীস শরীফ দ্বারা পনের দিন দো'আ কুনূত পড়া প্রমাণিত হয়, তবে বিশ্ রাক্'আত তারাবীহ্ শুধু বিশ রাতেও পড়া প্রমাণিত এবং সাব্যস্ত হয়। সুতরাং এ হাদীস আপনাদেরও বিপক্ষে।

দুই. এ হাদীস শরীফে দো'আ কুনূতের উল্লেখ নেই। প্রকাশ থাকে যে, এটা অন্য কোন দো'আ হতে পারে, যাতে কাফিরদের ধ্বংসের জন্য দো'আ করা হয়েছে। যেহেতু ওই যুগে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ অধিক পরিমাণে হতো, সেহেতু হয়তো সাহাবা-ই কেরাম রমযানের শেষার্ধে, যাতে শবে ক্বদরও রয়েছে, ই'তিকাফের রাতগুলোও রয়েছে, কাফিরদের ধ্বংস ও ইসলামের বিজয়ের জন্য দো'আ করছিলেন। যদি তা দ্বারা দো'আ-ই কুনূতও বুঝানো হয়, তবে তো এ হাদীস ওইসব হাদীসের বিপরীত হয়ে যাবে, যেগুলো আমি ইতোপূর্বে পেশ করেছি, যেগুলোতে এরশাদ করা হয়েছে যে, সাহাবা-ই কেরাম সারা বছর দো'আ-ই কুনূত পড়তেন। তাই যথাসম্ভব হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ থাকতে দেওয়া যাবে না।

তিন. এ হাদীস শরীফ দ্বারাও রমযানের শেষ পনের দিন দো'আ কুনূত পড়া প্রমাণিত হয় না। কেননা, হযরত উবাই ইবনে কা'ব বিশ রাত তারাবীহ্ পড়িয়েছেন, যেগুলোর মধ্যে শেষার্ধে দো'আ কুনূত পড়েছেন। তাহলে হিসাবানুযায়ী সর্বমোট দশদিন, অর্থাৎ ১০ম রমযান থেকে ২০ রমযান পর্যন্ত দো'আ কুনূত পড়েছেন। আপনারা ১৫ রমযান থেকে ৩০ রমযান পর্যন্ত কেন পড়েন?

আমাদের ঘোষণা

আমরা সমগ্র দুনিয়ার ওহাবী-লা-মাযহাবীদের প্রতি ঘোষণা দিচ্ছি- কোন হাদীস-ই মারফূ' সহীহ্ বোখারী ও মুসলিমের বরাতে পেশ করুন, যাতে পনের দিন দো'আ-ই কুনূতের হুকুম রয়েছে; আগে ও পরে পড়ার নিষেধ আছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত পেশ করতে পারবেন না। সুতরাং আপনারা আপনাদের বর্তমান কাজ থেকে তাওবা করে নিন এবং সব সময় দো'আ-ই কুনূত পড়ুন। সবসময় মহান রবের দরবারে দো'আ করতে লজ্জাবোধ করবেন না।

নবম অধ্যায়

[আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় বসার পদ্ধতি]

‘আত্তাহিয়্যাত’ পড়ার সময়
বসার অবস্থা বা পদ্ধতি

পুরুষের জন্য সুন্নাত হচ্ছে- উভয় আত্তাহিয়্যাতে ডান পা দাঁড় করাবে আর বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর বসবে। আর নারীরা উভয় পা ডান দিকে বের করে দেবে এবং যমীনের উপর বসবে। কিন্তু ওহাবী লা-মাযহাবীরা প্রথম ‘আত্তাহিয়্যাতে তো পুরুষের মতো বসে কিন্তু দ্বিতীয়টিতে নারীদের মতো বসে; অথচ এটা সুন্নাতের পরিপন্থী এবং অতি মন্দ কাজ। এ জন্য আমি বিষয়টি দু’টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করবোঃ প্রথম পরিচ্ছেদে সেটার প্রমাণ যদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার বিরুদ্ধে আনীত আপত্তিগুলো খন্ডনসহকারে উল্লেখ করবো।

প্রথম পরিচ্ছেদ

‘তাত্তাহিহ্যাত’ পড়ার সময় চাই প্রথম হোক অথবা দ্বিতীয় হোক, পুরুষ তার ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখবে এবং তখন এ পায়ের আঙ্গুলগুলোর মাথা কা’বার দিকে থাকবে। আর বাম পা বিছাবে এবং সেটার উপর বসবে। এ নিয়মের পক্ষে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। নমূনা স্বরূপ কয়েকটা মাত্র পেশ করা হচ্ছেঃ

হাদীস নম্বর -১

ইমাম মুসলিম হযরত উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার শেষ শব্দাবলী নিম্নরূপ-

وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى

অর্থঃ তিনি নিজের বাম পা শরীফ বিছাতেন এবং ডান পা মুবারক দাঁড় করিয়ে রাখতেন।

হাদীস নম্বর-২-৩

ইমাম বোখারী ও ইমাম নাসাঈ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اِنَّمَاالسُّنَّةُ فِى الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىَ الْيُسْرٰى زَادَ النَّسَائِىُّ اسْتَقْبَالُ بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ

অর্থঃ সুন্নাত হচ্ছে- তুমি নিজের ডান পা খাড়া করে রাখা এবং বাম পা বিছিয়ে দেবে। ইমাম নাসাঈ এতটুকু বর্দ্ধিত করেছেন, ‘ডান পায়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিবলার দিকে করবে।’

হাদীস নম্বর ৪-৭

বোখারী শরীফ, মালিক, আবূ দাউদ ও নাসাঈ সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আজমা‘ঈন-এর সূত্রে বর্ণনা করেন-

اِنَّهُ كَانَ يَرٰى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِى الصَّلٰوةِ اِذَا جَلَسَ قَالَ فَفَعَلْتُهُ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيْثُ السِّنِّ فَنَهَانِىْ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىَ رِجْلَكَ الْيُسْرٰى فَقُلْتُ لَهُ اِنَّكَ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فَقَالَ اِنَّ رِجْلَىَّ لَا تَحْمِلَانِىِّ

অর্থঃ তিনি তাঁর পিতা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে দেখতেন যে, তিনি নামাযে চার জানু হয়ে বসতেন। তিনি বলেন, একদিন আমিও ওইভাবে বসলাম। তখন আমি অল্প বয়স্ক ছিলাম। তখন আমাকে হযরত আবদুল্লাহ্ তা করতে নিষেধ করলেন। আর বললেন, নামাযের সুন্নাত হচ্ছে তুমি ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে দেবে। আমি বললাম, আপনি তো এমনি করে থাকেন অর্থাৎ চার জানু হয়ে বসেন। তখন তিনি বললেন, ‘‘আমার পা আমার বোঝা বহন করতে পারে না।’’ (অর্থাৎ আমি ওযর সম্পন্ন)

হাদীস নম্বর-৮-৯

তিরমিযী শরীফ ও ত্বাবরানী হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَقُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَلَسَ يَعْنِىْ لِلتَّشَهُّدِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى

অর্থঃ তিনি বলেন, আমি মদীনা মুনাওয়ারায় এলাম। তখন আমি মনে মনে বললাম, আমি হুযূর-ই আক্বরামের নামায দেখবো। যখন তিনি নামাযে বসলেন অর্থাৎ ‘আত্তাহিয়্যাত’-এ, তখন তিনি নিজের বাম পা মুবারক বিছিয়ে দিলেন, বাম হাত মুবারক বাম রান মুবারকের উপর রাখলেন। আর ডান পা মুবারক দাঁড় করিয়ে রাখলেন।

হাদীস নম্বর ১০-১৩

ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান, ত্বাবরানী 'কাবীর'-এ হযরত রিফা'আহ্ ইবনে রাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ فَاِذَا جَلَسْتَ فَاجْلِسْ عَلٰى فَخِذِكَ الْيُسْرٰى

অর্থ: তিনি বলেন, অতঃপর যখন তুমি বসবে, তখন আপন বাম উরুর (রান) উপর বসো!

হাদীস নম্বর-১৪

তাহাভী শরীফে হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

اِنَّهٗ كَانَ يَسْتَحِبُّ اِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ فِى الصَّلٰوةِ اَنْ يَّفْتَرِشَ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَجْلِسُ عَلَيْهَا

অর্থ: তিনি এটা মুস্তাহাব জানতেন যে, পুরুষ নামাযে তার বাম পা বিছাবে যমীনের উপর এবং সেটার উপর বসবে।

হাদীস নম্বর-১৫

ইমাম আবূ দা'ঊদ হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى حَتّٰى اِسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهٖ

অর্থ: তিনি বলতেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে বসতেন, তখন নিজের বাম পা মুবারক বিছাতেন এ পর্যন্ত যে, ওই কদম শরীফের পৃষ্ঠদেশ কালো রং ধারণ করছিলো।

হাদীস নম্বর -১৬

বায়হাক্বী শরীফে সাইয়্যেদুনা আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত, যার শেষের শব্দাবলী নিম্নরূপ-

اِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصِبْ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى

অর্থ: যখন নামাযে বসবে তখন নিজের ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে দেবে।

হাদীস নম্বর -১৭

তাহাভী শরীফে হযরত ওয়াইল ইবনে হুজর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَاَحْفَظَنَّ صَلٰوةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا

অর্থ: আমি হুযূর-ই আক্রামের পেছনে নামায পড়েছি। তখন মনে মনে বললাম, আমি হুযূর-ই আক্রামের নামায স্মরণ রাখবো। তিনি বলেন, যখন হুযূর-ই আক্রাম 'আত্তাহিয়্যাত'-এর জন্য বসলেন, তখন বাম পা মুবারক বিছালেন। তারপর সেটার উপর বসলেন।

হাদীস নম্বর -১৮

ত্বাহাভী শরীফে হযরত আবূ হুমায়দ সা-'ইদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত, যার শেষাংশের শব্দাবলী নিম্নরূপ-

فَاِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ اَضْجَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى عَلٰى صَدْرِهَا وَيَتَشَهَّدُ

অর্থ: যখন হুযূর-ই আক্রাম 'আত্তাহিয়্যাত'-এর জন্য বসলেন, তখন তিনি নিজের বাম পা মুবারক বিছিয়ে দিলেন এবং ডান পা মুবারককে সেটার বক্ষের উপর দাঁড় করালেন আর 'আত্তাহিয়্যাত' পড়ছিলেন।

এ আঠার হাদীস শরীফ নমুনাস্বরূপ পেশ করা হলো; অন্যথায় এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস রয়েছে। এসব হাদীসে শুধু আত্তাহিয়্যাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 'শুরু' ও 'শেষ'-এর কোন শর্ত নেই। বুঝা গেলো যে, পুরুষ 'আত্তাহিয়্যাত'-এ বাম পায়ের উপর বসবে; নারীদের মতো উভয় পা একদিকে বের করে যমীনের উপর বসবে না।

যুক্তি ও বিবেকের দাবীও এ যে, দ্বিতীয় 'আত্তাহিয়্যাত' (আখেরী বৈঠক)-এও বাম পায়ের উপর বসবে। কেননা, এর উপর সবার ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, প্রথম 'আত্তাহিয়্যাত'-এ পুরুষ বাম পায়ের উপর বসবে, আর উভয় সাজদার মধ্যখানেও এভাবে বসবে। শেষ 'আত্তাহিয়্যাত'-এ লা-মাযহাবী ওহাবীদের বিরোধ আছে। প্রথম 'আত্তাহিয়্যাত'-এ বসা ওয়াজিব। আর উভয় সাজদার মধ্যখানে বসাও ওয়াজিব। দ্বিতীয় 'আত্ত্যাহিয়্যাত'-এ বসাকে যদি ফরয মনে করো, তা হলে সেটাও দু' সাজদার মধ্যখানে বসার মতো হওয়া উচিৎ। অর্থাৎ বাম পায়ের উপর বসা। যদি এ বৈঠককে ওয়াজিব মানা হয়, তবে সেটাও প্রথম 'আত্তাহ্যিাতের বৈঠকের মতো হওয়া চাই, অর্থাৎ বাম পায়ের উপর, যাতে ওই উভয় বৈঠক বাম পায়ের উপর হয়। আর এ শেষ বৈঠকে

যমীনের উপর উভয় পা একদিকে বের করে বসার কোন উদাহরণ বা দলীল-প্রমাণ নামাযে পাওয়া যায়না। মোটকথা, বাম পায়ের উপর বসাই হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত ও শরিয়তসম্মত হওয়ার একেবারে কাছাকাছি। আর যমীনের উপর নিতম্ব দু'টি রেখে বসা উদ্ধৃতিগত ও যুক্তি বা বিবেকগত উভয় ধরনের প্রমাণাদির পরিপন্থী। এ থেকে বিরত থাকা চাই।

স্মর্তব্য যে, নারীরা যমীনের উপর উভয় নিতম্ব রেখে উভয় পা ডান দিকে বের করে অবশ্যই বসে থাকে; কিন্তু তারাতো প্রথম 'আত্তাহিয়্যাত'-এও এভাবে বসে থাকে। আর উভয় সাজদার মধ্যভাগেও এভাবে বসে। সুতরাং তাদের এভাবে বসা যুক্তিযুক্ত। (কারণ, তাদের প্রত্যেক বৈঠক এক ধরনের।) মোটকথা, নারীদের প্রতিটি বৈঠক যমীনের উপর এবং পুরুষদের প্রতিটি বৈঠক তাদের বাম পায়ের উপর হবে। জানিনা লা-মাযহাবী (আহলে হাদীস) ওহাবীদের এ দু'রঙের, সাদা-কালো মিশ্রিত বিচিত্র বৈঠক কোন্ পর্যায়ে পড়ে?

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[এ মাসআলার বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

এ পর্যন্ত এ মাসআলা সম্পর্কে গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীদের পক্ষে যে পরিমাণ দলীলাদি (আপত্তি) আমরা পেয়েছি, আমরা সেগুলো, খন্ডন সহকারে, পেশ করছি। আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন। আ-মী-ন।

আপত্তি নং-১.

ইমাম ত্বাহাভী 'ত্বাহাভী শরীফ'-এ হযরত ইয়াহিয়া ইবনে সা'ঈদ-এর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ اَرَاهُمُ الْجُلُوْسَ فَنَصَبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَثَنّٰى رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَجَلَسَ عَلٰى وَرْكِهِ الْيُسْرٰى وَلَمْ يَجْلِسْ عَلٰى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَرَانِىْ هٰذَا عَبْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَحَدَّثَنِىْ اَنَّ اَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ

অর্থঃ ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মদ ওই সব লোককে নামাযে বসা দেখিয়েছেন। তখন তিনি তাঁর ডান পা দাঁড় করালেন এবং বাম পা বিছালেন। আর আপন বাম নিতম্বের উপর বসলেন। তিনি তাঁর দু' কদমের উপর বসেননি। তারপর ক্বাসিম বলেছেন, এটাই আমাকে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর দেখিয়েছেন, আর তিনি আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর এমনটি করতেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় পা ডান দিকে বের করে যমীনের উপর বসা সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত। আর সাহাবা-ই কেরাম এ আমল এজন্য করেছেন যে, হয়তো তাঁরা হুযূর-ই আক্বরামকে এমনটি করতে দেখেছেন।

খন্ডন

এর কতিপয় জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস তো আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর নামাযের প্রত্যেক 'আত্তাহিয়্যাত'-এ এমনই করে বসতেন; কিন্তু আপনারা বলছেন, তিনি প্রথম 'আত্তাহিয়্যাত'-এ বাম পায়ের উপর বসেছেন, আর দ্বিতীয়টিতে এভাবে বসেছেন। সুতরাং এ হাদীস আপনাদেরও বিপক্ষে।

দুই. এ হাদীস ওই রেওয়ায়তের বিপক্ষে, যা আমি প্রথম পরিচ্ছেদে পেশ করেছি। তা হচ্ছে- সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর উভয় 'আত্তাহিয়্যাত'-এ বাম পায়ের উপর বসতেন। ওই হাদীস অতিমাত্রায় শক্তিশালী ছিলো।

কিন্তু এ হাদীস সনদের দিক দিয়েও দুর্বল, 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ'রও বিপরীত। আর যখন হাদীসগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন যে হাদীস 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈর অনুরূপ হবে, সেটাই প্রাধান্য পাবে।

তিন. এ হাদীস থেকে আপনাদের কথা প্রমাণিত হয় না। কেননা, এ'তে একথার সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা যমীনের উপর নিতম্বযুগল রেখে বসতেন। তাতে এটা রয়েছে যে, তিনি উভয় কদমের উপর বসতেন না; বাস্তবিকপক্ষে নামাযী উভয় কদমের উপর বসে না; বরং শুধু একটি মাত্র পায়ের উপর অর্থাৎ বাম পায়ের উপর বসতেন। সুতরাং এ'তে আপনাদের পক্ষে কোন দলীল নেই।

আপত্তি নং-২.

ত্বাহাভী শরীফ ও আবূ দাউদ শরীফ মুহাম্মদ ইবনে 'আমর ইবনে 'আত্বার বরাতে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছে, যার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ-

سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدِالسَّاعِدِيِّ فِىْ عَشْرَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَمُكُمْ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اَنَّه كَانَ فِى الْجَلْسَةِ الْاُوْلٰى يُثْنِى رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتّٰى اِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِىْ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِهِ التَّسْلِيْمُ اَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى مُتَوَرِّكًا عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ فَقَالُوْا صَدَقْتَ

অর্থঃ আমি হুমায়দ সা-'ইদীকে দশজন সাহাবী-ই কেরামের দলে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমি তোমাদের সবার মধ্যে হুযূর-ই আক্রামের নামায সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশী জানি। তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রথম 'আত্তাহিয়্যাত-এ আপন বাম পা বিছিয়ে দিতেন এবং সেটার উপর বসতেন। এমনকি যখন সাজদা করে নিতেন, যার শেষভাগে সালাম রয়েছে, তখন আপন বাম পা একদিকে বের করে দিতেন। আর আপন বাম নিতম্ব শরীফের উপর যমীনের উপর বসতেন। তখন সাহাবীগণ বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

এ হাদীসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, প্রথম 'আত্তাহিয়্যাত'-এ পায়ের উপর এবং দ্বিতীয় 'আত্তাহিয়্যাত'-এ যমীনের উপর বসা সুন্নাত। আর আবূ হুমায়দ সা-'ইদী এ হাদীসকে দশজন সাহাবীর জমা'আতে উল্লেখ করেছেন। আর তাঁরা

সবাই এটার সত্যায়ন করেছেন। বুঝা গেলো যে, আম সাহাবীদের ওই নিয়মই ছিলো, যা অনুসারে আমরা আমল করে থাকি। (এটা গায়র মুক্বাল্লিদ, লা-মাযহাবী ওহাবীদের গর্ব করার মতো হাদীস।)

খন্ডন

এ হাদীস শুধু দুর্বলই নয়; বরং নিছক মনগড়া (বানোয়াট)-ই। কেননা, এর বর্ণনাকারী (রাভী) হলো মুহাম্মদ ইবনে আমার ইবনে আত্বা, যে অত্যন্ত মিথ্যুক। সে বলছিলো- سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ وَاَبَا قَتَادَةَ (অর্থাৎ আমি আবূ হুমায়দ ও আবূ ক্বাতাদাহ্ থেকে শুনেছি।) অথচ হযরত আবূ ক্বাতাদাহ্ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে ছিলেন। তাঁর যুগেই শহীদ হয়ে যান। হযরত আলীই হযরত আবূ ক্বাতাদার জানাযায় নামায পড়িয়েছেন। আর মুহাম্মদ ইবনে আমর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতের পর জন্মগ্রহণ করেছেন। সুতরাং সে আবূ ক্বাতাদার সাথে সাক্ষাৎ কিভাবে করলো? এমন মিথ্যুক লোক কখনো নির্ভরযোগ্য নয়, তার বর্ণিত হাদীসও আমল করার যোগ্য নয়।

দেখুন- ত্বাহাভী শরীফে এ অধ্যায়ের শেষভাগে।

আবূ হুমায়দ সা-'ইদীর সহীহ্ হাদীস হচ্ছে সেটাই, যা ত্বাহাভী শরীফে এ অধ্যায়ে আববাস ইবনে সুহায়লের সূত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। আমিও প্রথম পরিচ্ছেদে সেটা বর্ণনা করেছি। তাতে বলা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাম পা বিছিয়ে সেটার উপর বসতেন এবং 'আত্তাহিয়্যাত' পড়তেন।

আফসোস! (হে লা-মাযহাবীরা!) আপনারা এমন অনর্থক, দুর্বল বরং মিথ্যুক বর্ণনাকারীদের বর্ণনাগুলোর উপর নিজেদের মাযহাব (মতবাদ)-এর ভিত্তি কায়েম করছেন। আর যখন হানাফী নিজের সমর্থনে সহীহ্ হাদীস পেশ করেন, তখন সেটার উপর নানা বাহানা-অজুহাতে 'দুর্বল' দুর্বল' বলে শোর-চিৎকার করতে আরম্ভ করে দেন।

আর যদি এ হাদীস সহীহ্ বলেও মেনে নেওয়া হয়, তবুও তা পুর্বোল্লেখিত ওইসব হাদীসের বিপরীত হবে, যেগুলো আমি আরয করেছি। আমাদের সমস্ত হাদীস যেহেতু 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ'র সমর্থন দ্বারা শক্তি অর্জন করেছে, সেহেতু সেগুলোই আমল করার উপযোগী। আর এ হাদীস একেবারে আমলযোগ্য নয়।

আপত্তি নং-৩

ইমাম তিরমিযী তাঁর তিরমিযী শরীফে আববাস ইবনে সুহায়ল সা'ইদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اِجْتَمَعَ اَبُوْ حُمَيْدٍ وَاَبُوْ اُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوْا صَلواةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ اَنَا اَعْلَمُكُمْ بِصَلوةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَ جَلَسَ يَعْنِى لِلتَّشَهُّدِ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرى وَاَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنى عَلى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَكَفَّهُ الْيُمْنى عَلى رُكْبَتِهِ الْيُمْنى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلى رُكْبَتِهِ الْيُسْرى وَاَشَارَ بِاِصْبَعِهِ يَعْنِىْ سَبَّابَتَهُ

অর্থ: একবার আবূ হুমায়দ, আবূ উসায়দ, সাহল ইবনে সা'দ ও মুহাম্মদ ইবনে মাসলামাহ্ একত্রিত হন। তাঁরা হুযূর-ই আক্রামের নামাযের কথা আলোচনা করলেন। তখন আবূ হুমায়দ বলতে লাগলেন, "তোমাদের সবার চেয়ে হুযূর-ই আক্রামের নামায সম্পর্কে আমি বেশি জানি। হুযূর-ই আকরাম 'আত্তাহিয়্যাত'-এর জন্য বসলেন। তখন তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন। বাম পায়ের বক্ষ ক্বেবলার দিকে করলেন। আর নিজের ডান হাতের তালু ডান হাঁটু শরীফের উপর রাখলেন এবং বাম হাতের তালু শরীফ বাম হাঁটু শরীফের উপর লাখলেন। আর আঙ্গুল শরীফ (শাহাদত আঙ্গুল) দ্বারা ইঙ্গিত করলেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এভাবেই 'আত্তাহিয়্যাত'-এ বসতেন, যেভাবে আমরা বসে থাকি। অন্যথায় তাঁর ডান পা মুবারকের বক্ষ ক্বেবলার দিকে হতোনা; বরং এ পা মুবারক দন্ডায়মান থাকতো।

খন্ডন: এর কতিপয় জবাব রয়েছে-

এক. এ হাদীস আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক 'আত্তাহিয়্যাত'-এ যমীনের উপর বসতেন। আপনারাতো প্রথম 'আত্তাহিয়্যাত'-এ বাম পায়ের উপর বসেন এবং দ্বিতীয়টিতে যমীনের উপর বসেন। এটা কেন? এর যে জবাব দেবেন আপনারা, ওই জবাব আমাদেরও হবে, নিজেদের চিন্তা করুন।

দুই. আপনাদের 'আত্তাহিয়্যাত'-এ তিনটি কাজ করা হয়- ১. বাম পা ডান দিকে বের করে দেওয়া, ২. ডান পা দন্ডায়মান হওয়া এবং ৩. নিতম্বযুগল যমীনের উপর গিয়ে লেগে যাওয়া, নারী মুসল্লীদের মতো। এ হাদীস দ্বারা এ তিনটি কাজের মধ্যে একটিও প্রমাণিত হয় না, না বাম পা ডান দিকে বের করা, না

নিতম্বযুগলকে যমীনের উপর রাখা, না ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখা। নিতম্ব যুগল যমীনের উপর গিয়ে লাগা নারী মুসল্লীদের সদৃশ হয়। এ হাদীসে এ তিনটি কাজের কোনটারই প্রমাণ নেই; না বাম পা ডান দিকে বের করা, না নিতম্ব যুগলকে যমীনের উপর রাখা, না ডান পা দন্ডায়মান থাকা। আশ্চর্যের কথা হচ্ছে এটাকে আপনারা নিজেদের সমর্থনকারী কিভাবে বুঝে নিলেন? এ'তো আপনাদের সঠিক বুঝা বৈ-কি? ডান পায়ের বক্ষ কেবলার দিকে হওয়া আপনাদেরও বিপরীত।

তিন. আবূ হুমায়দ সা-'ইদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এ হাদীস ওইসব হাদীসের বিপরীত, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে আরয করেছি। তাছাড়া, ওই খোদ্ আবূ সা'ইদ সা-'ইদী থেকে এর বিপরীতও উদ্ধৃত হয়েছে। ওইসব হাদীস এ হাদীস থেকে বেশী শক্তিশালী, যেমনটি আমি প্রথম পরিচ্ছেদে এবং খোদ্ এ পরিচ্ছেদে আরয করেছি। সুতরাং ওই হাদীসগুলো আমলযোগ্য; কিন্তু এটা আমলযোগ্য নয়।

চার. এ-ই তিরমিযী শরীফে এ-ই জায়গায় হযরত আবূ ওয়া-ইলের ওই হাদীসও মওজূদ রয়েছে, যাতে হানাফীদের মতো বসার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস 'হাসান-সহীহ্' পর্যায়ের। আরো বলেছেন- অধিকাংশ আলিম এ অনুসারে আমল করে থাকেন। আপনারা এমন সহীহ্ ও স্পষ্টার্থক হাদীসকে কেন বর্জন করেছেন? আর 'মুজমাল' (অবিস্তারিত/সংক্ষিপ্ত) হাদীস কেন গ্রহণ করে বসেছেন, যেগুলো আপনাদের অনুকূলেও নয়? বুঝা গেলো যে, আপনারা হাদীসের অনুসারী নন; বরং নিজেদের রায় বা খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে থাকেন। আপনারা আপনাদের নাম 'আহলে হাদীস' নয়; বরং 'আহলে রায়' ও আহলে জেদ' রাখুন!

আপত্তি নং-৪

বাম পায়ের উপর বসা সম্পর্কে আপনারা যেসব হাদীস পেশ করেছেন, ওই সব ক'টি দুর্বল, দলীল হিসেবে পেশ করার উপযোগী নয়। (ওই পুরানা সবক)

খন্ডন

কোন হানাফীকে আপনারা এ মন্ত্র দ্বারা ভয় দেখাবেন না! হানাফীদের উপর হাদীস দুর্বল হলে কোন প্রভাব পড়ে না। হানাফীরা, আল্লাহর প্রশংসাক্রমে, এতবেশী হাদীস পেশ করেন যে, যদি অসম্ভব কল্পনায়, ওই সব ক'টিও দুর্বল হয়, তবুও সবল হয়ে যাবে।

তাছাড়া, ইমামে আ'যমের মতো শীর্ষস্থানীয় ও মহা মর্যাদাবান মুজতাহিদ সিরাজুল্ উম্মাহ্ কর্তৃক কবূল করে নেওয়া-ই সেটা সবল হবার জন্য যথেষ্ট। হানাফী মাযহাবের দলীলাদি তো এসব রেওয়ায়ত নয়; এগুলো তো সমর্থক। হানাফীদের দলীল হচ্ছে ইমাম-ই আ'যমের অভিমত। আমাদের ঈমান কিতাবের উপরও আছে, সুন্নাতের উপরও আছে, ইজমা'ই উম্মত ও মুজতাহিদদের ক্বিয়াসের উপরও আছে। আমাদের সামনে এ-ই আয়াত শরীফ আছে-

اَطِيْعُو اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

তরজমা: তোমরা আনুগত্য করো, আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং নির্দেশদাতা মুজতাহিদদের।

---o---

দশম অধ্যায়

[তারাভীহ্র নামায বিশ রাক্'আত]

‘তারাভীহ’র নামায বিশ রাক্‌‘আত

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সমস্ত উম্মত এ কথার উপর একমত যে, ‘তারাভীহ’র নামায আট রাক্‌‘আত নয় ।’ (বাকী রইলো- এ নামায কি বিশ্‌ রাক্‌‘আত, না আরো বেশী!) অধিকাংশ (প্রায় সব) মুসলমান বিশ রাক্‌‘আত পড়েন, কেউ কেউ চল্লিশ রাক্‌‘আত পড়েন । (অবশ্য গায়র মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবী তথা) ওহাবী ফির্ক্বা বা দল, যাদের নিকট নামায ভারী ও কষ্টকর । নিছক নাফ্‌সের উপর বোঝা মনে করে ‘তারাভীহ্‌’ শুধু আট রাক্‌‘আত পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে । আর কিছু সংখ্যক বর্ণনাকে বাহানা-অজুহাত সাব্যস্ত করে । এ জন্য আমি এ মাসআলাকে দু’টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছিঃ প্রথম পরিচ্ছেদে বিশ্‌ রাক্‌‘আত তারাভীহর পক্ষে প্রমাণাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ওহাবী লা-মাযহাবীদের আপত্তিগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর জবাব (খন্ডন) করেছি ।
আল্লাহ্‌ তা‘আলা ক্ববূল করুন! আ-মী-ন ।

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিশ রাক্‌‘আত তারাভীহ্‌র প্রমাণাদি

বিশ রাক‘আত তারাভীহ্‌ পড়া- রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সাহাবা-ই কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম ও আম মুসলমানদের সুন্নাত । (সুতরাং আট রাক‘আত তারাবীহ্‌ সুন্নাতের পরিপন্থী ।) দলীলাদি নিম্নরূপ:

হাদীস নম্বর ১-৫
ইবনে আবী শায়বাহ্‌ ও ত্বাবরানী ‘কবীর’-এ, বায়হাক্বী, আবদ্‌ ইবনে হুমায়দ এবং ইমাম বাগাভী সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً سِوَى الْوِتْرِ وَزَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র রমযান মাসে বিশ রাক্‌‘আত পড়তেন- বিত্‌র ব্যতীত । ইমাম বায়হাক্বী এতটুকু বেশী লিখেছেন- ‘জামা‘আত ব্যতীত তারাভীহ্‌ পড়তেন’ ।

এ হাদীস শরীফগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, খোদ্‌ হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ রাক্‌‘আত তারাভীহ্‌ পড়তেন । যেসব রেওয়ায়তে এসেছে যে, তিনি শুধু তিন দিন তারাভীহ্‌ পড়েছেন, সেগুলোতে জমা‘আত সহকারে পড়া বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ জমা‘আত ব্যতীত তো সব সময় পড়তেন, জমা‘আত সহকারে শুধু তিনদিন পড়েছেন । সুতরাং হাদীস শরীফগুলোতে পরস্পর কোন বিরোধ নেই ।
এও বুঝা গেলো যে, তারাভীহ্‌ ‘সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌ ‘আলাল ‘আয়ন ।’ (অর্থাৎ শরীয়তের বিধানাবলী বর্তায় এমন প্রত্যেকের জন্যই তারাভীহ্‌র নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌’) কারণ, হুযূর-ই আক্‌রাম এ নামায সব সময় পড়েছেন এবং লোকজনকে উৎসাহ্‌ও দিয়েছেন ।

হাদীস নম্বর-৬
ইমাম মালিক হযরত ইয়াযীদ ইবনে রূমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِىْ زَمَنِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ فِىْ رَمَضَانَ بِثَلٰثٍ وَّ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থ: হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর যামানায় রমযানে লোকেরা তেইশ রাক্‌‘আত নামায পড়তেন ।
এ থেকে দু’টি মাস্‌আলা প্রতীয়মান হয়ঃ **এক.** তারাভীহ্‌ বিশ রাক্‌‘আত এবং দুই. বিতর তিন রাক্‌‘আত । এ কারণে সর্বমোট তেইশ রাক্‌‘আত হয়েছে ।

হাদীস নম্বর -৭
ইমাম বায়হাক্বী মা’রিফায় সহীহ সনদে হযরত সা-ইব ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ فِىْ عَهْدِ عُمَرَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرِ

অর্থ: তিনি বলেন, আমরা (সাহাবীগণ) হযরত ওমর ফারূক্বের যামানায় (খিলাফতকালে) বিশ রাক্‌‘আত ও বিত্‌র পড়তাম ।

হাদীস নম্বর -৮
ইবনে মুনী’ হযরত উবাই ইবনে কা’ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اَمَرَهُ اَنْ يُصَلِّيَ اللَّيْلَ فِيْ رَمَضَانَ ـ قَالَ اِنَّ النَّاسَ يَصُوْمُوْنَ النَّهَارَ وَلاَ يُحْسِنُوْنَ اَنْ يَقْرَؤُا فَلَوْقَرَأْتَ عَلَيْهِمِ اللَّيْلَ قَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هٰذَا شَيْئٌ لَمْ يَكُنْ فَقَالَ فَقَدْ عَلِمْتُ وَلٰكِنَّهُ حَسَنٌ فَصَلّٰى بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً ـ

অর্থঃ হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ''তুমি লোকজনকে রমযানের রাতে তারাভীহর নামায পড়াবে। কেননা, লোকেরা দিনের বেলায় রোযা রাখে এবং ক্বোরআন করীম উত্তমরূপে পড়তে পারে না। সুতরাং উত্তম হবে যদি তুমি তাদেরকে রাতে ক্বোরআন পড়ে শুনাও।'' হযরত উবাই আরয করলেন, ''হে আমীরুল মু'মিনীন, এটা ওই কাজ, যা ইতোপূর্বে ছিলো না।'' তিনি বললেন, ''আমি জানি; কিন্তু এটা উত্তম কাজ।'' সুতরাং হযরত উবাই তাঁদেরকে বিশ রাক্'আত পড়িয়েছেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটা মাসআলা প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতের পূর্ব থেকে মুসলমানদের মধ্যে তারাভীহ্ জারী ছিলো; তবে জমা'আত সহকারে, গুরুত্বের সাথে সব সময় (নিয়মিতভাবে) তারাভীহর নামায পড়ার প্রচলন হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যমানা থেকে হয়েছে। মূল তারাভীহ্ আল্লাহর রসূলের সুন্নাত। আর জমা'আত, গুরুত্ব দেওয়া ও নিয়মিতভাবে পড়া- সুন্নাত-ই ফারূক্বী। (হযরত ওমর ফারূক্বের সুন্নাত।)

দুই. বিশ রাক্'আত তারাভীহ্‌র উপর সমস্ত সাহাবীর ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, হযরত উবাই ইবনে কা'ব সমস্ত সাহাবীকে বিশ্ রাক্'আত পড়িয়েছেন। সাহাবা-ই কেরামও পড়েছেন। কেউ আপত্তি করেননি।

তিন. 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ্'আত) ভাল জিনিস। হযরত উবাই ইবনে কা'ব আরয করেছেন, তারাবীহ্‌র নামায জামা'আত সহকারে নিয়মিতভাবে গুরুত্ব সহকারে পড়াতো ইতোপূর্বে ছিলোনা, বিদ্'আত। হযরত ফারূক্বে আ'যম বলেছেন, একেবারে ঠিক কথা, বাস্তবিকই এটা বিদ্'আত; কিন্তু উত্তম।

চার. যে কাজ হুযূর-ই আক্বরামের যমানায় ছিলোনা, তা বিদ্'আত; যদিও সাহাবীদের যুগে প্রচলিত হয়। যেমন-তারাভীহর নামায জমা'আত সহকারে আদায় করা। এটা যদিও হযরত ওমর ফারূক্বের যুগে প্রচলিত হয়েছে; কিন্তু সেটাকে 'বিদ্'আত-ই হাসানাহ্' (উত্তম বিদ্'আত) বলা হয়েছে।

হাদীস নম্বর -৯

ইমাম বায়হাক্বী তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে হযরত আবূ আবদুর রহমান সুলামী থেকে বর্ণনা করেছেন-

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ دَعَا الْقُرَّاءَ فِيْ رَمَضَانَ وَاَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَكَانَ عَلِيٌّ يُوْتِرُ بِهِمْ

অর্থ: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রমযান শরীফে ক্বারীদেরকে ডাকলেন, তারপর একজনকে নির্দেশ দিলেন যেন পাঁচ তারাভীহ্ বিশ রাক'আত নামায পড়ান। হযরত আলী তাঁদেরকে বিতর পড়াতেন।

হাদীস নম্বর -১০

ইমাম বায়হাক্বী হযরত আবুল হাসানা থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ اَمَرَ رَجُلاً يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থঃ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যেন তিনি পাঁচ তারাভীহ্ অর্থাৎ বিশ রাক'আত নামায পড়ান।

নমুনাস্বরূপ কয়েকটা হাদীস এখানে পেশ করা হলো। অন্যথায় বিশ্ রাক্'আতের পক্ষে হাদীস শরীফ অনেক রয়েছে। আগ্রহ থাকলে আমার লিখিত 'লুম্'আতুল মাসাবীহ্ ফী রাক্'আ-তিত্ তারাবীহ্' এবং 'সহীহুল বিহারী' পাঠ-পর্যালোচনা করতে পারেন।

বিবেক বা যুক্তিরও দাবী হচ্ছে তারাভীহর নামায বিশ রাক্'আত হোক, আট রাক্'আত নয়। এরও কয়েকটা কারণ আছে-

এক. দিন ও রাতে ফরয ও ওয়াজিব নামায বিশ্ রাক্'আতঃ সতের রাক্'আত ফরয আর তিন রাক্'আত বিতর ওয়াজিব। রমযান মাসে বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়া হলে ওই বিশ রাক্'আত ফরয ও ওয়াজিব নামায পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে এবং ওইগুলোর মর্যাদা বা গ্রহণযোগ্যতাও বেড়ে যাবে। (কারণ, এ সুন্নাত নামাযগুলো ফরয ও ওয়াজিব নামাযগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকার করবে, কাফ্ফারাহ্ হয়ে যাবে।) সুতরাং আট রাক্'আত তারাভীহ্ ক্বিয়াস তথা যুক্তিরও বিরোধী।

দুই. সাহাবীগণ আলাইহিমুর রিদ্বওয়ান তারাভীহ্‌র প্রত্যেক রাক্'আতে এক রুকূ' পরিমাণ ক্বোরআন পড়তেন; বরং ক্বোরআন-ই করীমের রুকূ'কে রুকূ' এজন্যই বলা হয় যে, এতটুকু আয়াত পড়ে হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও অন্যান্য সাহাবীগণ তারাভীহ্‌তে রুকূ' করতেন। আর ২৭ রমযানের রাতে ক্বোরআন

খতম হতো। আট রাক্‌'আত হলে ক্বোরআন-ই করীমের রুকূ' সংখ্যা সর্বমোট ২১৬ হতো; অথচ ক্বোরআন-ই করীমের রুকূ'র সংখ্যা সর্বমোট ৫৫৭। বিশ রাক্‌'আতের হিসেবে ৫৪০ রুকূ' হয়। কোন ওহাবী আট রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ মানলে ক্বোরআন করীমের রুকূ'গুলোর এ সংখ্যা দাঁড়ানোর কারণটুকুও বলে দেবেন বৈ-কি।

তিন. 'তারাভীহ্‌' (تراويح) হচ্ছে 'তারভীহাহ্‌' (ترويحه)-এর বহু বচন। 'তারাভীহাহ্‌' বলে প্রত্যেক চার রাক্‌'আতের পর কিছুক্ষণ বসে বিশ্রাম নেয়াকে। যদি তারাভীহ্‌ আট রাক্‌'আত হতো, তাহলে মধ্যভাগে শুধু একবার বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ হতো। এমতাবস্থায় এর নাম তারাভীহ্‌ (বহুবচন) হতো না। 'বহুবচন' আরবীতে কমপক্ষে 'তিন'কে বলা হয়।

উম্মতের আলিমদের আমল

সবসময় প্রায়সব উম্মতের আমল বিশ্‌ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ পড়াই চলে আসছে। এখনো এ আমল বলবৎ রয়েছে। হেরমাঈন শরীফাঈন ও সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানগণ বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ই পড়ে থাকেন। সুতরাং তিরমিযী শরীফের রমযান মাসে 'রাত জাগরণ করে ইবাদত করার বিবরণ' শীর্ষক অধ্যায়ে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَاَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ عَلٰى مَارُوِىَ عَلِىٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىِّ وَقَالَ الشَّافِعِىُّ هٰكَذَا اَدْرَكْتُ بَلَدَ مَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً

অর্থ: এবং অধিকাংশ আলিমের আমল এর উপরই, যা হযরত ওমর, হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণিত। অর্থাৎ বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ আর এটাই হযরত সুফিয়ান সওরী, ইবনে মুবারক ও ইমাম শাফে'ঈ আলায়হিমুর রাহ্‌মাহর অভিমত। ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন, "আমি মক্কাবাসীদেরকে বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ পড়তে দেখতে পেয়েছি।"

'ওমদাতুল ক্বারী শরহে বোখারী': ৫ম খন্ড: ৩৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে-

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَبِهٖ قَالَ الْكُوْفِيُّوْنَ وَالشَّافِعِىُّ وَاَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ

অর্থ: ইবনে আবদুল বার বলেন, বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ই প্রায় সব বিজ্ঞ আলিমের কথা। এটাই কূফী হযরতগণ, ইমাম শাফে'ঈ এবং অধিকাংশ আলিম ও ফক্বীহ্‌গণের অভিমত। বস্তুত এটাই বিশুদ্ধ কথা। এটা হযরত উবাই ইবনে

কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। এ'তে সাহাবীগণের কোন বিরোধ নেই।

মাওলানা আলী ক্বারী 'শরহে নিক্বায়াহ্‌'য় বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ সম্পর্কে বলেন-

فَصَارَ اِجْمَاعًا لِمَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلٰى عَهْدِ عُمَرَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَعَلٰى عَهْدِ عُثْمَانَ وَعَلِىٍّ عِشْرِيْنَ

অর্থ: বিশ রাক্‌'আত তারাভীহর উপর মুসলমানদের ইজমা' (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা, বায়হাক্বী সহীহ্‌ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবা-ই কেরাম ও সমস্ত মুসলমান হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের যমানায় বিশ রাক্‌'আত তারাবীহ্‌ পড়তেন।

আল্লামা ইবনে হাজর হায়তামী বলেছেন-

اِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلٰى اَنَّ التَّرَاوِيْحَ عِشْرُوْنَ رَكْعَةً

অর্থ: সমস্ত সাহাবী এ কথার উপর একমত যে, তারাভীহ্‌ বিশ রাক্‌'আত।

উপরিউক্ত বরাতগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। বিশ রাক্‌'আত তারাভীহর উপর সাহাবা-ই কেরামের ইজমা' হয়েছে। বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ পড়া আম মুসলমানদের আমল। বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ হারামাঈন শরীফাঈনে পড়া হয়। বিশ্‌ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ বিবেক ও যুক্তির অনুরূপ। বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ ক্বোরআনের রুকূ'গুলোর সংখ্যানুরূপ; বরং আজকাল হারামাঈন-ই ত্বাইয়্যেবাঈনে নজদীদের বাদশাহী চলছে; কিন্তু এখনো ওখানে বিশ্‌ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ পড়া হয়। কারো ইচ্ছা হলে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে আসতে পারেন। জানিনা, আমাদের এখানকার ওহাবী লা-মাযহাবীরা কার অনুসরণ করে, যারা আট রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ পড়ে। আট রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ তো সুন্নাতে রসূলের বিরোধী, সুন্নাতে সাহাবার পরিপন্থী, মুসলমানদের সুন্নাতের বরখেলাফ। ওলামা- মুজতাহিদীনের সুন্নাতেরও বিপরীত; এমনকি ওটা হারামাঈন-ই ত্বাইয়্যেবাঈনেরও বিরোধী; অবশ্য মনের কুপ্রবৃত্তির অনুরূপ। কারণ, নামায নাফ্‌সে আম্মারার উপর বোঝা স্বরূপ। মহান রব নাফসে আম্মারার ফাঁদগুলো থেকে মুক্ত করে সুন্নাতে রসূলের উপর আমল করার তাওফীক দিন। আ-মী-ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিশ্ রাক্'আত তারাভীহর বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খণ্ডন

বাস্তব কথা হচ্ছে- লা-মাযহাবী আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের নিকট আট রাক্'আত তারাভীহর পক্ষে কোন মজবুত দলীল নেই; আছে কিছু অহেতুক ভ্রম আর কিছু অমূলক সন্দেহ। ইচ্ছে হচ্ছে না ওইগুলোর খণ্ডন করতে, কিন্তু বিষয়টির আলোচনা পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন আরয করার প্রয়াস পাচ্ছি। মহামহিম রব তাদেরকে হিদায়ত নসীব করুন!

আপত্তি-১.
ইমাম মালিক সা-ইব ইবনে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّهٗ قَالَ اَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَتَمِيْمَ الدَّارِيَّ اَنْ يَقُوْمَ لِلنَّاسِ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ...الخ

অর্থ: তিনি বলেন, হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উবাই ইবনে কা'ব ও তামীমে দারীকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা লোকদেরকে এগার রাক্'আত নামায পড়িয়ে দেন।...

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত ফারূক্ব-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আট রাক্'আত তারাভীহ্ পড়ানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। যদি তারাভীহ্ বিশ রাক্'আত হতো তাহলে বিতরসহ সর্বমোট ২৩ রাক্'আত হতো।

খন্ডন: এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়ঃ

এক. এ হাদীস, হে আহলে হাদীস, তোমাদেরও ঘোর বিরোধী। কেননা, এ থেকে যেখানে আট রাক্'আত তারাভীহ্ প্রমাণিত হলো বলে তোমরা দাবী করছো, ওখানে তিন রাক্'আত বিত্‌র নামাযের প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। তখনই তো সর্বমোট এগার রাক্'আত হবে, আট রাক্'আত ও তিন রাক্'আত বিতর। যদি বিতর নামায এক রাক্'আত হতো, তবে সর্বমোট নয় রাক্'আত হয়, এগার রাক্'আত হয় না। বলো, তোমরা এক রাক্'আত বিত্‌র কেন পড়ো? তোমরা

এক হাদীসের একাংশ মেনে নিচ্ছো, আরেকাংশকে অস্বীকার করছো? সুতরাং এ রেওয়াতের তোমরা যে জবাব দেবে ওই জবাব আমাদেরও হবে।

দুই. এ হাদীসের রাভী (বর্ণনাকারী) মুহাম্মদ ইবনে ইয়ূসুফ। তাঁর বর্ণনাদিতে তুমুল গরমিল ও ভিন্নতা রয়েছে। মুআত্তা-ই ইমাম মালিকে এ বর্ণনায় তো তাঁর নিকট থেকে এগার রাক্'আতের উদ্ধৃতি রয়েছে, আর মুহাম্মদ ইবনে নাসর মারভেযী তার নিকট থেকে তের রাক'আত বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস আবদুর রায্‌যাক্ব তাঁরই থেকে একুশ রাক্'আত বর্ণনা করেছেন। দেখুন, ফাত্হুল বারী শরহে বোখারী: ৪র্থ খণ্ড: পৃ. ১৮, খায়রিয়া প্রেস, মিশর থেকে মুদ্রিত। সুতরাং তার কোন বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য নয়। আশ্চর্য! আপনারা কি নাফসে আম্মারার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য এমন সব অনির্ভরযোগ্য বর্ণনার আশ্রয় নিচ্ছেন?

তিন. হযরত ওমর ফারূক্বের যুগে প্রাথমিক পর্যায়ে আট রাক্'আত তারাভীহ্‌র হুকুম দেওয়া হয়েছিলো। তারপর বার রাক্'আতের, সর্বশেষ বিশ রাক্'আতের নির্দেশ দেওয়া হয়। এটা সব সময়ের জন্য বহাল হলো। সুতরাং এ-ই 'মুআত্তা-ই ইমাম মালিক'-এ হযরত আ'রাজ থেকে এক দীর্ঘ হাদীস শরীফ বর্ণনা করা হয়েছে, যার সর্বশেষ শব্দাবলী নিম্নরূপ:

وَكَانَ الْقَارِئُ يَقْرَأُ بِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ فِيْ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَاِذَا اَقَامَهَا فِيْ اِثْنَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً رَاٰى النَّاسُ اَنَّهٗ قَدْ خُفِّفَ

অর্থ: ক্বারী আট রাক্'আত তারাভীহ্‌তে সূরা বাক্বারা পড়তেন। অতঃপর যখন বার রাক্'আতে তা পড়তে লাগলেন, তখন লোকেরা অনুভব করলো যে, তাদের উপর সহজ করা হয়েছে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় মাওলানা আলী ক্বারী তাঁর 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত'-এ বলেন-

ثَبَتَ الْعِشْرُوْنَ فِيْ زَمَنِ عُمَرَ وَفِي الْمُوَطَّا رِوَايَةٌ بِاِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً وَجُمِعَ بَيْنَهُمَا اَنَّهٗ وَقَعَ اَوَّلاً ثُمَّ اسْتَقَرَّ الْاَمْرُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ فَاِنَّهُ الْمُتَوَارِثُ

অর্থ: অবশ্য বিশ্ রাক্'আতের হুকুম হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যামানায় প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়েছে। মু'আত্তা শরীফে এগার রাক্'আতের উল্লেখ রয়েছে। এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে করা হয়েছে যে, হযরত ওমর ফারূক্বের খিলাফতকালে প্রথমে আট রাক্'আতের হুকুম ছিলো। তারপর বিশ রাক্'আত তারাভীহর উপর স্থির হলো। এটাই মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হলো।

বুঝা গেলো যে, আট রাক্‌'আত তারাভীহর উপর আমল বর্জন করা হয়েছে। বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ সাহাবা-ই কেরাম ও সমস্ত মুসলমানের মধ্যে কার্যকর রয়েছে।

আপত্তি-২

হে আহলে সুন্নাত! আপনাদের পেশকৃত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হলো যে, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ পড়তেন। সুতরাং হযরত ওমর প্রথমে আট রাক্‌'আতের হুকুমই বা কেন দিলেন? সুন্নাতের পরিপন্থী হুকুম দেওয়া সাহাবা-ই কেরামের শান থেকে বহু দূরে (অর্থাৎ অসম্ভবই।)

খন্ডন

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে তো বিশ রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ পড়েছেন; কিন্তু সাহাবীদেরকে এ সংখ্যার স্পষ্ট নির্দেশ দেননি। শুধু রমযানের রাতগুলোতে বিশেষ নামাযের প্রতি উৎসাহ্‌ দিয়েছেন; বরং খোদ্‌ জমা'আত সহকারে, নিয়মানুসারে, সবসময় করাননি। এর কারণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, তারাভীহ্‌ ফরয হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। এ জন্য সাহাবা-ই কেরামের সামনে তারাভীহ্‌র রাক্‌'আতগুলোর সংখ্যা প্রকাশ পায়নি।

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রাথমিক পর্যায়ে নিজের 'ইজতিহাদ' দ্বারা আট রাক্‌'আত, তারপর বার রাক্‌'আত নির্দ্ধারণ করেছেন। বিশ রাক্‌'আতের সূত্র পাওয়া মাত্রই বিশ রাক্‌'আতেরই স্থায়ী হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন। ওই যুগে আজকালের মতো হাদীস শরীফগুলো কিতাবগুলোতে সংকলন করা হয়নি। একেকটা হাদীস অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে অর্জন করা যেতো।

আপত্তি-৩.

বোখারী শরীফে আছে- হযরত আবূ সালামাহ্‌ উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযানের রাতগুলোতে কত রাক্‌'আত পড়তেন। তখন উম্মুল মু'মিনীন বললেন-

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِىْ رَمَضَانَ وَلاَ فِىْ غَيْرِهٖ عَلٰى اِحْدٰى عَشْرَ رَكْعَاتٍ

অর্থঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমযান ও গর রমযানে এগার রাক্‌'আতের বেশি পড়তেন না।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আক্‌রাম তারাভীহ্‌ আট রাক্‌'আত পড়তেন। যদি বিশ রাক্‌'আত পড়তেন, তাহলে সর্বমোট ২৩ রাক্‌'আত হয়ে যেতো।

খন্ডন : এ আপত্তিরও কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস হে আপত্তিকারীরা, আপনাদেরও বিপরীত। কারণ, যদি এটা থেকে আট রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ প্রমাণিত হয়, তাহলে তিন রাক'আত বিতরও প্রমাণিত হয়, তবেই তো সর্বমোট এগার রাক্‌'আত হয়। আপনারা বিতর এক রাক্‌'আত পড়েন কেন জবাব দিন। আপনারা কী হাদীসের একাংশের উপর ঈমান রাখছেন, আর বাকী অংশকে অস্বীকার করছেন?

দুই. হযরত উম্মুল মু'মিনীন এখানে তাহাজ্জুদের নামাযের কথা উল্লেখ করেছেন, তারাভীহ্‌র নামাযের নয়। এ কারণে তিনি এরশাদ করেছেন, রমযান ও গর রমযানে, অন্যান্য মাসে এগার রাক্‌'আতের বেশি পড়তেন না। রমযান ছাড়া গর রমযানে কোন্‌ মাসে তারাবীহ্‌ পড়া হয়? যদি আপনারা একথায় গভীরভাবে চিন্তা করে নিতেন, তাহলে এ আপত্তির দুঃসাহস করতেন না। এ কারণে তিরমিযী শরীফে এ হাদীসকে, 'রাতের নামায, অর্থাৎ তাহাজ্জুদের নামাযের বিবরণ' শীর্ষক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া, এ হাদীসেরই শেষভাগে আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্‌ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করলাম, ''এয়া রাসূলাল্লাহ্‌! আপনি বিতরের পূর্বে কেন শু'য়ে পড়েন? তিনি এর জবাবে বলেন, 'হে আয়েশা, আমার চোখ দু'টি ঘুমায়, হৃদয় ঘুমায় না।" এ থেকে বুঝা গেলো যে, এ নামায হুযূর-ই আক্‌রাম শেষ রাতে ঘুম থেকে ওঠে সম্পন্ন করতেন। তারাভীহ্‌ শয়ন করার পর পড়া হয় না, তাহাজ্জুদ পড়া হয়।

তিন. যদি এ নামায মানে তারাভীহ্‌র নামায হয়, আর হুযূর-ই আক্‌রাম আট রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ পড়তেন, তাহলে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশ রাক'আত তারাভীহ্‌র হুকুম কেন দিলেন? আর সমস্ত সাহাবীও কেন এ হুকুম মেনে নিলেন? হযরত উম্মুল মু'মিনীনও এসব কিছু দেখে কেন ঘোষণা করলেন না যে, 'আমি হুযূর-ই আন্‌ওয়ারকে আট রাক্‌'আত তারাভীহ্‌ পড়তে দেখেছি, তোমরা কেন বিশ্‌ রাক্‌'আত পড়ছো? এটা তো সুন্নাতের পরিপন্থী, 'বিদ'আত-ই সাইয়্যেআহ্‌!' তিনি কেন নিশ্চুপ রইলেন? একটু হুঁশে আসুন, হাদীস শরীফের সঠিক অর্থ বুঝার চেষ্টা করুন।

ওহাবী-লা মাযহাবীদের প্রতি কতিপয় প্রশ্ন

সমগ্র দুনিয়ার ওহাবীদের প্রতি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করা হলো, সবাই মিলে সেগুলোর জবাব দিন!

বলোতো ঃ

এক. হযরত ওমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বিশ্ রাক্'আত পড়ার হুকুম কেন দিলেন? তাঁদের কি এ সুন্নাতের খবর ছিলোনা? আজ চৌদ্দ শতাধিক বছর পর আপনারা জানতে পারলেন?

দুই. যদি না'উযুবিল্লাহ্, খোলাফা-ই রাশেদীন বিদ্'আত-ই সাইয়্যেআহ্র নির্দেশ দেন, তাহলে সমস্ত সাহাবী বিনা প্রতিবাদে কেন তা কবূল করে নিলেন? তাঁদের মধ্যে কি কেউ সত্য কথা বলার ও সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন না? আজ এতকাল পর আপনারা সত্যবাদী পয়দা হয়ে গেলেন এবং সুন্নাতের অনুসারীও?

তিন. যদি সমস্ত সাহাবীও নিশ্চুপ থাকেন, তবে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা একটা সুন্নাতে রসূলের বিপরীত বিদ্'আত-ই সাইয়্যোহ্র প্রচলন হতে দেখে তিনি কেন নিশ্চুপ রইলেন? তাঁর উপর সত্যের প্রচার ফরয ছিলো কিনা? যেমন আপনারা আজকাল আট রাক'আত তারাভীহ্র জন্য ওঠে পড়ে লেগেছেন, মৌখিক, আন্তরিক, দৈহিক ও আর্থিকভাবে জোর দিচ্ছেন, তিনি তেমনটি করলেন না কেন? তাহলে তো আপনারা হযরত উম্মুল মু'মিনীন থেকেও উত্তম হয়ে গেলেন?

চার. হে লা-মাযহাবী-ওহাবীরা বলুন, ওইসব খোলাফা-ই রাশেদীন এবং সমস্ত সাহাবী, বরং খোদ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ওয়া আনহুম বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়ে, পড়িয়ে কিংবা জারী হতে দেখে নিশ্চুপ র'য়ে কি হিদায়তের উপর ছিলেন, নাকি না'উযুবিল্লাহ্, পথভ্রষ্টতার উপর ছিলেন? যদি আজ হানাফীগণ বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়ার ভিত্তিতে গোমরাহী ও বিদ্'আতী হন, তাহলে ওইসব হযরতের উপর আপনাদের ফাত্ওয়া কি? জবাব দিন!

পাঁচ. যদি বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ বিদ্'আত-ই সাইয়্যেআহ্ হয়, আর আট রাক্'আত তারাভীহ্ হয় সুন্নাত এবং আপনারা বাহাদুরগণ আজ চৌদ্দশতাধিক কাল পরে এসে এ সুন্নাত জারী করে থাকেন, তাহলে বলুন, হেরমাঈন তাইয়্যেবাঈনের সমস্ত মুসলমান, আপনাদের ফাত্ওয়া অনুসারে বিদ্'আতী ও গোমরাহ্ কিনা? আর যদি না হয় তবে কেন? যদি হন, তাহলে আপনারা আজ নজদী-ওহাবীদেরকে এর তাবলীগ কেন করছেন না? আপনাদের ফাত্ওয়া কি শুধু পাক-বাংলা-ভারতে ফ্যাসাদ ছড়ানোর জন্যই?

ছয়. সম্মানিত মুজতাহিদ ইমামগণ এবং তাঁদের সমস্ত অনুসারী, যাঁদের মধ্যে লাখো আউলিয়া, ওলামা, মুহাদ্দিস, ফোক্বাহা ও মুফাস্সিরীন রয়েছেন, যাঁরা সবাই বিশ্ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়তেন, তাঁরা কি সবাই বিদ্'আতী ও গোমরাহ্ ছিলেন?

সাত. যদি এসব হযরত গোমরাহ হন, আর হিদায়তের উপর আপনাদের মুষ্ঠি পরিমাণ দলই থাকে, তাহলে ওই সব পথভ্রষ্টের কিতাবাদি থেকে হাদীস নেওয়া, হাদীস পড়া জায়েয, না কি হারাম? আর তাঁদের বর্ণিত হাদীস সহীহ্ কিনা? যখন মন্দ আমল-বিশিষ্ট লোকের বর্ণিত হাদীস সহীহ্ হয় না, তবে মন্দ আক্বীদা সম্পন্নের হাদীস সহীহ্ কিভাবে হতে পারে?

আট. সমগ্র দুনিয়ার মুসলমান, যাঁরা বিশ রাক্'আত তারাভীহ্ পড়েন, আপনাদের ফাত্ওয়া অনুসারে গোমরাহ্ ও বিদ্'আতী কিনা? যদি তেমনি হয়, তাহলে এ হাদীসের মর্মার্থ কি? اِتَّبِعُوْا السَّوَادَالْاَعْظَمَ অর্থাৎ মুসলমানদের বড় দলের অনুসরণ করো! আর ক্বোরআন-ই করীমে তো আম মুসলমানদেরকে 'শ্রেষ্ঠতম উম্মত' ও 'মানুষের উপর আল্লাহর সাক্ষী' বলেছেন কেন?

আশা করি, লা-মাযহাবী, ওহাবী সম্প্রদায় তাদের নজদ পর্যন্ত গোটা অঞ্চলের ওহাবী-আলিমদের সাথে মিলে এসব প্রশ্নের জবাব দেবেন! আমরা অপেক্ষায় রইলাম ।

আমাদের দাবী!

সমগ্র দুনিয়ার ওহাবী নজদী লা-মাযহাবীদের নিকট আমরা এটা চাই যে, তারা যেন একটি মাত্র সহীহ্, মরফূ' হাদীস, বোখারী, মুসলিম অথবা কমপক্ষে সেহাহ্ সিত্তাহর এমনই হাদীস পেশ করেন, যাতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আট রাক্'আত তারাভীহ্ পড়তেন কিংবা সেটার নির্দেশ দিতেন; কিন্তু 'তারাভীহ্' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে অথবা সাহাবা-ই কেরাম আট রাক্'আত স্থায়ীভাবে পড়েছেন ।

আর আমরা বলে দিচ্ছি- ক্বিয়ামত পর্যন্ত দেখাতে পারবেন না, আপনারা নিছক জেদের উপর রয়েছেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য গ্রহণের তাওফীক্ব দিন। আ-মী-ন! বিশ্ রাক্'আত তারাভীহর প্রমাণ, আলহামদু লিল্লাহ্, হুযূর-ই আক্রামের আমল শরীফ, সাহাবা-ই কেরামের বাণী ও আমল (কর্ম), আম মুসলমানের আমল বা তরীক্বাহ্ এবং শরিয়তসম্মত ক্বিয়াস বা যুক্তি থেকে পাওয়া যায় । সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক ।

মজার ঘটনা!

গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবী যখন কখনো হানাফীদের মধ্যে এসে আটকা পড়ে যায়, তবে তারাভীহ্ বিশ রাক্'আত পড়ে নেয় । এটা অনেকবার দেখা গেছে ও যাচ্ছে । বুঝা গেলো যে, তাদের নিজেদের মাযহাবের উপরও পূর্ণ বিশ্বাস নেই ।

একাদশ অধ্যায়

[খতমে ক্বোরআন মজীদের জন্য আলোকসজ্জা করা উত্তম কাজ]

খতমে ক্বোরআন মজীদের জন্য আলোকসজ্জা করা উত্তম কাজ

মুসলিম সাধারণের মধ্যে এ নিয়ম শুরু থেকে, সাওয়াব লাভ ও কবরে আলো হাসিল করার জন্য এমনিতে প্রচলিত আছে, তবে বিশেষত গোটা রমযান শরীফে কিংবা শবে ক্বদরে এবং ক্বোরআন খতমের রাতে বিশেষ করে মসজিদগুলোতে আলোক সজ্জা এবং অতি জাঁকজমক সহকারে আলো জ্বালানো হয়। মসজিদগুলোকে খুব সাজানো হয়ে। কিন্তু ওহাবী, লা-মাযহাবীদের মসজিদগুলো থাকে আলোহীন। মসজিদগুলোতে আলোকসজ্জা করা ও সেগুলোকে সজ্জিত করার তাওফীক্বটুকু তাদের হয় না। তাদের মতে সাওয়াবের এ কাজগুলো বিদ'আত ও হারাম। এমনকি তারা এগুলোকে শির্ক পর্যন্ত বলে ফেলে। একটি অধ্যায়ের অধীনে আমি এ প্রসঙ্গে বর্ণনাকে দু'টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্থ করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলাগুলোর প্রমাণাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলাগুলোর বিপক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিগুলো ও সেগুলোর জবাব (খণ্ডন) উল্লেখ করেছি। আশা করি, পাঠক সমাজ নিরপেক্ষভাবে গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে সেগুলোর পাঠ-পর্যালোচনা করবেন। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এ প্রয়াসের কবূলিয়াত (গ্রহণযোগ্যতা) প্রার্থনা করছি। আ-মী-ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

মসজিদে আলোকসজ্জার পক্ষে প্রমাণাদি

মসজিদগুলোকে সব সময় আলোকিত রাখা, বিশেষ করে রমযান মাসে, শবে ক্বদরে এবং ক্বোরআন শরীফ খতম করার রাতে আলোকসজ্জা করা উঁচু পর্যায়ের ইবাদত। এর সাওয়াব প্রচূর। এর পক্ষে প্রমাণাদি নিম্নরূপ:

দলীল নং ১

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যাত ক্বোরআন-ই করীমে ইরশাদ করেন-

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ -

তরজমা: নিশ্চয় আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ্ ও ক্বিয়ামত-দিবসের উপর ঈমান আনে। [৯:১২]

তাফসীরকারকগণ বলেন, মসজিদগুলোতে নামাযের জামা'আত কায়েম করা, সেগুলো পরিস্কার রাখা, উন্নত মানের চাটাই কিংবা ফরশ ইত্যাদি বিছানো, সেগুলোতে আলোকসজ্জা করা ইত্যাদি মসজিদের আবাদী বা মসজিদগুলো আবাদ রাখার সামিল। তাফসীর-ই রুহুল বয়ান-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে 'কিব্‌রিয়াত-ই আহমার' (লাল বর্ণের গন্ধক) দ্বারা আলো জ্বালাতেন। এর আলোতে চতুর্দিকে কয়েক মাইল ব্যাপী নারীরা চরখায় সূতা কাটতে পারতো।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, মসজিদগুলোকে রওনক্ব তথা আলোকসজ্জা করা ঈমানের আলামত (চিহ্ন)। সুতরাং এ কথা প্রকাশ থাকে যে, মসজিদগুলোকে আলোহীন ও অনাবাদী রাখা কাফিরদের আলামত।

দলীল নং ২

(হাদীস শরীফ) ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ اَوَّلُ مَنْ اَسْرَجَ فِى الْمَسَاجِدِ تَمِيْمُ الدَّارِىْ

অর্থ: তিনি বলেন, যিনি সর্বপ্রথম মসজিদগুলো চেরাগ জ্বালিয়েছেন, তিনি হলেন- তামীম-ই দারী, সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, মসজিদে আলোকসজ্জা করা সুন্নাতই সাহাবী।

স্মর্তব্য যে, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমানা শরীফে চেরাগের ব্যাপক প্রচলন ছিলো না। জমা'আতের সময় খেজুরের কাঠ জ্বালিয়ে আলোকিত করে নেওয়া হতো, হযরত তামীম-ই দারী সেখানে আলোকসজ্জা করেন।

দলীল নং-৩

আবূ দাউদ শরীফে হযরত উম্মুল মু'মিনীন মায়মূনাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَفْتِنَا فِىْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِئْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ وَكَانَتِ الْاَرْضُ يَوْمَئِذٍ حَرْبًا فَاِنْ لَمْ تَأْتُوْهُ وَتُصَلُّوْا فِيْهِ فَابْعَثُوْا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِىْ قَنَادِيْلِهِ-

অর্থ: তিনি আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমাদেরকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস শরীফ সম্পর্কে হুকুম দিন। তখন হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করলেন, ওই মসজিদে যাও এবং তাতে নামায পড়ো। ওই যুগে শহরগুলোতে যুদ্ধ চলছিলো। সুতরাং তিনি এরশাদ করলেন, যদি তোমরা সেখানে পৌঁছতে না পারো এবং

নামায পড়তে না পারো, তাহলে সেখানে তেল পাঠিয়ে দাও, যাতে ওখানকার ফানুসগুলো (লণ্ঠনগুলো)তে জ্বালানো যায়।

এ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটা মাসআলা প্রতীয়মান হয়-

প্রথমত, বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদে নামায পড়ার জন্য সফর করে যাওয়া সুন্নাত। আমাদের হুযূর-ই আকরাম মি'রাজে সেখানে সমস্ত নবীকে নামায পড়িয়েছেন। খোদ্ হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সমস্ত নবী ও রসূল (পয়গাম্বর) সফর করে সেখানে নামায পড়ার জন্য পৌঁছেছেন।

দ্বিতীয়ত, বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মসজিদে অনেক লণ্ঠন জ্বালানো হতো। এটা 'ক্বানাদীল' (লণ্ঠনসমূহ) বহুবচন এরশাদ করার ফলে প্রতীয়মান হয়।

তৃতীয়ত, মসজিদে আলো জ্বালানোর সাওয়াব ওখানে নামায পড়ার মতোই পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটা অতি উঁচু পর্যায়ের ইবাদত এবং সাওয়াবের কারণ বা মাধ্যম।

চতুর্থত, মসজিদে আলোকসজ্জা করার জন্য দূরবর্তী স্থান থেকে তেল পাঠানো সাহাবা-ই ক্বেরামের সুন্নাত।

দলীল নং ৪: (হাদীস শরীফ)

মুহাদ্দিস ইমাম রাফে'ঈ হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَنَى لِلّٰهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَمَنْ عَلَّقَ فِيْهِ قِنْدِيْلًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتّٰى يَنْطَفِئَ ذٰلِكَ الْقِنْدِيْلُ-

অর্থ: তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার জন্য মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মাণ করবেন। আর যে মসজিদে লণ্ঠন জ্বালাবে, তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা রহমতের দো'আ করবেন, যতক্ষণ না ওই চেরাগ (লণ্ঠন) নিভে যাবে।

বুঝা গেলো যে, মসজিদে আলো জ্বালানো সত্তর হাজার ফেরেশতার দো'আ নেওয়ার মাধ্যম।

দলীল নং ৫ (হাদীস শরীফ)

ইবনে বোখারী হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَلَّقَ فِيْ مَسْجِدٍ قِنْدِيْلًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يَنْطَفِئَ تِلْكَ الْقِنْدِيْلُ-

অর্থঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মসজিদে কোন লণ্ঠন লটকায় তখন তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা রহমতের দো'আ করেন, যতক্ষণ না ওই লণ্ঠন নিভে যায় ।

বুঝা গেলো যে, মসজিদে চেরাগ জ্বালানো যেমন সাওয়াবের কাজ, তেমনি মসজিদে চেরাগ, তেল, অথবা বাতি দেওয়াও সাওয়াবের কাজ- চাই একটা মাত্র চেরাগ হোক অথবা একাধিক (অনেক) ।

দলীল নম্বর ৬ (হাদীস শরীফ)

ইবনে শাহীন মুহাদ্দিস হযরত আবূ ইসহাক্ব হামদানী থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ فِيْ اَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَالْقَنَادِيْلُ تَزْهَرُ وَكِتَابُ اللهِ تُتْلَى فَقَالَ نُوِّرَ اللهُ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فِيْ قَبْرِكَ كَمَا نَوَّرْتَ مَسَاجِدَ اللهِ تَعَالَى بِالْقُرْاٰنِ-

অর্থঃ তিনি বলেন, রমযানের প্রথম রাতে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু (মসজিদে নবভী শরীফে) তাশরীফ নিয়ে গেলেন । তখন মসজিদে নবভী শরীফে অনেক লণ্ঠন আলোয় ঝলমল করছিলো এবং ক্বোরআনের তিলাওয়াত হচ্ছিলো । তখন তিনি বলেন, হে ওমর ইবনুল খাত্তাব! আল্লাহ্ তা'আলা আপনার কবরকে আলোকিত করুন, যেভাবে আপনি আল্লাহর মসজিদগুলোকে ক্বোরআন তিলাওয়াতের সময় আলোকিত করেছেন ।

দলীল নং ৭ (হাদীস শরীফ)

সহীহুল বিহারী শরীফে এমন এক মুহাদ্দিস থেকে বর্ণিত, যার নিকট আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা (রেওয়ায়ত) পৌঁছেছে--اَنَّهُ قَالَ نَوَّرَ اللهُ قَبْرَ عُمَرَ كَمَا نَوَّرَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا

অর্থঃ তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কবর শরীফকে আলোকিত করুন, যেভাবে তিনি আমাদের মসজিদগুলোকে আলোকিত করেছেন ।

এ শেষোক্ত হাদীস শরীফগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রমযান শরীফে মসজিদগুলোতে আলোকসজ্জা করা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যমানা থেকে প্রচলিত হয়েছে । সম্মানিত সাহাবীগণ এর উপর আপত্তি করেননি; বরং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এজন্য তাঁকে দো'আ করেছেন । একথাও প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদের আলো দ্বারা ইন্শাআল্লাহ্, কবর আলোকিত হবে ।

সুতরাং এখন যারা মসজিদে আলোকসজ্জা করতে বাধা সৃষ্টি করে, তারা নেপথ্যে সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাতের বিপক্ষে আপত্তি করে । এ আলোকসজ্জায় বাধা প্রদানকারীগণ তা নিজেদের কবরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে ।

দলীল নং ৮

মহান রব ক্বোরআন মজীদে এ কাজে বাধা প্রদানকারীদের প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন-

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا-

তরজমাঃ এবং তার চেয়ে অধিক যালিম কে, যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে বাধা দেয়, সেগুলোতে আল্লাহর নামের চর্চা হওয়া থেকে, এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রয়াসী হয় ।[২:১১৪]

এ আয়াত শরীফে ওই সব লোককেও তিরস্কার করা হয়েছে, যারা মসজিদগুলোতে নামায, আল্লাহর যিক্র, ক্বোরআন তিলাওয়াত ও না'তখানি করতে বাধা দেয় এবং ওই সব লোককেও তিরস্কার করা হয়েছে, যারা মসজিদেগুলোতে চাটাই-ফরশ বিছাতে এবং আলোক সজ্জা ইত্যাদি করতে বাধা দেয় । কারণ আবাদ করার মধ্যে এসবই রয়েছে ।

বিবেক বা যুক্তির দাবীও এযে, বর্তমান যুগে মসজিদগুলোকে সাজানো, ওখানে সর্বদা কিংবা বিশেষ বিশেষ সময়ে আলোকসজ্জা করা উত্তম । কেননা, আজকাল আমরা আমাদের নিজেদের ঘরবাড়িগুলোকে বিভিন্নভাবে সাজাই, বিবাহ-শাদী ইত্যাদিতে অতিমাত্রায় খোলামনে আলোকসজ্জা করি, আমাদের বাড়ী-ঘর, দালানগুলোকে সাজাই । যখন আমাদের থাকার ঘরগুলো 'সাজসজ্জা' ইত্যাদির উপযোগী, তখন আল্লাহর ঘর যা অন্য সব ঘর থেকে উত্তম সেটাকে আম ঘর-বাড়ি অপেক্ষা বেশী সাজাতে হবে, যাতে মসজিদগুলোর মহত্ব লোকজনের অন্তরগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয় । একাজগুলো বস্তুত মসজিদের প্রতি আমাদের সম্মান দেখানো ও দ্বীন প্রচারের উৎকৃষ্ট মাধ্যম ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার বিপক্ষে আপত্তিকারীদের প্রশ্নাবলী ও সেগুলোর জবাব

গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের দিক থেকে যে পরিমাণ আপত্তি এ পর্যন্ত আমরা শুনেছি, ওইগুলোকে আমরা অতি দ্বীনদারীর (বিশ্বস্ততা) সাথে, সেগুলোর খণ্ডন সহকারে আরয করছি। আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন! আ-মী-ন।

আপত্তি নং ১

মসজিদগুলোতে আলোকসজ্জা করা নিছক অপচয় বৈ-কিছুই নয়। অপচয় করতে ক্বোরআন মজীদ নিষেধ করেছে- মহান রব এরশাদ করেছেন-

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَاتُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

তরজমা: এবং আহার করো ও পান করো এবং সীমাতিক্রম করোনা। নিঃসন্দেহে সীমাতিক্রমকারীদেরকে তিনি পছন্দ করেন না। [৭:৩১, কানযুল ঈমান]

খণ্ডন: মসজিদের আলোকসজ্জাকে অপচয় বলা ভুল। অপচয় বলে ওই ব্যয়কে, যাতে দ্বীনী ও দুনিয়াবী উপকার নেই। মসজিদের সাজসজ্জায় তো মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়, যা ইবাদত ও সাওয়াব লাভের মাধ্যম।

আপত্তি নং ২

যখন একটা চেরাগ থেকে আলো পাওয়া যায়, তখন অন্যান্য চেরাগ তো অকেজো। আর বেকার খরচই তো অপচয়।

খণ্ডন:

যখন একটা মাত্র জামা ও পায়জামায় সতর ঢাকা যায়; তখন উচিত হবে আচকান, ওয়াইজকোট ইত্যাদি পরাও অপচয় হওয়া, বরং হারাম হওয়া। যখন ছয় আনা গজের মোটা কাপড় পরলে সতর ঢেকে যায়, তখন তো দু'টাকা গজের (এক কালীন বাজার দর) মখমল, লংক্লথ, পাতলা কাপড় ও ভয়েল কাপড় পরিধান করা হারাম হওয়া উচিত। যখন দু' আনা মূল্যের চেরাগে ঘর আলোকিত হয়ে যায়, তখন সেখানে শত শত (হাজার হাজার) টাকা খরচ করে বিজলী ফিটিং করানো, গ্যাসের চুলা জ্বালানো, সোলার থেকে প্রাপ্ত আলো জ্বালানোও

অপচয় বরং হারাম হওয়া চাই। যখন থার্ড ক্লাসের বগিতে চড়ে পথ অতিক্রম করা যায়, তখন ইন্টার, সেকেণ্ড কিংবা ফার্স্ট ক্লাসে ভ্রমণের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করাও হারাম হওয়া চাই।

জনাব, একটি প্রদীপ থেকে আলো পাওয়া যায়। বেশী বাতি জ্বালিয়ে মসজিদের সৌন্দর্য বাড়ানোও ইবাদতের সামিল আর সেখানকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাও ইবাদত।

আপত্তি নং ৩

যদি মসজিদে আলোকসজ্জা করা উত্তম কাজ হতো, তবে খোদ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন পবিত্র জীবদ্দশায় মসজিদে নবভী শরীফে আলোকসজ্জা কেন করেন নি? আপনারা কি হুযূর আকরাম থেকেও উত্তম? নাকি দ্বীনের বেশী হামদর্দ? যে কাজ হুযূর-ই আকরাম করেননি, সে কাজ আপনাদের করার কি অধিকার?

খণ্ডন:

যদি ওয়াইজ কোট, আচকান ও উন্নত মানের মখমল কাপড় পরিধান করা ভাল কাজ হয়, তাহলে হুযূর-ই আকরাম তা কেন পরিধান করেনি? যে কাজ হুযূর-ই আকরাম করেননি, ওই কাজ হে ওহাবীরা, কেন করছেন আপনারা? আপনারা নিজেদের ঘরে বিজলী ও গ্যাস কেন জ্বালান?

ওহে জনাব, হুযূর-ই আকরামের যমনা শরীফে লোকজনের ঘরবাড়িও পুরোটা মা'মূলী ছিলো। তখন তো জিহাদগুলোর যমানা ছিলো। তাঁদের অন্য দিকে মনোনিবেশ করার সময়-সুযোগই ছিলোনা। যখন সাহাবা-ই করামের যমানায় লোকেরা তাঁদের ঘরবাড়ি উন্নত মানের তৈরী করেছিলেন, তখন ফক্বীহ্-সাহাবীগণ চিন্তা করলেন- দ্বীন তো দুনিয়া থেকে উত্তম, আর আল্লাহ্র ঘর অর্থাৎ মসজিদে নবভী শরীফ আমাদের ঘর থেকেও উত্তম, যখন আমাদের ঘর উত্তম ও শানদার, তখন আল্লাহ্র ঘর আরো বেশী শানদার হওয়া চাই। এটা চিন্তা করে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে নবভী শরীফকে অত্যন্ত আলীশান করে পুনঃনির্মাণ করান। আর তাতে বহু সুন্দর সুন্দর কারুকার্য করিয়েছিলেন। হুযূর-ই আকরাম এরশাদ করেন-

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ-

(তোমরা আমার ও আমার সাহাবীদের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরো।) হুযূর-ই আকরামের সুন্নাত যেমন আমলযোগ্য; তেমনি হুযূর-ই আকরামের সম্মানিত সাহাবীদের সুন্নাতও আমলযোগ্য। হুযূর-ই আকরামের সাহাবীগণ মসজিদে নবভী শরীফে আলোকসজ্জা করেছেন, বরং খোদ্ হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মসজিদে আলোকসজ্জা করার জন্য তেল পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

আপত্তি নং ৪

আবূ দাউদ শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اُمِرْتُ بِ تَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ قَالَ اِبْنِ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى

অর্থ: তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- আমাকে মসজিদগুলোকে সাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়নি, হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, নিশ্চয় তোমরা তো ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মতো সাজাচ্ছো।

এ হাদীস শরীফ থেকে একথাও প্রতীয়মান হয়েছে, মসজিদগুলোকে সাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়নি। একথাও বুঝা গেলে যে, ইবাদতখানা সাজানো ইহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রথা, মুসলমানদের তরীক্বা (পথ-পদ্ধতি) নয়। প্রকাশ থাকে যে, মসজিদে আলোকসজ্জা করাও মসজিদ সাজানোর নামান্তর মাত্র। সুতরাং এটাও নিষেধ।

খণ্ডন:

এর দু'টি জবাব দেওয়া যায়-

এক. যদিও হাদীসের মর্মার্থ এ হয় যে, মসজিদের সৌন্দর্য বাড়ানো ও সেখানে আলোকসজ্জা করা নিষিদ্ধ, তবে ওই হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে মসজিদগুলোকে সাজাতে, সেগুলোতে আলোকসজ্জা করতে দেখেছেন; অথচ নিষেধ করেননি। তিনি নিজেই নিজের রেওয়ায়তের বিপরীত কাজ করেছেন? তাছাড়া, সমস্ত সম্মানিত সাহাবীও কি এ হাদীসের ওই মর্মার্থ বুঝেন নি, যা তোমরা বুঝেছো? তদুপরি, এমতাবস্থায় তো এ হাদীস শরীফ ক্বোরআন-ই করীমেরও বিপরীত হয়ে যাবে। কারণ, মহান রব মসজিদের সাজসজ্জা ও

মসজিদকে আবাদ রাখাকে ঈমানের আলামত সাব্যস্ত করেছেন। এরশাদ করেছেন-اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ الاٰية (নিশ্চয় মসজিদগুলোকে আবাদ রাখে...। ৯:১৮)

বুঝা গেলো যে, হে লা-মাযহাবী-ওহাবীরা! আপনারা হাদীস শরীফের মর্মার্থ বুঝতে পারেননি! যা বুঝেছেন তা ভুল।

দুই. এখানে প্রতিটি সাজসজ্জা নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং অবৈধ টিপটপের উপর তিরস্কার এসেছে। যেমন ফটো, প্রতিকৃতি দ্বারা সাজানো। এ কারণে ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে উপমা দেওয়া হয়েছে। তাদের উপাসনালয়গুলোকে ফটো ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

অথবা ওই সাজসজ্জা বুঝানো উদ্দেশ্য, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয় না, বরং লোকদেখানো, খ্যাতি লাভ ও রিয়াকারীর জন্য করা হয়; যেমনটি পরবর্তী হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে। কিন্তু যেই সাজসজ্জা ও আলোকসজ্জা শুধু মসজিদের সম্মান ও মহান রবের সন্তুষ্টি লাভের জন্য করা হয়, তা উত্তম কাজ। মহান রব তাঁর ও তাঁর হাবীবের বাণীগুলোর সঠিক অর্থ বুঝার সামর্থ দান করুন!

আপত্তি নং ৫

আবূ দাউদ, নাসাঈ, দারেমী ও ইবনে মাজাহ্য় হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে নিম্ন বর্ণিত, হাদীস উল্লেখ করা হয়-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ-

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হচ্ছে- লোকেরা মসজিদগুলোতে গর্ব-অহংকার করবে।

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মসজিদগুলোর শোভা (সাজসজ্জা) ক্বিয়ামতের আলামত। এ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা রক্ষা করুন!

খণ্ডন

এ হাদীস শরীফের সঠিক মর্মার্থ সেটাই, যা আমি আপত্তি নং ৪-এর জবাবে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ গর্ব-অহংকারের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা, বাবুয়ানা দেখানোর জন্য মসজিদগুলো সাজানো ক্বিয়ামতের আলামত। যেমন এক মহল্লার লোকেরা অন্য মহল্লার লোকদের মোকাবেলায় মসজিদকে কারুকার্য ও সজ্জিত

করে এ বলে তাদেরকে তিরস্কার করা, ''আমাদের মসজিদ তোমাদের মসজিদ থেকে অধিক সজ্জিত।''

জনাব, গর্ব-অহংকার ও 'রিয়া' (লোক দেখানো)'র জন্য নামায পড়াও তো নিষিদ্ধ। সুতরাং এ থেকে একথা অনিবার্য হয় না যে, নিষ্ঠার সাথে নামাযও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে?

অথবা হাদীস শরীফের অর্থ এ যে, ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে লোকেরা মসজিদে গিয়ে আল্লাহর যিক্‌র করার পরিবর্তে দুনিয়াবী কথাবর্তায় লিপ্ত হবে, একে অন্যের মোকাবেলায় বাবুয়ানা দেখাবে। এটা জঘন্য গুনাহ্। আর যদি হাদীস শরীফের ওই অর্থ হয়, যা তোমরা বুঝে নিয়েছো, অর্থাৎ মসজিদের সাজসজ্জা ক্বিয়ামতের আলামত, তাহলেও সেটা দ্বারা একাজের নিষেধ প্রমাণিত হয় না। ক্বিয়ামতের প্রতিটি আলামত মন্দ নয়। যেমন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর অবতরণ এবং ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশও ক্বিয়ামতের আলামত; কিন্তু মন্দ নয়, বরং অতীব বরকতময়।

আপত্তি নং ৬

মসজিদেগুলোতে আলোকসজ্জা করা বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আত পথভ্রষ্টতা।

খণ্ডন

এটা ভুল। একাজ তো সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত, যেমনটি আমি প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। আর যদি এটা বিদ'আতও হয়, তবে প্রত্যেক বিদ'আত না হরাম, না পথভ্রষ্টতা। বোখারী শরীফ ছাপানো বিদ'আত, কিন্তু হারাম নয় বরং সাওয়াব। হাদীসশাস্ত্র ও সেটার প্রকারভেদ বিদ'আত, কিন্তু হারাম নয়।

'বিদ'আত'-এর উত্তম বিশ্লেষণ এ 'জা-আল হক্ব'-এর প্রথম খণ্ডে দেখুন। তাতে প্রমাণ করা হয়েছে যে, আজকাল কলেমা ও নামায, বরং সমস্ত ইবাদতের মধ্যে অনেক বিদ'আত সামিল হয়েছে, এসব বিদ'আতের উপর সাওয়াবই বর্তায়।

---০---

দ্বাদশ অধ্যায়

[শবীনাহ্ পড়া সাওয়াবের কাজ]

শবীনাহ্ পড়া সাওয়াবের কাজ

সবসময় নেক্কার মুসলমানদের মধ্যে এ রেওয়াজ চলে আসছে যে, (রমযান মাসের ২৭ তারিখের রাত কিংবা কম বেশী রাতে পূর্ণ ক্বোরআন মজীদের খতম তারাবীহ্ করা ছাড়াও) এ মাসে তাঁরা শবীনাহ্ পড়েন। তা এভাবে যে, কখনো একরাতে, কখনো দু'রাতে, কখনো তিন রাতে পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ 'তারাবীহ'তে খতম করে থাকেন। কিছু সংখ্যক বুযুর্গ থেকে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা রমযান মাস ছাড়া অন্য মাসেও দৈনিক (কিংবা কোন রাতে কিংবা দিনে) পূর্ণ ক্বোরআন মজীদের তেলাওয়াত করতেন। এ সবই জায়েয ও সাওয়াবের কাজ। তবে এ শর্তে যে, যদি এত তারাতাড়ি না পড়েন, যাতে ক্বোরআনের হরফ (বর্ণ)গুলো সঠিকভাবে উচ্চারণ করা হয় না। এমনও যেন না হয় যে, একেবারে আলসতার সাথে পড়বে।

কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীরা এটাকেও হারাম বলে। রাতভর সিনেমা দেখে এমন লোকদেরকে মন্দ বলে না; কিন্তু সারা রাত ক্বোরআন তিলাওয়াতকারীদেরকে মন্দ বলে, সমালোচনা করে, তাদের বিরুদ্ধে শির্ক-বিদ'আতের ফাতওয়া আরোপ করে। কাজেই, আমি এ সম্পর্কে সপ্রমাণ আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

এ আলোচনার অধ্যায়টির অধীনে দু'টি পরিচ্ছেদ করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে- 'শবীনাহ্'র পক্ষে প্রমাণাদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিগুলো উল্লেখ করেছি এবং সেগুলোর খণ্ডন করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ
শবীনাহ্র পক্ষে প্রমাণাদি

এক রাতে ক্বোরআন খতম করা সাওয়াবের কাজ। এর পক্ষে পবিত্র ক্বোরআন, হাদীসে রাসূল এবং যুক্তির নিরিখে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এমনকি খোদ্ ওহাবীদের বই-পুস্তকেও এর পক্ষে প্রমাণ রয়েছে। দলীলগুলো দেখুন।

এক.

আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআন মজীদে আপন মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উদ্দেশে এরশাদ করেছেন-

يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا نِّصْفَهُ اَوِانْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

তরজমা: হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ করুন, রাতের কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধরাত্রি অথবা তা থেকেও কিছু কম করুন; অথবা এর উপর কিছু বৃদ্ধি করুন। এবং ক্বোরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুন। [সূরা মুয্যাম্মিল: আয়াত- ১-৪, কান্যুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফে হুযূর-ই আকরামকে প্রায় পূর্ণরাত নামায পড়ার হুকুম দিয়েছেন। আর ইসলামের সূচনালগ্নে রাতভর ইবাদত করা ফরয ছিলো; রাতের কিছু অংশ আরাম করার জন্য রাখা হয়েছিলো। তারপর এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর এর ফরয টুকু রহিত হয়ে গেলো, কিন্তু মুস্তাহাব হওয়া এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। এখন যে ব্যক্তি 'শবীনাহ্'তে সমগ্র রাত জাগ্রত থাকবে, খুব কম পরিমাণে শয়ন করবে, সে এ আয়াতানুসারে আমল করলো। তবে উচিত হচ্ছে 'শবীনাহ্' ওই ব্যক্তি পড়বে, যে শুদ্ধভাবে ক্বোরআন মজীদ পড়তে পারে। যেমন 'তারতীল' করার নির্দেশ থেকে প্রতীয়মান হয়।

দুই.

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে খুসূফের (চন্দ্র গ্রহণ) নামাযের উল্লেখ রয়েছে। সেটার কিছুটা নিম্নরূপ:

فَقَامَ قِيَامًا طَوِيْلًا نَحْوًا مِّنْ قِرَاءَةِ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ -

অর্থ: হুযূর-ই আকরাম চন্দ্রগ্রহণের নামাযে অতি দীর্ঘ ক্বিয়াম করেছেন। যেমন সূরা বাক্বারাহ্ পড়ার সমপরিমাণ সময় যাবৎ।

বুঝাগেলো যে, চন্দ্রগ্রহণের নামাযে সূরা বাক্বারা অর্থাৎ আড়াই পারার সমান ক্বিরাআত সম্পন্ন করেছেন। শবীনাহ্য় (প্রথমোক্ত প্রকারে) প্রতি রাক্'আতে দেড় পারা পড়া হয়। যখন এক রাক্'আতে আড়াই পারা পড়ার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তখন দেড় পারা পড়ার পক্ষে অধিকতর উত্তম পর্যায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়।

তিন.

আবূ দাঊদ শরীফে হযরত হোযায়ফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে হুযূর-ই আকরামের তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে এক অতি দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, যার শেষ প্রান্তের শব্দগুলো নিম্নরূপ:

فَصَلّٰى اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِيْهِنَّ الْبَقَرَةَ وَاٰلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ وَالْاَنْعَامَ -

অর্থ: হুযূর-ই আকরাম তাহাজ্জুদের নামায চার রাক'আতে পড়েছেন। ওইগুলোতে সূরা বাক্বারাহ্, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মা-ইদাহ্, সূরা আন্'আম পড়েছেন।

দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের চার রাক্'আতে প্রায় আট পারা পড়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক রাক্'আতে প্রায় দু'পারা পড়েছেন। শবীনার এক প্রকারেতো প্রতি রাক্'আতে এতটুকু ক্বিরাআতও পড়া হয় না, বরং প্রতি রাক্'আতে মাত্র দেড় পারা পড়া হয়। এটা কেন হারাম হবে?

চার.

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের সহীহ্ গ্রন্থে হযরত মুগীরাহ্ ইবনে শো'বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাদীস উদ্ধৃত করেছেন-

قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيْلَ لَهُ لِمَا تَصْنَعُ هَذَا وَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ قَالَ اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا-

অর্থ: হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রাতের নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ ক্বিয়াম করেছেন যে, ক্বদম যুগল মুবারকে পানি এসে গিয়েছিলো। তখন আরয করা হলো, আপনি এত কষ্ট কেন করছেন, আপনার কারণে আপনার উম্মতের পূর্ব ও পরবর্তী গুনাহ্ও ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে? তদুত্তরে তিনি এরশাদ করেছেন, "আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবোনা?"

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, কষ্ট করে ইবাদত করা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত। যদি শবীনাহ্ পড়তে গিয়ে কোন মুসলমানের পায়ে পানি এসে যায় (ফুলে যায়), তবে ওই সৌভাগ্যবানের এ সুন্নাত নসীব হলো। ওহাবীরা নিজেরা তো ইবাদতের সামর্থ্য লাভ করতে পারে না, অন্য লোকদেরকেও ইবাদত করতে নিষেধ করে।

পাঁচ. ত্বাহাভী শরীফে হযরত ইবনে সীরীনের হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে-

قَالَ كَانَ تَمِيْمُ الدَّارِيُّ يُحْيِ اللَّيْلَ كُلَّهُ بِالْقُرْاٰنِ كُلِّهِ فِىْ رَكْعَةٍ

অর্থ: তিনি বলেন, হযরত তামীম-ই দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাতে জাগ্রত থাকতেন, আর এক রাক্'আতে সমগ্র ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে নিতেন।

শবীনায় তো বিশ রাক্'আত তারাবীহতে গোটা ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয়। সাহাবী-ই রসূল হযরত তামীম-ই দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তো এক রাক্'আতে পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করে ফেলতেন।

ছয়.

ত্বাহাভী শরীফে হযরত ইসহাক্ব ইবনে সা'ঈদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসও উদ্ধৃত হয়েছে-

عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِ اَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ رَكْعَةٍ -

অর্থ: তিনি আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক রাক্'আতে পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছেন।

সাত.

হযরত আবূ নু'আঈম 'হুলিয়া'য় হযরত হযরত ওসমান ইবনে আবদুর রহমান তায়মী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ لِىْ اَبِىْ اَغْلِبَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى الْمَقَامِ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الْعَتَمَةَ تَخَلَّصْتُ اِلَى الْمَقَامِ حَتَّى قُمْتُ فِيْهِ فَبَيْنَا اَنَا قَائِمٌ اِذَا رَجُلٌ وَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَىَّ فَاِذَا هُوَ عُثْمَانُ ابْنُ عَفَّانَ فَبَدَأَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَقَرَأَ حَتَّى خَتَمَ الْقُرْاٰنَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اَخَذَ نَعْلَيْهِ فَلَا اَدْرِىْ أَصَلَّى قَبْلَ ذَالِكَ شَيْئًا اَمْ لَا-

অর্থ: আমার পিতা আমাকে বলেছেন, আজ আমি পূর্ণ রাত মাক্বাম-ই ইবরাহীমে জাগ্রত থাকবো। যখন আমি এশার নামায পড়ে নিলাম, তখন মাক্বাম-ই ইবরাহীম-এ পৌঁছলাম। আমি দাণ্ডায়মান ছিলাম, হঠাৎ এক মহান ব্যক্তি আমার পিঠের উপর হাত রাখলেন। তিনি ছিলেন হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি সূরা ফাতিহা থেকে ক্বোরআন পড়তে আরম্ভ করলেন। ব্যাস্, পড়তে রইলেন। শেষ পর্যন্ত পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ পড়ে ফেললেন। তার পর রুকূ' করলেন, সাজদাহ্ করলেন, তারপর আপন পাদুকা যুগল শরীফ তুলে নিলেন। আমি জানিনা তিনি এর পূর্বে নামায পড়েছেন কিনা।

আট.

হযরত আবূ নু'আঈম 'হুলিয়া'য় হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন-

كَانَ اَسْوَدُ يَخْتِمُ الْقُرْاٰنَ فِىْ رَمَضَانَ فِىْ كُلِّ لَيْلَتَيْنِ وَكَانَ يَنَامُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ-

অর্থ: হযরত আস্ওয়াদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাহে রমযানে প্রত্যেক দু'রাতে এক ক্বোরআন খতম করতেন। আর মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমাতেন।

নয়.

ত্বাহাভী শরীফে হযরত হাম্মাদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ উদ্ধৃত হয়েছে-

عَنْ سَعِيْدِبْنِ جُبَيْرٍ اَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِىْ رَكْعَةٍ فِى الْبَيْتِ-

অর্থঃ হযরত সা'ঈদ ইবনে জুবায়র সাহাবী বায়তুল্লাহ্ শরীফে এক রাক্'আতে সমগ্র ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করেছেন।

এ সব ক'টি হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, রাতের বেশীরভাগ জেগে নামায পড়া, প্রতিদিন দীর্ঘ ক্বিয়াম করা- এ পর্যন্ত যে, পায়ে পানি এসে যায়, এক রাক'আতে আড়াই পারা ক্বোরআন তিলাওয়াত করা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত এবং এক রাতে কিংবা দু'রাতে, বরং এক রাক্'আতে সমগ্র ক্বোরআন শরীফ পড়া সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত।

সুতরাং যারা শবীনাহ্কে হারাম, শির্ক কিংবা ফাসেক্বী বলে, তারা গণ্ড মূর্খই।

দশ.

'মিরক্বাত শরহে মিশ্কাত' তিলাওয়াতুল ক্বোরআন শীর্ষক অধ্যায়ে পৃষ্ঠা ৬১৫তে সাহাবা-ই কেরামের নিয়ম এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে-

فَخَتَمَهُ جَمَاعَةٌ فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَرَّةً وَّا خَرُوْنَ مَرَّتَيْنِ وَاٰخَرُوْنَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ وَخَتَمَهُ فِىْ رَكْعَةٍ مِّنْ لَّا يُحْصَوْنَ كَثْرَةً -

অর্থঃ একটা জমা'আত (দল) দিন ও রাতে এক খতম করেছেন, আরেক দল দু'বার, আরেক দল তিন বার, আর এক রাক্'আতে পূর্ণ ক্বোরআন তিলাওয়াতকারী তো অগণিত।

যুক্তির দাবীও এ'যে, শবীনাহ্ হচ্ছে ইবাদত, হারাম নয়। কেননা, ইবাদতের সাওয়াব সেটার কষ্ট অনুসারে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম কালের রোযা, তলোয়ারের যুদ্ধ, কষ্ট সহকারে হজ্জের সাওয়াব বেশী পাওয়া যাবে, শাস্তি হবে না।

সুতরাং এটা কীভাবে হতে পারে যে, মুসলমান মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য সারা রাত নামাযও পড়বে, ক্বোরআন শরীফের তিলাওয়াতও করবে এবং সাওয়াবের পরিবর্তে আযাব (শাস্তি) পাবে? ক্বোরআনের একটা হরফ (বর্ণ) পড়লে দশটি সাওয়াব পাওয়া যায়। সুতরাং আজব কথা হবে যদি পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ পড়লে সাওয়াবের পরিবর্তে উল্টো শাস্তি পায়! হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম মু'জিযা স্বরূপ অতি অল্প সময়ে পূর্ণ যাবূর শরীফ পড়ে ফেলতেন। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এক রাতে ক্বোরআন তিলাওয়াত শেষ করলে যদি আযাব হয়, তবে না'ঊযু বিল্লাহ্ পূর্ণ যাবূর

শরীফ পড়লে কী অবস্থা হবার কথা? ওহাবীদের কথা মতে, হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম গুনাহ্গার হয়ে যেতেন! আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এদেরকে বুঝ শক্তি দান করুন!

মজার কথা

ওহাবীরা তাদের কিতাব 'আরওয়াহ্-ই সালাসাহ্'য় তাদের মতবাদের প্রবক্তা মৌলভী ইসলমাঈল সাহেবের (তথাকথিত) গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন- মৌলভী ইসমাঈল সাহেব আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে ক্বোরআন-ই করীম খতম করতেন। লোকেরাও খোদ তার থেকে এত অল্প সময়ে সমগ্র ক্বোরআন শুনেছে। এখন আমি ওহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করছি- আপনারা আমাদের ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিপক্ষে এজন্যও সমালোচনা করেন এবং তার শানে অশালীন গালিগালাজ করেন যে, তিনি মাহে রমযানে প্রত্যহ দিনে এক খতম এবং রাতে এক খতম ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। (আপনাদের গুরু মৌলভী ইসমাঈল তো আপনাদের কথা মতো আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে এক খতম ক্বোরআন পড়ে নিতেন।) তিনিও ওই একই ধরনের সমালোচনা ও গালিগালাজের উপযোগী কিনা? তিনিও ফাসিক্ব ও ফাজির (পাপাচারী) হলেন কিনা? নাকি আপনাদের ইমাম যা করেন, তা মুবাহ্? জবাব দিন!

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শবীনাহ্র বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খণ্ডন

শবীনাহ্ সম্পর্কে আমি ওই সব আপত্তিও উল্লেখ করছি, যেগুলো লা-মাযহাবী ওহাবীরা করে বেড়ায়। এমনকি ওইসব আপত্তিও উল্লেখ করছি, যেগুলো তারাও আজ পর্যন্ত জানে না। আমরা তাদের পক্ষে ওকালতি করছি বৈ-কি? তবে সেগুলোর জবাব বা খণ্ডন সহকারে উল্লেখ করছি। মহান রব কবূল করুন! আ-মী-ন!

আপত্তি- ১.

ক্বোরআন করীম এরশাদ করছে-

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا-

তরজমা: ক্বোরআন শরীফের তিলাওয়াত থেমে থেমে করো। [সূরা মুয্যাম্মিল]

আর প্রকাশ থাকে যে, যখন প্রত্যেক রাক্'আতে দেড় পারা পড়ে সমগ্র ক্বোরআন শরীফ এক রাতে খতম করা হবে, তবে তো হাফেয সাহেবকে খুব দ্রুত পড়তে হবে, যার ফলে 'ইয়া'লামূ-ন' 'তা'লামূ-ন' ব্যতীত বুঝাই যাবে না। সুতরাং শবীনাহ্ পড়া পবিত্র ক্বোরআনের নির্দেশের বিরোধী।

খণ্ডন

এ আপত্তির দু'টি জবাব দেওয়া যায়-

এক. আপনাদের মতবাদের প্রবর্তক মৌলভী ইসমাঈল আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ পড়ে নিতেন বলে আপনারা দাবী করেছেন। বলুন, তিনি কি থেমে থেমে পড়তেন, না 'ইয়া'লামূ-ন', 'তা'লামূ-ন' পড়তেন? তিনি হারামের সম্পাদনকারী ছিলেন কিনা? হযরত দাঊদ আলায়হিস্ সালাম অতি অল্প সময়ে গোটা যবূর শরীফ পড়ে ফেলতেন। হযরত ওসমান গণী, হযরত তামীম-ই দারী এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় সাহাবী এক রাক'আতে গোটা ক্বোরআন শরীফ পড়েছেন। খোদ হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের এক রাক্'আতে দু'পারা এবং 'খুসূফ' (চন্দ্রগ্রহণ)-এর নামাযে এক রাক্'আতে আড়াই

পারা তিলাওয়াত করতেন। এগুলোর বরাত প্রথম পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। আপনাদের এ আপত্তিও ওই সব হযরতের বেলায় প্রযোজ্য কিনা? যদি না হয়, তবে কেন হবে না?

দুই. মহান রব কাউকে রসনায় এমন শক্তি দিয়েছেন যে, তাঁরা তাড়াতাড়ি পড়তেও পারেন, পরিষ্কার ও সুস্পষ্টভাবেও পড়তে পারেন। কারো কারো মধ্যে এ ক্ষমতা নেই। তারা যদি দ্রুত পড়ে, তবে শুধু 'ইয়া'লামূ-ন', 'তা'লামূ-ন'ই বুঝা যাবে। শবীনাহ্ শুধু প্রথমোক্ত প্রকারের হাফিযগণই পড়বেন। দ্বিতীয় প্রকারের হাফিযগণ কখনো পড়বেন না। এ আয়াত শরীফের সমার্থও এটাই। আয়াত শরীফ আপন জায়গায় ঠিক আছে। হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং ওই সব বুযুর্গ সাহাবা-ই কেরামের আমল শরীফ, যাঁরা এক রাক্'আতে অতি দীর্ঘ তিলাওয়াত করেছেন, তাঁরাও আপন জায়গায় ঠিক আছেন।

আপত্তি- ২.

তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারেমী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা) থেকে হাদীস শরীফ বর্ণিত, যা মিশকাত শরীফ: বাবু তিলাওয়াতিল ক্বোরআন-এ উল্লেখ করা হয়েছে-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فِيْ اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ-

অর্থ: নিশ্চয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কম সময়ে ক্বোরআন খতম করবে, সে (ক্বোরআন) বুঝবে না।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, তিন দিনের কম সময়ে পূর্ণ ক্বোরআন শরীফ পড়া মোটেই উচিত হবে না। সুতরাং 'শবীনাহ্' একেবারে নিষিদ্ধ।

খণ্ডন

এ আপত্তিরও কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. হাদীসটা আপনাদেরও বিরোধী। আপনারা তো তিন রাতের শবীনাহ্কেও হারাম বলে থাকেন। আর এ হাদীসে সেটার অনুমতি পাওয়া গেলো।

দুই. আপনাদের পেশোয়া মৌলভী ইসমাঈল দেহলভী আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়ে ক্বোরআন শরীফ খতম করে নিতেন। তিনিও এর আওতায় এসে যাচ্ছেন। তার সাফাই পেশ করো। তখন আপনাদের যা জবাব হবে, তা আমাদেরও হবে।

তিন. এ হাদীস শরীফে সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাধারণ মানুষের কথা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সাধারণ হাফেযগণ যদি এক কিংবা দু'দিনে ক্বোরআন খতম করেন, তবে বুঝা যাবে না। কিছু সংখ্যক বান্দা, যাঁরা এর ক্ষমতা রাখেন, তাঁরা এ হুকুম (বিধান)-এর বাইরে। যেমন হযরত ওসমান প্রমুখ সাহাবা-ই কেরাম এক রাক্'আতে সম্পূর্ণ ক্বোরআন খতম করতেন। এ কারণেই এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 'মিরক্বাত' ও 'লুম'আত' শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন কোন বুযুর্গ এক দিন ও রাতে তিন খতম ক্বোরআন পড়তেন; কোন কোন বুযুর্গ আট খতম পড়তেন। আর শায়খ আবূ মাদ্য়ান মাগরেবী এক দিন ও রাতে সত্তর হাজার ক্বোরআন খতম করে নিতেন। তিনি একবার 'হাজরে আসওয়াদ'-এ চুমু খেয়ে কা'বা-ই মু'আয্যমার দরজা পর্যন্ত আসতে আসতে এক খতম ক্বোরআন পড়ে নিয়েছেন। আর লোকেরা অক্ষরে অক্ষরে তা শুনেছেন। [মিরক্বাত: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৬, বাবু তিলাওয়াতিল ক্বোরআন]

আর সঠিক অভিমত হচ্ছে-

وَالْحَقُّ اَنَّ ذَالِكَ تَخْتَلِفُبِاَشْخَاصٍ -

অর্থাৎ এ হুকুম বিভিন্ন লোকের অবস্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন।

আপত্তি - ৩.

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসিলম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যার শেষভাগের শব্দাবলী নিম্নরূপ:

وَاقْرَأْفِىْ كُلِّسَبْعٍ لَيَالٍ وَلَاتَزِدْ عَلَى ذَالِكَ- (مشكوة: صوم تطوع)

অর্থ: প্রতি সপ্তাহে ক্বোরআনের এক খতম করো; এর বেশী করো না।

দেখুন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর হুযূর আকরামের দরবারে দ্রুত খতম করার অনুমতি চেয়েছেন। আর হুযূর-ই আকরাম প্রথমে তো নির্দেশ দিয়েছেন, এক মাসে এক খতম করো, বার বার আরয করায় এরশাদ করলেন, এক সপ্তাহের কম সময়ে ক্বোরআন খতম করা উচিত হবে না। সুতরাং শবীনাহ্ নিষেধ।

খণ্ডন

সরকার-ই দু'আলমের এ জবাব সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অবস্থানুসারেই। তিনি এক কিংবা দু'রাতে খতম করলে স্পষ্টভাবে হয়তো পড়তে পারতেন। অথবা এখানে সব সময়ের তিলাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি প্রতিদিন প্রতিটি মানুষ এক খতম ক্বোরআন পড়ে, তবে পার্থিব কাজ-কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। আর যদি

বছরে এক/আধ দিনে ক্বোরআন খতম করা হয়, তাহেল কোন ক্ষতি নেই। যেসব সাহাবী একেক রাক্'আতে এক খতম ক্বোরআন পড়েছেন, তাঁদের এ হাদীস সম্পর্কে জানা ছিলো, তবুও তাঁরা এক রাক্'আতে খতম করতেন।

আপত্তি- ৪.

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো এক বা দু'রাতে পূর্ণ ক্বোরআন পড়েননি। সুতরাং শবীনাহ্ বিদ'আত। আর বিদ'আত থেকে বাঁচা উচিত।

খণ্ডন

হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক রাতে পূর্ণ ক্বোরআন না পড়ার কারণ দু'টিঃ

একটি কারণ হলো তাঁর পবিত্র জীবদ্দশা শরীফের প্রথম ভাগে পূর্ণ ক্বোরআন নাযিল হয়নি। ওফাত শরীফের কিছু দিন পূর্বে ক্বোরআন নাযিল হওয়া পূর্ণ হয়েছে। সুতরাং তখন ক্বোরআন খতম করার প্রশ্নই উঠে না।

দ্বিতীয়ত তিনি নিজের উম্মতের উপর দয়া করেছেন, যাতে শবীনাহ্ পড়া তাদের উপর জরুরী সুন্নাত না হয়ে যায়। অতঃপর সাহাবা-ই কেরাম শবীনাহ্ পড়েছেন। যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তারাবীহ্ সব সময় পড়েননি। তারপর সাহাবীগণ নিয়মিতভাবে যথানিয়মে জামা'আত সহকারে তারাবীহ্ পড়েছেন। শবীনাহ্ও সুন্নাতে সাহাবাহ্। এতদনুসারে আমল করলে ইনশা-আল্লাহ্ ওই সাওয়াব পাওয়া যাবে, যা রসূল আকরামের সুন্নাত অনুসারে আমল করলে পাওয়া যায়। সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাতকে বিদ'আত বলে নিষেধ করা ওহাবীদেরই জন্য শোভা পায়। আমরা আহলে সুন্নাত তেমনটি বলতে পারি না।

আপত্তি- ৫.

আজকাল 'শবীনাহ্'র অবস্থা এযে, এদিকে হাফেয তিলাওয়াত করছেন, অন্যদিকে মুক্বতাদীদের মধ্যে কেউ মুঘাচ্ছে, কারো তন্দ্রা এসেছে, কেউ কেউ অলসভাবে বসে আছে। এতে ক্বোরআন-ই করীমের প্রতি বেয়াদবী প্রদর্শন করা হয়। এ কারণে শবীনাহ্ বন্ধ হয়ে যাওয়া চাই।

খণ্ডন

এটা নিছক মিথ্যা অপবাদ। শবীনাহ্য় কিছু লোক নিয়ম মাফিক ক্বোরআন শোনার জন্য আসেন। তারা দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে শোনেন। কেউ কেউ অবশ্য নিছক শবীনাহ্ দেখার জন্য আসে। তারা শুয়ে-বসে থাকতে পারে। তাতে কোন অসুবিধা হয় না। ক্বোরআন শোনা ফরযে কিফায়াহ। কেউ কেউ শুনলে যথেষ্ট হয়। আর যদি অসম্ভব কল্পনায়, একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, সমস্ত মুসলমান অলসতা সহকারে শোনে, তাহলে অলসতা দূরীভূত করতে চেষ্টা করুন, শবীনাহ্ বন্ধ করে দেবেন না। আজকাল বিয়ে-শাদীতে অনেক ধরনের গুনাহ্র কাজ করা হয়। নাচ, তামাশা, বাদ্য-বাজনা ও আতিশবাজি- সব কিছু হচ্ছে। অনুগ্রহ করে বিয়ে বন্ধ করে দিওনা; বরং ওইসব পাপকাজ বন্ধ করার চেষ্টা করো। হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যমনায় কা'বা শরীফে বোত-প্রতিমা ছিলো। তখন হুযূর-ই আকরাম কা'বা শরীফ ভেঙ্গে দেননি, বরং যখন মহান রব ক্ষমতা দিয়েছেন, তখন বোত-প্রতিমাগুলো বের করে দিয়েছেন। যদি মসজিদে কুকুর ঢুকে পড়ে, তখন মসজিদ ভেঙ্গে ফেলবেন না, কুকুর বের করে দিন। যদি চৌকিতে ছারপোকা, কাপড় ও মাথায় উকুন হয়ে যায়, তখন ছারপোকা ও উকুন মেরে ফেলুন। খাট, কাপড় ও চুলগুলোকে আগুনে জ্বালিয়ে ফেলবেন না। ওহাবীদের এ আজব নিয়ম যে, ইবাদতগুলোর ক্ষেত্রে মন্দগুলো দূর করার পরিবর্তে খোদ্ ইবাদতকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এ সব লোক এ ধরনের বাহানা-অজুহাত দ্বারা সমস্ত উত্তম ও সাওয়াবের কাজে বাধা দিতে চায়। যেমন মীলাদ শরীফ ও বুযুর্গানে দ্বীনের খতমগুলো ইত্যাদি। যদি সুন্নী ভাইয়েরা আমাদের এ জবাব বা খণ্ডনগুলো স্মরণ রাখেন, তবে ইনশাআল্লাহ্, ওহাবীদের ফিৎনাগুলো থেকে বাঁচতে পারবেন।

আমি শবীনাহ্র মাসআলায় কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা এজন্য করলাম যে, আজকাল ওহাবীরা এর পেছনে ব্যাপকভাবে উঠেপড়ে লেগেছে। যেখানে রমযান শরীফ কিংবা অন্য সময়ে শবীনাহ্র আয়োজন করা হয়, সেখানে দেওবন্দী, লা-মাযহাবী ওহাবীরা এর সাথে হারাম-শির্কের ফাতওয়া জুড়ে দেয়। আল্লাহ্ হিফাযত করুন। আ-মী-ন!

---o---

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[জমা'আত চলাকালে ফজরের সুন্নাত পড়া প্রসঙ্গে]

জমা'আত চলাকালে ফজরের সুন্নাত পড়া প্রসঙ্গে

ফিক্বহ্ শাস্ত্রের মাসআলা হচ্ছে-'যদি কেউ ফজরের সময় মসজিদে তখনই আসলো, যখন ফজরের নামাযের জামা'আত চলছে, আর সেও ফজরের সুন্নাত পড়ে নি, এমতাবস্থায় তার উচিৎ হবে জমা'আত থেকে কিছু ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ফজরের সুন্নাত পড়া; তবে এ শর্তে যে, যদি সুন্নাত পড়ার পর জমা'আত পাবার দৃঢ় আশা থাকে। যদি ইমামের সাথে 'আত্তাহিয়্যাত'-এ সামিল হবার আশা থাকে তবুও ফজরের সুন্নাত পড়ে নেবে।

কিন্তু ওহাবী, লা-মাযহাবী, গায়র মুক্বাল্লিদগণ এর ঘোর বিরোধিতায় নেমে পড়েছে। এমনকি এ মাস্আলার কারণে তারা ইমাম-ই আ'যম হযরত আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিপক্ষে অশালীন মন্তব্য পর্যন্ত করে থাকে। আর তারা বলে বেড়াচ্ছে- এমন অবস্থায় ফজরের সুন্নাত ছেড়ে দেবে এবং জমা'আতে সামিল হয়ে যাবে। আমি অতি নিষ্ঠার সাথে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এ মাসআলা দু'টি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করছিঃ প্রথম পরিচ্ছেদে হানাফী মাযহাবের প্রমাণাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও আপত্তি উল্লেখ করে সেগুলোর জবাব দিয়েছি ও খন্ডন করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ববূল করুন!

প্রথম পরিচ্ছেদ

দলীল নম্বর -১

ইমাম আবূ জা'ফর ত্বাহাভী তাঁর 'ত্বাহাভী শরীফ'-এ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তা নিম্নরূপঃ

عَنْ اَبِيْهِ حِيْنَ دَعَاهُمْ سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ دَعَا اَبَا مُوْسٰى وَحُذَيْفَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّىَ الْغَدَاةَ ثُمَّ خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِهٖ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَجَلَسَ عَبْدُ اللهِ اِلَى اُسْطُوَانَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَصَلّٰى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ তিনি তাঁর পিতা হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন তাঁদেরকে হযরত সা'ঈদ ইবনে 'আস ডাকলেন, তখন তিনি হযরত আবূ মূসা, হযরত হুযায়ফা ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদকে ডাকলেন ফজরের নামায পড়ার পূর্বক্ষণে। এ হযরতগণ হযরত

সা'ঈদ ইবনে আসের নিকট থেকে ফিরে গেলেন; অথচ তখন ফজরের নামাযের জামা'আত আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। হযরত ইবনে মাস্'ঊদ মসজিদের একটি স্তম্ভের নিকট বসে গেলেন। অতঃপর সেখানে দু' রাক্'আত নামায পড়লেন, তারপর নামাযে শামিল হয়ে গেলেন।

দেখুন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ, যিনি ফক্বীহ্ সাহাবী, হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী ও হযরত হুযায়ফার উপস্থিতিতে ফজরের নামাযের জমা'আত আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও প্রথমে ফজরের সুন্নাত পড়েছেন, তারপর জমা'আতে সামিল হয়েছেন। এ জন্য না ওই দু'জন সাহাবী কোন আপত্তি করেছেন, না অন্য কোন নামাযী (দ্বিমত পোষণ করেছেন)। বুঝা গেলো যে, সমস্ত সাহাবীর আম নিয়ম এ-ই ছিলো যে, ফজরের নামাযের জমা'আত চলাকালে প্রথমে ফজরের সুন্নাত পড়তেন, তারপর জমা'আতে সামিল হতেন। বস্তুত সাহাবা-ই কেরাম, হুযূর-ই আক্রামের হুকুম ব্যতীত এমনটি করতে পারেন না। মোটকথা, এমনটি করা সুন্নাত-ই সাহাবা।

দলীল নম্বর-২

এ-ই ত্বাহাভী শরীফে হযরত আবূ মিজলায রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِىْ صَلٰوةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْاِمَامُ يُصَلِّىْ فَاَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَدَخَلَ فِى الصَّفِّ وَاَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْاِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْاِمَامُ قَعَدَ ابْنُ عُمَرَ مَكَانَهٗ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ

অর্থঃ তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের সাথে মসজিদে গেলাম, এমতাবস্থায় যে, ইমাম নামায পড়াচ্ছিলেন। হযরত ইবনে ওমর তো কাতারে প্রবেশ করলেন; কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস প্রথমে দু'রাক্'আত সুন্নাত পড়েছেন, তারপর ইমামের সাথে নামাযে সামিল হয়েছেন। অতঃপর যখন ইমাম সালাম ফেরালেন, তখন হযরত ইবনে ওমর সেখানেই বসে রইলেন। যখন সূর্য- উদিত হলো, তখন তিনি দু'রাক্'আত নামায পড়লেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, যিনি বড় ফক্বীহ্ সাহাবী এবং হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এবং সমস্ত সাহাবীর উপস্থিতিতে ফজরের জমা'আত চলাকালে প্রথমে দু'রাক্'আত সুন্নাত সম্পন্ন করে জমা'আতে সামিল হয়েছেন। কেউ তাঁর বিপক্ষে আপত্তি করেননি।

দলীল নম্বর-৩

এ ত্বাহাভী শরীফে হযরত আবূ ওসমান আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ جَآءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَالْاِمَامُ فِى صَلٰوةِ الْغَدَاةِ وَلَمْ يَكُنْ صَلّٰى الرَّكْعَتَيْنِ فَصَلّٰى ابْنُ عَبَّاسٍ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْاِمَامِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُمْ

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস মসজিদে এমতাবস্থায় এসেছেন যে, ইমাম ফজরের নামাযে ছিলেন। আর হযরত ইবনে আব্বাস তখনো ফজরের সুন্নাত পড়েননি। তখন তিনি ইমাম থেকে পেছনে সরে গিয়ে দু' রাক্'আত (সুন্নাত) পড়লেন। তারপর তাঁদের সাথে সামিল হয়েছেন।

দলীল নম্বর-৪

ত্বাহাভী শরীফে হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهٖ فَاُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِى الطَّرِيْقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ

অর্থ: তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা আপন ঘর থেকে বের হলেন। ওদিকে ফজরের নামাযের তাকবীর হয়ে গেছে। তখন তিনি মসজিদে আসার পূর্বেই দু' রাক্'আত সুন্নাত পড়ে নিলেন; অথচ তিনি রাস্তায় ছিলেন। তারপর মসজিদে আসলেন এবং লোকদের সাথে ফজরের নামায পড়েছেন।

দলীল নম্বর-৫

ত্বাহাভী শরীফে হযরত আবূ ওবায়দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

عَنْ اَبِى الدَّرْدَآءِ اَنَّهٗ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِى الصَّلٰوةِ ـ

অর্থ: হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, এমতাবস্থায় যে, লোকেরা ফজরের নামাযে কাতারবন্দি হচ্ছিলেন। তখন তিনি মসজিদের এক কোণায় দু' রাক্'আত নামায পড়ে নিতেন। তারপর লোকদের সাথে ফজরের নামাযে সামিল হতেন।

দলীল নম্বর-৬

ত্বাহাভী শরীফে হযরত আবূ ওসমান নাহদী থেকে রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত,

قَالَ كُنَّا نَأْتِىْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبْلَ اَنْ نُصَلِّىَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ فَنُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ فِىْ آخِرِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ نَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِىْ صَلَوَاتِهِمْ

অর্থ: তিনি বলেন, আমরা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট ফজরের সুন্নাত পড়ার পূর্বে আসতাম এমতাবস্থায় যে, হযরত ওমর নামায পড়াচ্ছিলেন। তখন আমরা মসজিদের শেষ প্রান্তে ফজরের সুন্নাত পড়ে নিতাম। তারপর লোকদের সাথে নামাযে সামিল হয়ে যেতাম।

দলীল নম্বর- ৭

ত্বাহাভী শরীফে হযরত ইয়ূনুস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ يُصَلِّيْهِمَا فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ

অর্থ: ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলছিলেন, ফজরের সুন্নাত মসজিদের এক পাশে গিয়ে পড়ে নেবে, তারপর লোকদের সাথে তাদের নামাযে সামিল হয়ে যাবে।

দলীল নম্বর-৮

ত্বাহাভী শরীফে হযরত নাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

يَقُوْلُ اَيْقَظْتُ ابْنَ عُمَرَ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقَامَ فَصَلّٰى الرَّكْعَتَيْنِ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত করলাম এমতাবস্থায় যে, ফজরের নামাযের তাক্বীর (ইক্বামত) হচ্ছিলো। তখন তিনি প্রথমে ফজরের সুন্নাত পড়ে নিলেন।

দলীল নম্বর-৯

ত্বাহাভী শরীফ হযরত ইমাম শা'বী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

كَانَ مَسْرُوْقٌ يَجِىْءُ اِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ

অর্থ: হযরত মাসরূক্ব লোকজনের নিকট আসতেন, যখন তারা ফজরের নামাযে মশগূল থাকতেন। আর তখনও হযরত মাসরূক্ব ফজরের সুন্নাত পড়েননি। তখন তিনি মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে দু' রাক্'আত সুন্নাত পড়ে নিতেন। তারপর লোকদের সাথে নামাযে সামিল হতেন।

দলীল নম্বর-১০

ত্বাহাভী শরীফ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করে-

اَنَّهٗ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْاِمَامُ فِى الصَّلٰوةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

অর্থ: হযরত আবূ মূসা আশ্'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে আসলেন এমতাবস্থায় যে, ইমাম নামাযে ছিলেন। তিনি প্রথমে দু' রাক্'আত সুন্নাত পড়েছেন।

এ দশটা হাদীস নমুনা স্বরূপ পেশ করা হলো; অন্যথায় এ প্রসঙ্গে বহু রেওয়াতে (হাদীস শরীফ) রয়েছে। যদি আগ্রহ থাকে তবে ত্বাহাভী শরীফে পড়ে নিন।

যুক্তির দাবী

এমতাবস্থায় ফজরের সুন্নাত প্রথমে পড়া চাই। তারপর জমা'আতে শরীক হওয়া সমাচীন হবে। কেননা, সমস্ত মুআক্কাদাহ্ সুন্নাতের মধ্যে ফজরের সুন্নাতের প্রতি বেশি তাকীদ এসেছে। এমনকি মুসলিম, বোখারী, আবূ দাঊদ, তিরমিযী ও নাসাঈ শরীফে মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত-

দলীল- নম্বর ১১-১৫

لَمْ يَكُنِ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى شَىْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ اَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلٰى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যত যত্নবান ও পাবন্দী ফজরের সুন্নাতের প্রতি করতেন, ততটুকু অন্য কোন সুন্নাতের প্রতি করতেন না। আর ইমাম আহমদ, ইমাম ত্বাহাভী ও ইমাম আবূ দাঊদ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

দলীল নম্বর-১৬-১৮

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ لَا تَدَعُوْا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ وَاِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ফজরের সুন্নাত বর্জন করোনা যদিও তোমাদেরকে শত্রুদের সৈন্যদল তাড়া করে।

মোটকথা, ফজরের সুন্নাতের প্রতি খুব তাকীদ এসেছে আর যদি ফজরের সুন্নাত অনাদায়ী থেকে যায় এবং ফজরের ফরয পড়ে নেওয়া হয়, তবে ওই নামাযের ক্বাযা হয় না। যোহরের নামাযের সুন্নাত তো ফরযের পর পড়ে নেওয়া যায়। এদিকে জামা'আতও ওয়াজিব। যদি এ লোক ফজরের সুন্নাতের কারণে জমা'আত ছেড়ে দেয়, তাহলে ওয়াজিব বর্জন করলো, আর যদি জমা'আতের কারণে ফজরের সুন্নাত ছেড়ে দেয়, তাহলে সে এত গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্ ছেড়ে দিলো। সুতরাং এ দু'টি থেকে কোনটাই ছাড়বে না। যদি জমা'আত পেয়ে যাবার দৃঢ় আশায় করা যায়, তবে প্রথমে ফজরের সুন্নাত পড়ে নেবে, তারপর জমা'আতে শামিল হবে। দু' ইবাদত করা উত্তম। একটাকে ছেড়ে দেওয়া উত্তম কাজ নয়।

এও স্মরণ রাখা দরকার যে, যেখানে জমা'আত আরম্ভ হচ্ছে, সেখানেই সুন্নাত পড়া নিষিদ্ধ; কারণ তাতে জমা'আতের বিরোধিতা ও তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হবে, সুতরাং এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়বে যেখানে জমা'আতে সামিল রয়েছে বলে মনে হয় না; যেমন মসজিদের এক কোণে অথবা অন্য কোন অংশে দাঁড়াবে।

উল্লেখ্য, যোহরের পূর্বেকার সুন্নাত (চার রাক্'আত) সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্; কিন্তু ফরযের পরক্ষণে পড়ে নেওয়া যাবে। আসর ও এশার ফরযের পূর্বেকার সুন্নাতগুলো মুআক্কাদাহ্ নয়। এজন্য ওইগুলো জমা'আত চলাকালে পড়া যাবে না। ফজরের সুন্নাত দু' রাক্'আত সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্ও। তবুও ফজরের ফরযের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত এ দু' রাক্'আত পড়া যাবে না। এ কারণে যদি জমা'আত পেয়ে যাবার আশা করা যায়, তবে সুন্নাত দু' রাক্'আত পড়ে নেবে; কিন্তু যদি জমা'আত পাবার আশা করা না যায়, তবে ফজরের সুন্নাত ছেড়ে দেবে। কারণ জমা'আত ওয়াজিব। ওয়াজিব সুন্নাত অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলায় বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন

এ পর্যন্ত এ মাসআলায় আমরা যে পরিমাণ আপত্তির কথা জানতে পেরেছি, সেগুলো জবাব বা খন্ডন সহকারে অতি নিষ্ঠার সাথে আরয করছি। যদি আরো কিছু আপত্তি আসে, আর আমরাও জানতে পারি, তবে ইনশা-আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলোরও জবাব দেবো এবং খন্ডন করবো।

আপত্তি -১.

ত্বাহাভী শরীফ ও অন্যান্য কিতাবে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَلَا صَلٰوةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি এরশাদ করেন, যখন নামাযের জন্য তাকবীর বলা হয়, তখন ফরয ব্যতীত কোন নামায নেই।

এ হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হলো যে, ফজরের নামাযের তাকবীর (ইক্বামত) হয়ে যাওয়ার পর সুন্নাত পড়া এ হাদীসের স্পষ্ট বিরোধিতা। কেননা, তাকবীর হয়ে যাবার পর শুধু ফরয নামাযই পড়া চাই।

খন্ডন

এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়ঃ

এক. এ হাদীস (যা আপনারা উপস্থাপন করে আপত্তি করছেন) আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, আপনারাও বলে থাকেন যে, ফজরের তাকবীর হয়ে গেলে আপন ঘরে কিংবা মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথাও সুন্নাত পড়ে নাও। যদি ওই জায়গা মসজিদের একেবারে সংলগ্ন হয়, যেখানে পর্যন্ত ইমামের ক্বিরাআতের আওয়াজ পৌঁছে এবং জামা'আত ওখান থেকে দেখা যায়, তাহলে আপনারা যে জবাব দেবেন, ওই জবাব আমাদেরও হবে। (অর্থাৎ সুন্নাত পড়লেও ক্ষতি নেই।)

দুই. যদি কেউ ফজরের সুন্নাত অথবা অন্য কোন ফরয জামা'আত আরম্ভ হবার আগে আরম্ভ করে দেয়, আর মধ্যভাগে ফজরের জমা'আত আরম্ভ হয়ে যায়, তবে

আপনারাও ওই নামায ভঙ্গ করা ওয়াজিব নয় বলে ফাত্ওয়া দিয়ে থাকেন; বরং এটা জায়েয বলে থাকেন যে, এ নামায শেষ করে জামা'আতে সামিল হয়ে যাবে; অথচ এ হাদীসে কোন তাফসীল নেই। সুতরাং এ হাদীস যেন 'মুজমাল' (তাফসীলবিহীন), যা অনুসারে তাফসীল ব্যতীত আমল করা সম্ভবপর নয়।

তিন. এ হাদীস-ই মারফূ' সহীহ পর্যায়ের নয়। সহীহ হচ্ছে এটাই যে, হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিজস্ব বাণী, যেমন এখানে ত্বাহাভী শরীফে অত্যন্ত গবেষণালব্দ পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন। আর আমিও প্রথম পরিচ্ছেদে প্রমাণ করেছি যে, ফক্বীহ্-সাহাবীগণ ফজরের সময় ফজরের সুন্নাত পড়েই জামা'আতে শরীক হতেন। সুতরাং তাঁদের আমল ও কথা (عمل و قول) হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কথার উপর প্রাধান্য পাবে।

চার. এ হাদীস অনুসারে সবাই আমল করতে পারে না। কেননা, 'সাহেবে তারতীব' (যার উপর নামাযের তারতীব ফরয) যদি তার এশার নামায ক্বাযা হয়ে যায়; এদিকে ফজরের জামা'আত দাঁড়িয়ে যায়, তখন তো সে প্রথমে এশার নামাযের ক্বাযা করবে, তারপর জামা'আতে শরীক হবে; অন্যথায় তারতীবের বরখেলাফ হবে।

পাঁচ. যদি এ হাদীস মারফূ'-ই সহীহ্ হয়, তবে সেটার অর্থ এটাই হবে- ফজরের তাকবীরের সময় জামা'আতের স্থান অর্থাৎ কাতারের সাথে মিলিত হয়ে ফজরের সুন্নাত পড়বে না; বরং মসজিদের এক কোণায় জামা'আত থেকে পৃথক হয়ে পড়বে। যাতে উপরোল্লেখিত মন্দগুলো অনিবার্য হয়ে না যায়। হানাফী মাযহাবের ইমাম ও অনুসারীরা তো এটাই বলে থাকেন যে, জামা'আত সংলগ্ন হয়ে ফজরের সুন্নাত কখনো পড়বে না।

ছয়. বায়হাক্বী শরীফে এ হাদীস শরীফ এভাবে বর্ণিত বা উল্লেখ করা হয়েছে-

اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلٰوةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ اِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ - [از حاشيئه طحاوى)

অর্থঃ যখন নামাযের তাকবীর বলা হয়, তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন নামায জায়েয নয়, ফজরের সুন্নাত ব্যতীত। [ত্বাহাভী শরীফের পার্শ্বটীকা]

এমতাবস্থায় আপনাদের আপত্তির মুলোৎপাটন হয়ে যায়। বায়হাক্বীর এ বর্ণনা যদি দুর্বলও হয়, তবুও সাহাবা-ই কেরামের আমলের কারণে সবল হয়ে গেছে, সাহাবা-ই কেরামের আমলের কথা আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি, ওখানে দেখে নিন।

সাত. আপনাদের পেশকৃত হাদীসের অর্থ এযে, নামাযের তাকবীর (ইক্বামত)-এর পর কোন নফল নামায জায়েয নয়। অর্থাৎ এটা ঠিক হবে না যে, ওদিকে জামা'আত হচ্ছে, আর এদিকে কেউ নফল নামায পড়তে থাকবে। ফজরের সুন্নাত তো 'নফল' নয়, বরং সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। এ ভিন্নব্যাখ্যা (تاويل) এ জন্যই যেন হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ না থাকে।

আপত্তি -২

ত্বাহাভী শরীফে হযরত মালিক ইবনে বুহায়নাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস শরীফ উদ্ধৃত হয়েছে, তা নিম্নরূপ-

قَالَ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُالْفَجْرِ فَاَتٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ عَلٰى رَجُلٍ يُصَلِّىْ رَكْعَتَىالْفَجْرِفَقَامَ عَلَيْهِ وَلاَثَبِهِ النَّاسُ فَقَالَاَتُصَلِّيْهَااَرْبَعًاثَلٰثَ مَرَّاتٍ

অর্থ: একদিন ফজরের নামাযের তাকবীর বলা হলো। অতঃপর হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে অতিক্রম করছিলেন। সে ফজরের সুন্নাত পড়ছিলো। তিনি তার পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন আর লোকেরাও তাকে ঘিরে ফেললেন। হুযূর-ই আক্রাম বললেন, "তুমি কি ফজরের ফরয চার রাক্'আত পড়ো?" এটা তিনবার বলেছেন।

এ হাদীসে ফজরের সুন্নাতের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে কোন তা'ভীল বা ভিন্ন ব্যাখ্যা হতে পারে না। বুঝা গেলো যে, ফজরের নামাযের তাকবীর বলার সময় ফজরের সুন্নাত পড়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

খন্ডন

এ সাহাবী হযরত মালিক ইবনে বুহায়নার সাহেবযাদা আবদুল্লাহ্ ছিলেন। আর ওখানেই ফজরের সুন্নাত পড়ছিলেন, যেখানে জামা'আত চলছিলো। অর্থাৎ সফের (কাতার) সাথে মিলিত হয়ে। এটাতো বাস্তবিকপক্ষেই মাকরূহ। এ জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তিরস্কার করেছেন। সুতরাং এ-ই ত্বাহাভী শরীফে এ হাদীস শরীফ থেকে কিছুটা পরে এ হাদীস বিস্তারিতভাবে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ رَسُوْلَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ مَرَّبِعَبْدِاللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ وَهُوَ مُنْتَصِبٌثُمَّهْ بَيْنَ يَدَيْ نِدَاءِالصُّبْحِ فَقَالَ لاَ تَجْعَلُوْا هٰذِهِ الصَّلٰوةَ كَصَلٰوةٍقَبْلَالظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَاجْعَلُوْا بَيْنَهُمَافَصْلاً

অর্থ: মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, একদিন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মালিক ইবনে বুহায়নার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন; অথচ তিনি ওখানেই দন্ডায়মান ছিলেন। ফজরের তাকবীর বলার একেবারে সম্মুখস্থ জায়গায়। তখন তিনি (হুযূর-ই আক্রাম) বললেন, এ সুন্নাতে ফজরকে যোহরের পূর্ব ও পরবর্তী সুন্নাতের মতো করে নিও না, ফজরের সুন্নাত ও ফজরের ফরযের মধ্যে ব্যবধান রাখো।

এ হাদীস শরীফ, হে আপত্তিকারীরা, আপনাদের পেশকৃত হাদীসকে একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছে। অর্থাৎ যদি ফজরের সুন্নাত জমা'আতের স্থান থেকে দূরে পড়া হয়, তবে বৈধ, মাকরূহও নয়। জমা'আতের সাথে মিলিত হয়ে পড়া নিষিদ্ধ। আমরা একথাই বলে থাকি। সুতরাং আপনাদের আপত্তির গোড়ায় গলদ।

আপত্তি- ৩

ফজরের জমা'আতের সময় যেহেতু ইমামের তিলাওয়াতের আওয়াজ ওই ব্যক্তির কানেও আসবে, সেহেতু ওই সময়ে ফজরের সুন্নাত না পড়া চাই। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন, "যখন ক্বোরআন পড়া হয়, তখন সেটা কান লাগিয়ে শোনো এবং নিরব থাকো। সুতরাং ফজরের সুন্নাত জমা'আতের সময় পড়া ক্বোরআন-ই করীমেরও বিপরীত।

খন্ডন

এর কয়েকটা জবাব দেয়া যায়ঃ

এক. আমাদের খুব তাজ্জব হয় এ জন্য যে, এখানে তো আপনারা ফজরের সুন্নাত পড়তে এজন্য নিষেধ করছেন যে, ক্বোরআনের তিলাওয়াতের সময় নিরব থাকা ফরয আর আপনারা নিজেরাই ইমামের পেছনে মুক্বতাদীর উপর 'সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব (ফরয) বলে থাকেন। ইমামের পেছনে ক্বিরাআত পড়তে বলার সময় আপনাদের কি এ আয়াতের কথা স্মরণে থাকে না?

দুই. এ আপত্তি খোদ্ আপনাদের বিরুদ্ধে বর্তায়। আপনারা বলেন, মসজিদের বাইরে ফজরের সুন্নাত পড়া যাবে; যদিও ওই জায়গা মসজিদের সাথে একেবারে সংলগ্ন হয়, যেখানে ক্বোরআন শরীফ পড়ার আওয়াজ পৌঁছে থাকে।

তিন. ক্বোরআন-ই পাক শোনা এবং তিলাওয়াতের সময় নিশ্চুপ থাকা ফরযে কিফায়া, 'ফরযে 'আইন' নয়। মুক্বতাদীদের শোনা ও নিশ্চুপ থাকা যথেষ্ট। যদি

ফরযে আইন হতো, তবে অনেক মুশকিল (সমস্যা) সামনে আসতো। এক ব্যক্তির তিলাওয়াতের উপর, যতদূর পর্যন্ত সেটার আওয়াজ পৌঁছে, ততদূর পর্যন্ত পানাহার, কথাবার্তা, দুনিয়াবী কাজ-কারবার বন্ধ হয়ে যেতো, আজকাল বিজ্ঞানের জোর। রেডিওতে ক্বোরআনের তিলাওয়াত হয়, যার আওয়াজ সারা দুনিয়ায় পৌঁছে যায়। যদি তা শোনা ও নিশ্চুপ থাকা 'ফরযে 'আইন' হতো, তবে মুসীবৎ এসে যেতো। মোটকথা, এ আপত্তি একেবারে অনর্থক।

আপত্তি-৪

ফজরের জামা'আতের সময় ফজরের সুন্নাত পড়লে জামা'আতের বিরোধিতা করা হয়। কারণ, এ (জমা'আতের) লোকেরা থাকবে দাঁড়িয়ে আর এসব লোক (সুন্নাতসম্পন্নকারীরা) থাকছে রুকূ' কিংবা সাজদায়। সুন্নাত আদায়কারীরা থাকবে সাজদায়; আর জামা'আতে সামিল লোকেরা থাকবে সাজদায় আর এরা থাকবে আত্তাহিয়্যাত পড়ায় রত। এভাবে জামা'আতের বিরোধিতা তো অতিমাত্রায় মন্দ কাজ।

খন্ডন

এ বিরোধিতা তখনই হবে, যখন জামা'আতের সাথে মিলিতভাবে ফজরের সুন্নাত পড়া হবে। এটাকে আমরাও তো কঠোরভাবে মাকরূহ বলে থাকি। যদি জামা'আত থেকে দূরে, মসজিদের কোণায় কিংবা অন্য কোন অংশে পড়ে, তাহলে তো বিরোধিতা মোটেই হয় না; বরং প্রয়োজনের সময় এ বিরোধিতাও জাযেয হয়ে যায়।

দেখুন, যে মুক্বতাদীর ওযূ ভেঙ্গে যায়, আর সে ওযূ করে ফিরে আসে; ইত্যবসরে, দু/এক রাক্'আত হয়ে যায়; তাহলে নিজের জায়গায় গিয়ে এ লোক প্রথমে নিজের বাদ পড়া রাক্'আতগুলো পড়বে, তারপর জামা'আতে সামিল হবে। এ রাক্'আতগুলো আদায় করতে গিয়ে বাহ্যত জামা'আতের বিরোধিতা তো করবেই; কিন্তু এটা প্রয়োজনের সময় জায়েয। ফজরের সুন্নাতও জরুরী। যদি জামা'আতের স্থান থেকে দূরে সরে গিয়ে সম্পন্ন করে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

---o---

চতুর্দশ অধ্যায়

[একাধিক নামায একত্রে পড়া নিষিদ্ধ]

একাধিক নামায একত্রে পড়া নিষিদ্ধ

প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপরিহার্য হচ্ছে- প্রত্যেক নামায সেটার জন্য নির্দ্ধারিত ওয়াক্বতে সম্পন্ন করা। মুক্বীম হোক কিংবা মুসাফির, অসুস্থ হোক কিংবা সুস্থ। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবী ওহাবীরা সফররত অবস্থায় যোহর ও আসর, অনুরূপ মাগরিব ও এশা একত্রিত করে পড়ে নেয়। অর্থাৎ আসরের সময় যোহর ও আসর একত্রে এবং এশার সময় মাগরিব ও এশা এক সাথে সম্পন্ন করে। তাদের এ আমল ক্বোরআন শরীফেরও বিরোধী এবং সহীহ্ হাদীসসমূহেরও বিপরীত। আমি এ অধ্যায়কেও দু'টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্থ করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে হানাফী মাযহাবের দলীলাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের আপত্তিগুলো জবাব বা খন্ডন সহকারে উল্লেখ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

একাধিক নামায একত্রিত করা নিষিদ্ধ

প্রত্যেক নামাযকে সেটার নিজ ওয়াক্বতে পড়া ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন নামাযকে সেটার নির্দ্ধারিত সময়ের পরে পড়া বিনা ওযরে, জঘন্য গুনাহ্ এবং নিষিদ্ধ। প্রমাণাদি নিম্নরূপ-

দলীল- ১.

মহামহিম রব নামাযের ওয়াক্বতগুলো সম্পর্কে এরশাদ ফরমায়েছেন-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

তরজমা: নিশ্চয় মুসলমানদের উপর নামায ফরয- সেটার নির্দ্ধারিত সময়ে।

এ আয়াত শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নামায যেমন ফরয, তেমনি প্রত্যেক নামাযকে সেটার নির্দ্ধারিত সময়ে পড়াও ফরয। নামায বর্জনকারী যেমন গুনাহ্গার, তেমনি বিনা ওযরে নামাযকে অসময়ে সম্পন্নকারীও গুনাহ্গার। এ আয়াতে মুক্বীম ও মুসাফিরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; প্রত্যেক মু'মিনের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য-সে যে-ই হোক না কেন!

দলীল-২. মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

তরজমা: অনিষ্ট ওইসব নামাযীর জন্য; যারা তাদের নামাযে অলসতা করে।

[সূরা মা-'ঊন: আয়াত ৪-৫]

এ আয়াত শরীফে নামায অলসতা সহকারে সম্পন্নকারীকে তিরস্কার করা হয়েছে। বিনা কারণে (ওযর) নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত করে নামায পড়াও অলসতার অন্তর্ভূক্ত; বরং প্রথম স্তরের অলসতা।

দলীল-৩.

মহান রব ইরশাদ ফরমাচ্ছেন-

اَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوْا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

তরজমা: নামায ক্বায়েম করো, যাকাত দাও এবং রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' করো।

ক্বোরআন-ই করীম কোথাও নামায 'পড়া'র হুকুম দেয়নি, প্রতিটি স্থানে 'নামায ক্বায়েম করা'র নির্দেশ দিয়েছেন। 'নামায ক্বায়েম করা' হচ্ছে এ যে, সময়মত নামায পড়বে, বিশুদ্ধভাবে পড়বে, বিশুদ্ধসময়ে (নির্দ্ধারিত ওয়াক্বতে) পড়বে। নামাযের নির্দ্ধারিত সময় অতিবাহিত করে নামায পড়া নামায 'ক্বায়েম করা'র বিপরীত।

দলীল-৪

মহান রব মুত্তাক্বীদের প্রশংসা এভাবে করেছেন-

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

তরজমা: (ক্বোরআন) ওইসব মুত্তাক্বী লোকদের জন্য পথপ্রদর্শক, যারা অদৃশ্যের উপর ঈমান রাখে, নামায ক্বায়েম করে এবং আমার প্রদত্ত সম্পদ থেকে ব্যয় করে। [সূরা বাক্বারা: আয়াত ২-৩]

বুঝা গেলো যে, মুত্তাক্বী পরহেযগার হচ্ছে ওইসব মু'মিন, যারা নামায ক্বায়েম করে, অর্থাৎ প্রত্যেক নামায সেটার নির্দ্ধারিত ওয়াক্বতে পড়ে এবং সব সময় পড়ে, চাই মুক্বীম হোক কিংবা মুসাফির; সফরে যোহর কিংবা আসরকে সেটার ওয়াক্বত থেকে বের করে নামায পড়া এ আয়াতগুলোর স্পষ্ট বিরোধিতা করারই নামান্তর।

দলীল-৫ ও ৬.

মুসলিম ও বোখারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন- قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللهِ قَالَ الصَّلٰوةُ لِوَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَيٌّ - قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُّهُ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি- কোন্ আমলটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন, ''ওয়াক্বত অনুসারে নামায পড়া।'' আমি বললাম, ''তারপর কোনটা?'' তিনি এরশাদ করেন, ''মাতাপিতার খিদমত করা।'' আমি আরয করলাম, ''তারপর কোন আমল (কাজ)টি?'' তিনি বলেন, ''আল্লাহর পথে জিহাদ করা।'' তিনি বলেন, হুযূর-ই আক্রাম আমাকে এসব কথা বলেছেন। যদি আরো বেশি জিজ্ঞাসা করতাম, তবে বেশি বলতেন।

দলীল-৭-১০.

সর্ব ইমাম আহমদ, আবূ দাউদ, মালিক ও নাসাঈ হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُاللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ اِفْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ اَحْسَنَ وَضُوْءَهُنَّ فَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهٗ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهٗ الخ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মহান রব পাঁচ ওয়াক্বতের নামায ফরয করেছেন। যে মুসলমান সেগুলোর ওযূ উত্তমরূপে করবে এবং সেগুলোকে সেগুলোর নির্দ্ধারিত ওয়াক্বতে সম্পন্ন করে আর সেগুলোর রুকূ' ও হুযূর-ই ক্বলব (একগ্রতা) পূর্ণ করে, তার সম্পর্কে আল্লাহর বদান্যতার দায়িত্বে ওয়াদা রয়েছে যে, তাকে ক্ষমা করবেন।...

দলীল-১১.

ইমাম তিরমিযী হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِىُّ ثَلٰثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا الصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَّ لَهَا كُفُوًا

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''হে আলী! তিনটি জিনিষের মধ্যে বিলম্ব করো না- নামায, যখন এসে যাবে; জানাযা, যখন হাযির হয়ে যায় এবং কন্যা, যখন তার সমকক্ষ পেয়ে যাও (তখনই তাকে বিবাহ্ দিয়ে দাও)।

দলীল- ১২-১৪.

সর্ব ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ হযরত উম্মে ওয়াফরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ لِاَوَّلِ وَقْتِهَا

অর্থ: তিনি বলেন, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো- কোন্ আমলটি উত্তম? তিনি এরশাদ করেন, নামাযকে সেটার ওয়াক্বতের প্রারম্ভে সম্পন্ন করা। (এটা মুস্তাহাব)

দলীল-১৫.

মুসলিম শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُاللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ وَيَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا اصْفَرَّتْ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এটা মুনাফিক্বের নামায যে, বসে সূর্যের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে, এ পর্যন্ত যে, যখন হলদে হয়ে যায়; আর সূর্য শয়তানের দু' শিং-এর মধ্যবর্তীতে পৌঁছে যায়, তখন চারটি ঠোঁট মারে, যেগুলোতে মহান রবের যিক্র স্বল্প পরিমাণে করে।

এ ধরনের হাদীসসমূহ অগণিত রয়েছে, যেগুলোতে নামাযকে এর নির্দ্ধারিত সময়ে পড়ার তাকিদ দেওয়া হয়েছে। আর দেরীতে অথবা মাকরূহ ওয়াক্বতে পড়ার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। এমনটি করাকে মুনাফিক্বদের কাজ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এখানে নমুনাস্বরূপ কয়েকটা মাত্র হাদীস শরীফ পেশ করা হয়েছে।

আফসোস ওইসব ওহাবী গায়র মুক্বাল্লিদদের জন্য, যারা ঘর থেকে দু' মাইল দূরে গিয়েও সফরের বাহানা বানিয়ে, সময় বের করে নামায পড়ে, না কোন বাধ্যবাধকতা থাকে, না কোন ওযর, শুধু নাফসে আম্মারার ধোঁকার শিকার হয়ে তারা এমনটি করে থাকে। তারা খানা সময়মত খায়, দুনিয়াবী সমস্ত কাজ অতি যত্ন সহকারে করে; কিন্তু নামাযগুলো বিগড়ে ফেলে; যা ইসলামের প্রথম ফরয এবং সর্বোচ্চ রুক্ন (স্তম্ভ)। মুসলমানদের উচিৎ ওহাবীদের সঙ্গ থেকে বিরত থাকা, আর সফর ও নিজ বাড়িতে প্রত্যেকটি নামায আপন আপন ওয়াক্বতে সম্পন্ন করা।

যুক্তির নিরীখে

বিবেক বা যুক্তিও এটা চায় যে, সফরে প্রত্যেকটি নামায সেটার নির্দ্ধারিত ওয়াক্বতে সম্পন্ন করা হোক; যোহরকে আসরের সময়ে আর মাগরিবকে এশার

সময়ে পড়বে না। কেননা, শরীয়ত পাঁচ ওয়াক্বতের নামায, জুমু'আর নামায, দু' ঈদের নামায, তাহাজ্জুদের নামায, ইশরাক্বের নামায, চাশতের নামায- এ সব ক'টি নামাযের সময় পৃথক পৃথক নির্দ্ধারণ করেছেন। ওইগুলোর মধ্যে কোন নামাযকে অন্য কোন নামাযের সময়ে সম্পন্ন করা হয় না। মুসাফির-সফররত অবস্থায় ফজরের নামায, আসরের নামায ও এশার নামাযকে নিজ নিজ ওয়াক্বতেই পড়ে থাকে। অনুরূপ, যদি মুসাফির তাহাজ্জুদের নামায, ইশরাক্বের নামায, চাশতের নামায ও জুমু'আর নামায পড়ে, তবে সেগুলোর নির্দ্ধারিত সময়ের অভ্যন্তরেই পড়বে। এটা করতে পারবে না যে, তাহাজ্জুদের নামায সূর্যোদয়ের পরে পড়বে, অথবা জুমু'আর নামায আসরের সময় অথবা ফজরের নামায সূর্যোদয়ের পরে পড়বে! অথবা এশার নামায সুবহে সাদিক হয়ে যাবার পর পড়বে! সুতরাং যোহর ও মাগরিবের নামায কি দোষ করলো যে, মুসাফির সাহেব যোহরকে আসরের সময়ে পড়বেন? আর মাগিরব পড়বেন এশার সময়। অথচ সফরেও ওই উভয় নামাযের সময় সেটাই, যা সফর ছাড়া নিজ নিজ ঘর-বাড়িতে নির্দ্ধারিত রয়েছে!

দ্বিতীয়ত, ওহাবী সাহেবরা বলবেন কি, যখন তারা সফরে যোহরকে আসরের সময়ে এবং মাগরিবকে এশার সময়ে পড়েন, তখন এ যোহর ও মাগরিবের নামায 'আদা' (اداء) হয়, না ক্বাদ্বা (قضا) হয়? যদি ক্বাযা হয়, তবে জেনে শুনে নামায ক্বাদ্বা করাতো জঘন্য গুনাহ্! আর যদি 'আদা' (اداء)-ই হয়, তাহলে হযরত জিব্রাঈল আমীন, যিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে নামাযগুলোর সময় সীমাগুলো আরয করেছিলেন, তখন তো একথা বলেন নি যে, মুসাফিরের জন্য যোহরের সময় সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং মাগরিবের সময় সোবহে সাদিক্ব পর্যন্ত হবে; বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্য যোহরের ওয়াক্বত আসরের পূর্বেই খতম হয়ে যাবার এবং মাগরিবের ওয়াক্বত এশার পূর্বে খতম হয়ে যাবার হুকুম শুনিয়েছিলেন। এরপর আপনারা মুসাফিরের জন্য ওই দু'টি নামাযের ক্ষেত্রে সময়ের মধ্যে এ অবকাশ কোত্থেকে বের করলেন? মুসলমানদের নামায কেন বিনষ্ট করছেন? মোটকথা, পাঁচ ওয়াক্বতের নামাযগুলোর সময়সীমা মুসাফির ও মুক্বীম উভয়ের জন্য এক সমানই, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয হচ্ছে- যে কোন অবস্থায় প্রত্যেক নামায সেটার জন্য নির্দ্ধারিত সময়েই সম্পন্ন করা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা এ পর্যন্ত এ মাসআলা সম্পর্কে যে পরিমাণ আপত্তি করতে পেরেছে, আমরা ওইসব আপত্তি উদ্ধৃত করে প্রত্যেকটার খন্ডন (জবাব) আরয করছি। ভবিষ্যতে যদি আর কোন আপত্তি করে এবং তা আমাদের নিকট পৌঁছে, তাহলে ইনশা-আল্লাহ্, পরবর্তী সংস্করণে সেটার জবাবও দেওয়া হবে।

আপত্তি-১.

বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلٰوةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

অর্থঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে থাকতেন, তখন যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়ে নিতেন এবং মাগরিব ও এশার নামাযও একত্রিত করতেন।

এ হাদীস শরীফ আবূ দাউদ, তিরমিযী, মুআত্তা-ই ইমাম মালিক, মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ ও ত্বাহাভী শরীফ ইত্যাদিতে অনেক মুহাদ্দিস ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাকারী থেকে কিছুটা পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসই ওহাবীদের চূড়ান্ত দলীল, যাকে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী দলীল বলে বিশ্বাস করে।

খন্ডন

এর কয়েকটা জবাব রয়েছে। মনযোগ সহকারে দেখুন-

এক. আবূ দাউদ শরীফ ও ত্বাহাভী শরীফ প্রমুখ ওই হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে এও বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফর ছাড়া ও ভয়ভীতি ছাড়া মদীনা মুনাওয়ারায়ও যোহর ও আসর, অনুরূপ মাগরিব ও এশা একত্রে পড়ে নিতেন। সুতরাং আবূ দাউদ শরীফের বচনগুলো নিম্নরূপ:

قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِيْنَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَّلَا مَطَرٍ -

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যোহর ও আসর, মাগরিব ও এশা মদীনা মুনাওয়ারায় বিনা বৃষ্টিতে ও বিনা ভয়-ভীতির সময় একত্রিত করে নিতেন।

বরং ওই আবূ দাঊদ ও ত্বাহাভী শরীফে ওই হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হুযূর-ই আক্রাম মদীনা মুনাওয়ারায় সাত বরং আটটি নামাযকে একত্রিত করতেন। সুতরাং আবূ দাঊদ শরীফের বচনগুলো নিম্নরূপ-

قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَآءَ ـ

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় সাত নামায, আট নামায একত্রিত করে আমাদেরকে পড়িয়েছেন- যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। সুতরাং হে লা-মাযহাবী ওহাবীরা, আপনারা শুধু সফরে, শুধু যোহর ও আসর এবং মাগরিব এবং এশার উপর কেন দয়া প্রদর্শন করছেন? আপনাদের উচিৎ রাফেযীদের (শিয়া) মতো সাত-সাতটি ও আট-আটটি নামায একসাথে পড়ে আরাম করা সফরেও, ঘরেও। আপনারা কি কোন কোন হাদীসকে মানছেন, আর কোন কোন হাদীসকে অস্বীকার করছেন?

দুই. আপনাদের উপস্থাপিত বোখারীর বর্ণনায় এ কথাতো উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যোহর ও আসর একত্রে পড়েছেন, কিন্তু এ তাফসীল নেই যে, কিরূপ একত্রিত করেছেন! তিনি কি আসরকে যোহরের সময়ে পড়েছেন, না যোহরকে আসরের সময় পড়েছেন! অনুরূপ মাগরিবকে কি এশার সময়ে পড়েছেন, না কি এশাকে মাগরিবের সময় পড়েছেন সুতরাং এ হাদীস শরীফ 'মুজমাল' (অবিস্তারিত)। বস্তুত 'মুজমাল' হাদীস তাফসীল ব্যতীত আমল করার উপযোগী নয়।

তিন. হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফরে ওই নামাযগুলোকে একত্রিত করা সফররূপী ওযরের কারণে ছিলো। 'প্রয়োজন' হলে বহু নিষিদ্ধ জিনিষও হালাল হয়ে যায়। তদুপরি, এ একত্রীকরণও ছিলো বাহ্যিক আকারে, প্রকৃত পক্ষে নয়। অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যোহরকে আসরের সময়ে পড়েননি বরং সফর করতে করতে যোহরের শেষ সময়ে যাত্রা বিরতি করেছেন এবং যোহরের শেষ সময়ে যোহরের নামায পড়েছেন আর আসর সেটার সময়ের প্রথম ভাগে পড়েছেন।

বাহ্যিকভাবে মনে হয়েছে যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম দু' নামায এক ওয়াক্তের মধ্যে পড়েছেন; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকটা নামায সেটার নির্দ্ধারিত সময়সীমার ভিতর সম্পন্ন হয়েছে। যোহর কিংবা মাগরিবের নামায তিনি শেষ সময়ে পড়েছেন, আর আসর কিংবা এশার নামায ওয়াক্তের প্রথমাংশে পড়েছেন। এমতাবস্থায় এ হাদীস শরীফ না ক্বোরআনের বিপরীত হলো, না অন্য ওইসব হাদীসের, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

এমন একত্রিকরণ একেবারে জায়েয, এটাই আমাদের (হানাফী মাযহাবের অভিমত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের ওই হাদীস, যা ইমাম ত্বাহাভী ও ইমাম আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন, যাতে এরশাদ করা হয়েছে যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম মদীনা মুনাওয়ারায় ভয়ভীতি শূন্য অবস্থায় ও বৃষ্টি বাদলমুক্ত পরিবেশে সাত/আটটি নামায একত্রে পড়তেন; সেখানে সাত/আট নামায বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং সাত/আট রাক্'আত বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি তিনি মাগরিব ও এশার নামায বাহ্যিক আকারে একত্রিত করে থাকেন, তাহলে তাতে ফরযের সাত রাক্'আত একত্রিত হয়েছিলো, তিন রাক্'আত মাগরিবের এবং চার রাক্'আত এশার। আর যদি যোহর ও আসর একত্রে পড়েছেন এমন হয়, তবে তো আট রাক'আত একত্রিত হয়েছে- চার রাক্'আত যোহরের এবং চার রাক্'আত আসরের। যেহেতু এ একত্রিতকরণ বাহ্যিক আকারগতভাবে ছিলো, প্রকৃতপক্ষে ছিলো না, সেহেতু তা সফরেও জায়েয ছিলো এবং নিজ ঘরেও; জায়েয মর্মে বর্ণনা করার জন্য। বস্তুত; হাদীস শরীফ বুঝার জন্য 'শর'ঈ আক্বাল' (শরীয়ত বুঝার মতো বিবেক-বুদ্ধি) থাকা দরকার। তদুপরি হাদীসের প্রবক্তা মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর গোলামীর সম্বন্ধ স্থাপন করা চাই; যা থেকে ওহাবী সম্প্রদায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত।

এ অর্থের সমর্থন

নামায একত্রিত করার যে অর্থ আমি বর্ণনা করেছি, ওই অর্থের সমর্থন অনেক হাদীস শরীফ দ্বারা হয়ে থাকে। ওই হাদীসগুলো থেকে কয়েকটা এখানেও উদ্ধৃত হচ্ছে। সেগুলো দেখুন, শুনুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন।

হাদীস-১.

ইমাম ত্বাবরানী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস‘ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ يُؤَخِّرُ هٰذِهٖ فِىْ اٰخِرِ وَقْتِهَا وَيُعَجِّلُ هٰذِهٖ فِىْ اَوَّلِ وَقْتِهَا

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাগরিব ও এশাকে এভাবে একত্রিত করতেন যে, মাগরিবকে সেটার শেষ সময়ে সম্পন্ন করতেন, আর এশাকে সেটার ওয়াক্বতের শুরুতে (সম্পন্ন করতেন)।

হাদীস-২.

বোখারী শরীফে হযরত সালিম থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন; যার কয়েকটি বচন নিম্নরূপ-

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهٗ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيْمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيْهَا ثَلٰثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ قَلَّمَا يَلْبَثُ حَتّٰى يُقِيْمَ الْعِشَاءَ فَيُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ -

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমাও হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর মতো আমল করতেন। অর্থাৎ যখন সফরে ত্বরা থাকতো, তখন মাগরিবের তাক্বীর (ইক্বামত) বলতেন এবং তিন রাক্‘আত পড়তেন, তারপর সালাম পাঠ করতেন। তারপর কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। তারপর এশার তাকবীর (ইক্বামত) বলতেন এবং দু’ রাক্‘আত এরশার নামায পড়তেন।

হাদীস-৩.

ইমাম নাসাঈ তাঁর নাসাঈ শরীফে হযরত নাফি’ রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةُ سَارَبِنَا حَتّٰى اَمْسَيْنَا فَظَنَنَّا اَنَّهٗ نَسِىَ الصَّلٰوةَ فَقُلْنَا لَهُ الصَّلٰوةُ فَسَكَتَ وَسَارَ حَتّٰى كَادَ الشَّفَقُ اَنْ يَغِيْبَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى وَغَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ هٰكَذَا كُنَّا نَصْنَعُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ -

অর্থ: তিনি বলেন, আমরা মক্কা মু‘আয্যামাহ্ থেকে হযরত ইবনে ওমরের সাথে এলাম। যখন ওই রাত হলো, তখন তিনি চলতে থাকেন এ পর্যন্ত যে, সন্ধ্যা হয়ে গেলো। আমরা মনে করলাম হযরত আবদুল্লাহ্ নামাযের কথা ভুলে গেছেন। আমরা তাঁকে বললাম, ‘‘নামায পড়ে নিন।’’ কিন্তু তিনি চলতেই রইলেন এমনকি পশ্চিমাকাশের লালচে রং অস্তমিত হবার উপক্রম হয়ে গেলো। তখন তিনি

নামলেন এবং মাগরিবের নামায পড়লেন। তারপর আকাশের শুভ্রতা (শফক্ব) অদৃশ্য হয়ে গেলো। তখন এশার নামায পড়লেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরলেন, আর বললেন, ‘‘আমরা হুযূর-ই আক্রামের সাথে থাকাবস্থায়ও এমনি করতাম; যখন সফরে ত্বরা থাকতো।’’

এ ধরনের অনেক হাদীস শরীফ আছে, যেগুলোতে সুস্পষ্ট ভাষায় এরশাদ হয়েছে- সফরে আসর ও যোহর অথবা মাগরিব ও এশা শুধু বাহ্যিক আকৃতিগতভাবে একত্রিত করা যাবে। অর্থাৎ মাগরিব সেটার সময়ের শেষভাগে পড়া হবে, এশা সেটার সময়ের শুরুতে; না এভাবে যে, যোহরকে আসরের সময়ে পড়া হবে, না মাগরিবকে এশার সময়ে। যদি এ হাদীসগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেখতে চান, তাহলে ‘ত্বাহাভী শরীফ’ ও ‘সহীহুল বিহারী’ ইত্যাদি পাঠ পর্যালোচনা করুন। আমি শুধু তিনটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করে ক্ষান্ত হলাম।

সুতরাং হানাফীদের ব্যাখ্যা একেবারে সঠিক। সেটার সমর্থন ক্বোরআন-ই করীমও করছে এবং অন্যান্য বহু হাদীস শরীফও। ওহাবীদের ব্যাখ্যা নিরেট বাতিল (ভিত্তিহীন), ক্বোরআন-ই করীমেরও বিপরীত, হাদীস শরীফগুলোরও বরখেলাফ।

হে লা-মাযহাবী ওহাবীরা, যদি আপনারা এ হাদীসগুলোর কারণে সফরে প্রকৃতপক্ষে একত্রিতকরণকেই মেনে থাকেন, তবে হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীসের কারণে ইক্বামতের (সফর বিহীন) অবস্থায়ও সাতটি কিংবা আটটি নামাযই এক সাথে পড়ে নিন। এ হাদীস আমি প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। যখন আপনারা এ হাদীসে বাহ্যিকভাবে একত্রিকরণ বুঝান, তখন এখানে প্রকৃত একত্রিতকরণ কেন বুঝাচ্ছেন? আপনারা কি কোন হাদীসের উপর ঈমান রাখছেন আর কোন কোনটা অস্বীকার করছেন?

আপত্তি-২.

বোখারী শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর সূত্রে বর্ণিত, এর কিছুটা ইবারত নিম্নরূপ:

قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

অর্থ: তিনি বলেন, যদি হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পূর্বে সফর (আরম্ভ) করতেন, তবে যোহরকে আসরের সময় আসা পর্যন্ত বিলম্ব করতেন। তারপর উভয় নামাযকে একত্রে সম্পন্ন করতেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম যোহর আসরের সময়ে পড়তেন। যেমনটি اِلَى الْعَصْر (আসর পর্যন্ত) দ্বারা প্রতীয়মান হয়।

খন্ডন

আপনারা এ হাদীস শরীফের ভুল অনুবাদ করেছেন। اِلَى (পর্যন্ত) থেকে বুঝা যায় যে, তিনি আসরের সময় হবার পূর্বে অবতরণ করতেন। 'সীমা' যার সীমা বর্ণনা করা হচ্ছে তা থেকে বাইরে থাকে; ভিতরে থাকে না। 'আসর পর্যন্ত বিলম্ব করতেন'-এর অর্থ হচ্ছে আসরের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত বিলম্ব করতেন; যেমনটি আপত্তি নম্বর-১-এর জবাবে উল্লিখিত হাদীস শরীফ থেকে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং 'জম'ই সূরী' (বাহ্যিক আকারে একত্রিকরণ) বুঝানো হয়েছে, প্রকৃত একত্রিকরণ নয়।

আপত্তি-৩

ইমাম ত্বাহাভী তাঁর ত্বাহাভী শরীফে হযরত নাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন, যার কিছু ইবারত নিম্নরূপ-

حَتّٰى اِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْبُوْبَةِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰكَذَا اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ

অর্থ: হযরত ইবনে ওমর চলছিলেন, এ পর্যন্ত যে, পশ্চিমাকাশে লালছে রং অদৃশ্য হবার সময় হয়ে গেলো। তখন তিনি নামলেন। তারপর মাগরিব ও এশা একত্রে সম্পন্ন করলেন। আর বললেন, আমি হুযূর-ই আক্রামকে এমনটি করতে দেখেছি। যখন সফরে ত্বরা থাকতো।

এ হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর পশ্চিমাকাশের লালিমা অদৃশ্য হবার সময় অবতরণ করেছেন। নিশ্চয় তিনি মাগরিবকে এশার সময়ে সম্পন্ন করেছেন।

খন্ডন

এটার ভিত্তিও আপনাদের ভুল অনুধাবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর অর্থ কিভাবে করলেন যে, 'লালিমা' অদৃশ্য হবার পর তিনি অবতরণ করেছেন? অথচ এ অর্থ একেবারে স্পষ্ট যে, যখন লালিমা অদৃশ্য হতে লাগলো, অর্থাৎ অদৃশ্য হবার কাছাকাছি হলো, তখন তিনি নেমেছেন। মাগরিবের নামায সম্পন্ন করতেই লালিমা অদৃশ্য হয়েছে এবং এশার সময় এসে গেছে এবং এশা পড়ে নিয়েছেন।

আমরা প্রথম আপত্তির খন্ডনে ওই হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার আমল শরীফই বর্ণনা করেছি; যাতে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি মাগরিব সেটার শেষ সময়ে পড়েছেন এবং এশা সেটার সময়ের প্রথম ভাগে পড়েছেন। ওই হাদীস আপনাদের এ হাদীসের তাফসীর বা ব্যাখ্যা।

আপত্তি-৪.

যদি প্রত্যেক নামাযকে সেটার জন্য নির্দ্ধারিত সময়ে পড়া জরুরী হয়, আর সফর ইত্যাদি ওযরের অবস্থায়ও এক নামাযকে অন্য নামাযের সময়ে পড়া গুনাহ্ হয়, তবে হাজীরা আরাফাতে ৯ যিলহজ্বে যোহর ও আসরকে একত্রিত করে কেন পড়েন? যোহরের সময়ে আসর? আর ১০ যিলহজ্বের রাতে মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে এশার সময়ে কেন পড়ে থাকেন? হানাফী মাযহাবের অনুসারীরাও ওখানে দু' নামাযকে একত্রিত করাকে জায়েয বলে থাকেন। যখন হজ্জের সময় যোহর ও আসর, অনুরূপ, মাগরিব ও এশা প্রকৃতপক্ষে একই সময়ে একত্রিত হয়ে গেলো, তখন যদি সফরে একত্রিত হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতি কি? হে হানাফীরা, আপনারা হজ্জের সময় ক্বোরআনী আয়াতসমূহ এবং এ হাদীস শরীফগুলো কেন ভুলে যান? (বস্তুত: এটা ওহাবীদের চূড়ান্ত আপত্তি।)

খন্ডন

জনাব ওহাবী লা-মাযহাবী! না আরাফাতে আসর যোহরের সময়ে সম্পন্ন করা হয়; না মুযদালিফার মাগরিব এশার সময়ে পড়া হয়; বরং ওখানে হাজীদের জন্য আসরের সময় যোহরের দিকে আর মাগরিবের সময় এশার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ ওখানে মাগরিবের সময় 'লালিমা' অদৃশ্য হয়ে যাবার পর আরম্ভ হয়, আর আসরের সময় যোহরের নামায সম্পন্ন করার সাথে সাথে আরম্ভ হয়ে যায়। যেমন বিতরের সময় এশার ফরয নামায পড়া মাত্রই আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং ওখানে নামাযগুলো সময় থেকে সরে যায়নি; বরং নামাযগুলোর সময়সমূহ সরে গেছে। নামাযগুলো নিজ নিজ সময়ের অভ্যন্তরে সম্পন্ন হয়েছে। আর হে ওহাবীরা! আপনারা নামাযগুলোকে সেগুলোর সময় থেকে সরিয়ে ফেলে থাকেন। ওয়াক্বত সরে যাওয়া এবং নামায সরে যাবার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

এর স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এযে, যদি ইমাম আরাফাতে যোহরকে সেটার সব সময়ের ওয়াক্বতে পড়েন, আর আসরকে সেটার সব সময়ের ওয়াক্বতে পড়েন, তা হলে জঘন্য গুনাহর ভাগী হবেন; তিনি যেন আসরকে ক্বাযা করে ফেলেছেন। আর যদি ওই দিন

মাগরিবের নামাযকে সেটার সব সময়ের ওয়াক্বতে পড়েন, আর এশাকে সেটার মা'মূলী সময়ে পড়েন, তবে মাগরিবের নামায হবেই না। আর এমনটি যে ব্যক্তি করবে, সে জঘন্য গুনাহ্গার হবে। সে যেন মাগরিবের নামায ওয়াক্বত আসার পূর্বে পড়ে নিয়েছে। বুঝা গেলো যে, আজ (হজ্জের দিন) ওই নামাযগুলোর সময়ই বদলে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু যদি মুসাফির যোহর ও আসরকে একত্রিত না করে বরং যোহরকে সেটার সময়ে পড়ে, আর আসরকে সেটার সময়ে পড়ে, অনুরূপ মাগরিবকে সেটার সময়ে এবং এশাকে সেটার সময়ে পড়ে, তবে আপনারাও তাকে গুনাহ্গার মনে করেননা; মাকরূহ হওয়া ব্যতিরেকেই জায়েয বলে থাকেন। বুঝা গেলো যে, আপনাদের মতেও সফরে নামাযের ওয়াক্বত বদলে যায় না; বরং নামাযকে অন্য সময়ে সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং হাজীদের আরাফাত ও মুযদালিফার নামাযগুলো না ক্বোরআনের আয়াতগুলোর পরিপন্থী, না হাদীস শরীফগুলোর বিরোধী। ওখানে প্রত্যেক নামায সেটার নিজস্ব সময়ে সম্পন্ন করা হয়। আর মুসাফির কর্তৃক প্রকৃতপক্ষে একাধিক নামাযকে একত্রিত করা ক্বোরআন-ই করীমেরও বিরোধী, হাদীসসমূহেরও। হজ্বের সময় নামাযের সময়গুলোর মধ্যে পরিবর্তন 'হাদীস-ই মশহুর' বরং 'হাদীসে সহীহ্ মুতাওয়াতিরে মা'নাভী' দ্বারা প্রমাণিত। এতদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব; যেমনিভাবে ক্বোরআনের আয়াতগুলো অনুসারে আমল করা জরুরী।

আমি এখানে একাধিক নামাযকে একত্রিত করার মাআলাটাকে সংক্ষেপে আরয করলাম। যদি এর পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনা দেখতে চান, তাহলে আমার লিখিত 'হাশিয়া-ই বোখারী' 'নঈমুল বারী'তে এ-ই বিষয়ের আলোচনা দেখুন! ইনশা-আল্লাহ্, ওখানে মনে আনন্দ এসে যাবে।

পাঠকসমাজ হয়তো এসব আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছেন যে, হানাফী মাযহাব, আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে, অত্যন্ত মজবুত, দলীল-প্রমাণসমৃদ্ধ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। সর্বোপরি, ক্বোরআন-ই মজীদ ও হাদীসসমূহের একেবারে অনুরূপ। পক্ষান্তরে, ওহাবীগণ ভুল বুঝার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। তাদের মতবাদের বুনিয়াদ নিছক ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। মহান রব আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে ওই হানাফী মাযহাবের উপর কায়েম রাখুন। আমাদের দ্বীন হানাফী (দ্বীন-ই হানীফ) এবং আমাদের মাযহাব হানাফী অর্থাৎ আমাদের মিল্লাত ইব্রাহীমী ও মাযহাব নো'মানী।

---o---

পঞ্চদশ অধ্যায়

[সফরের দূরত্ব তিন দিনের রাস্তা]

সফরের দূরত্ব তিন দিনের রাস্তা

ইসলামী শরীয়ত মুসাফিরকে এ সুবিধা দিয়েছে যে, তার উপর চার রাক্'আত ফরয, চার রাক্'আতের স্থলে দু' রাক্'আত পড়া ওয়াজিব করেছে। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা, নিছক মনের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণে, নামাযকে হ্রাস করার জন্য সফরকে এমন ব্যাপক করে দিয়েছে যে, আল্লাহরই পানাহ্! ঘর থেকে ক্ষেত দেখার জন্য গিয়েছে, মুসাফির হয়ে গেছে। এক/আধ মাইল ভ্রমণ-বিনোদনে শহর থেকে বের হয়েছে, মুসাফির হয়ে বসেছে এবং নামাযকে কাটছাঁট করে ফেলেছে। শরীয়ত মতে সফরের দূরত্ব তিন দিনের রাস্তা অতিক্রম করা। অর্থাৎ যখন মানুষ নিজের মাতৃভূমি থেকে তিন দিনের দূরত্ব অতিক্রম করার ইচ্ছা করে বের হয়, তবে সে-ই মুসাফির। তার উপর শুধু চার রাক্'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযে ক্বসর পড়া ওয়াজিব অর্থাৎ চার রাক্'আতের পরিবর্তে দু' রাক্'আত পড়বে।

এ তিন দিনের দূরত্ব সাধারণ সুগম (ভাল) রাস্তার উপর ৫৭ ইংরেজি মাইল হয়। প্রত্যেক মানযিল ১৯ মাইলে, সুতরাং সর্বমোট তিন মানযিলে ৫৭ মাইল হয়। তবে বালুময় ও পাহাড়ী রাস্তা হলে তা থেকে কম হবে। মোটকথা তিন দিনের পথের দূরত্বই বিবেচ্য।

হাজীদের জন্য জরুরী দিক নির্দেশনা

আজকাল হেরমাঈনে ত্বাইয়্যেবাঈনে নজদীদের সরকার ক্ষমতাসীন। নজদী ইমাম হজ্জের সময় মক্কা মু'আয্যামাহ্ থেকে মিনা ও আরাফাতে এসে ক্বসর নামায সম্পন্ন করে; অথচ মিনার দূরত্ব মক্কা মু'আয্যামাহ্ থেকে শুধু তিন মাইল এবং আরাফাতের দুরত্ব ৯ মাইল। হানাফী মাযহাবের অভিমত অনুসারে ওই ইমাম ক্বসর করতে পারেন না। তাই হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা তার পেছনে মোটেই নামায পড়বে না। কারণ তার পেছনে নামাযই শুদ্ধ হবে না।

শাফে'ঈ অথবা হাম্বলী মাযহাবের ইমামের জন্য এমতাবস্থায় হয়তো এটা উচিৎ হবে যে, যিলহজ্বের ৮ তারিখে মক্কা মু'আয্যামাহ্ থেকে ৫৭ মাইল দূরত্বে বের হয়ে যাবেন, তারপর ফিরে এসে মিনা ও আরাফাতে ক্বসর পড়বেন, যাতে হানাফীদের নামাযও তাঁর পেছনে দুরস্ত হয়ে যায়। হাজীদের খুব সতর্কতা অবলম্বন করা চাই।

এ অধ্যায়কেও আমি দু'টি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে সফরের ওই দুরত্বের প্রমাণ আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার বিরুদ্ধে আনীত আপত্তিগুলো খন্ডন সহকারে উল্লেখ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

'সফরের দূরত্ব তিন দিনের রাস্তা'-এর প্রমাণ

সফরের দূরত্ব কমপক্ষে তিন দিনের রাস্তা। এর থেকে কম দূরত্ব অতিক্রম করা শরীয়ত মতে সফর নয়; না এমন লোকের উপর সফরের বিধানাবলী জারী হয়। দলীলাদি নিম্নরূপ:

দলীল-১: হাদীস শরীফ

ইমাম বোখারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا مَعَ ذِىْ رَحْمٍ

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নারী তিন দিনের দূরত্বের সফর তার মুহরিম (যার সাথে বিবাহ হারাম) ছাড়া করবে না।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, নারীর জন্য একাকী সফর করা হারাম। মুহরিম-নিকটাত্মীয়ের সাথে সফর করতে পারবে। এ সফরের সময়সীমা হুযূর-ই আক্রাম তিন দিন বলেছেন। বুঝা গেলো যে, সফরের দূরত্ব তিন দিনের পথ অতিক্রম করা।

দলীল-২: হাদীস

ইমাম মুসলিম তাঁর মুসলিম শরীফে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মোজা যুগলের উপর মসেহ করার সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত নির্দ্ধারণ করেছেন, আর মুক্বীমের জন্য একদিন এক রাত।

হাদীস-৩-৯:

সর্ব ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ত্বাহাভী, ত্বায়ালিসী, ত্বাবরানী ও তিরমিযী হযরত খোযায়মাহ্ ইবনে সাবিত আনসারী প্রমুখ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ فِى الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيْمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ

অর্থ: তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মুক্বীমের জন্য মোজাযুগলের উপর মসেহ করার সময়সীমা একদিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত ।

হাদীস- ১০-১২.

ইমাম আসরাম আপন সুনানে, ইবনে খোযায়মাহ্ ও দারু কুত্বনী হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন-

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً اِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ اَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا وَقَالَ الْخَطَابِىُّ وَهُوَ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ - (مشكوة)

অর্থ: তিনি বর্ণনা করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে যে, হুযূর-ই আক্‌রাম মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিন রাত পর্যন্ত মসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন, আর মুক্বীমের জন্য একদিন এক রাত যখন ওযূ করে মোজাগুলো পরিধান করে । ইমাম খেতাবী বলেন, এ হাদীসের সনদ সহীহ ।

[মিশকাত]

হাদীস- ১৩-১৫

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيِهِنَّ الْخ (مشكوة)

অর্থ: হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে হুকুম দিতেন, যখন আমরা মুসাফির হতাম, যেন আমরা মোজাগুলো তিনদিন তিন রাত পর্যন্ত না খুলি । [মিশকাত]

এ সব হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, প্রত্যেক মুসাফিরের জন্য তিন দিন যাবৎ মোজার উপর মসেহ্ করার অনুমতি রয়েছে ।

কোন মুসাফির এ অনুমতির বাইরে নয় । যদি তিনদিনের চেয়ে কম দূরত্বও সফর হয়ে যায়, তাহলে এ অনুমতি থেকে অনেক মুসাফির উপকৃত হতে পারবে না । উদাহরণস্বরূপ, যদি ওহাবী সাহেব তার ক্ষেতে বেড়াতে এক মাইলের দূরুত্বে গিয়ে

মুসাফির বনে যান, তাহলে তিনদিন মসেহ করে দেখান । অনুরূপ, যে ব্যক্তি একদিন হেঁটে নিজ ঘরে পৌঁছে যায়, সে এ অনুমতি থেকে কিভাবে উপকৃত হতে পারবে । সুতরাং তিনদিনের কম সময়ে সফর বা মুসাফির হতেই পারে না । অন্যথায় মোজাগুলোর উপর মসেহের এ হাদীস শরীফগুলো মোটেই আমল করার উপযোগী থাকবে না । এ দলীলের প্রতি গভীরভাবে মনযোগ দেওয়া জরুরী ।

হাদীস -১৬.

ইমাম মুহাম্মদ 'আ-সার'-এ হযরত আলী ইবনে রবী'আহ্ ওয়ালেবী থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ سَاَلْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ اِلَى كَمْ تُقْصَرُ الصَّلٰوةُ فَقَالَ اَتَعْرِفُ السُّوَيْدَاءَ قُلْتُ لَا وَلٰكِنِّىْ قَدْ سَمِعْتُ بِهَا قَالَ هِىَ ثَلٰثُ لَيَالٍ قَوَاصِدَ فَاِذَا خَرَجْنَا اِلَيْهَا قَصَرْنَا الصَّلٰوةَ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে জিজ্ঞাসা করেছি- কতদূর গেলে আমাদের ক্বসর হতে পারে? তখন তিনি বললেন, "তুমি কি সুয়াইদা নামক স্থানটি চিনো?" আমি বললাম, "না, কিন্তু আমি সেটা সম্পর্কে শুনেছি ।" তিনি বললেন, "সেটা এখান থেকে (মাঝারি গতিতে চললে) তিন রাতের দূরত্বে রয়েছে । আমরা যখন ওই স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবো, তখন ক্বসর করতে পারবো ।"

হাদীস-১৭

দার-ই কুত্বনী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلٰوةَ فِىْ اَدْنٰى مِنْ اَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِّنْ مَكَّةَ اِلَى عُسْفَانَ -

অর্থ: নিশ্চয় হুযূর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে মক্কাবাসীরা! চার 'বারীদ' থেকে কম সফরে নামাযে ক্বসর করো না । এ দূরত্ব মক্কা মু'আয্যামাহ্ থেকে 'উসফান পর্যন্ত ।

হাদীস- ১৮

মুআত্তা-ই ইমাম মালিক-এ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত-

اَنَّه كَانَ يَقْصُرُ الصَّلٰوةَ فِىْ مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ وَفِىْ مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَعُسْفَانَ وَفِىْ مِثْلِ مَا بَيْنَ مَكَّةَ وَجِدَّةَ قَالَ يَحْىٰ قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ اَرْبَعَةُ بُرُدٍ

অর্থ: তিনি নামাযে ক্বসর করতেন মক্কা ও তায়েফ, মক্কা ও ওসফান এবং মক্কা ও জিদ্দার সমান দূরত্বের মধ্যে। ইয়াহ্ইয়া বলেন, এ দূরত্ব হচ্ছে চার বারীদ।

হাদীস-১৯.

ইমাম শাফে'ঈ সহীহ্ সনদে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّه سُئِلَ نُقْصَرُ الصَّلٰوةَ اِلٰى عَرْفَةَ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ اِلٰى عُسْفَانَ وَاِلٰى جِدَّةَ وَاِلٰى الطَّائِفِ [رواهُ الْاِمَامُ الشَّافِعِىُّ وَقَالَ اِسْنَادُه صَحِيْحٌ]

অর্থ: হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে প্রশ্ন করা হলো- আরফাহ্ পর্যন্ত (৯মাইল) যাওয়ার ক্ষেত্রে নামাযে ক্বসর করা যাবে কিনা! তিনি বলেন, "না"। কিন্তু ক্বসর করা যাবে ওসফান অথবা জিদ্দা অথবা তায়েফ পর্যন্ত গেলে। এটা ইমাম শাফে'ঈ বর্ণনা করেছেন। আর বলেছেন, এর সনদ সহীহ।

হাদীস-২০

ইমাম মুহাম্মদ মু'আত্তা শরীফে হযরত নাফি' থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّه كَانَ يُسَافِرُ مَعَ اِبْنِ عُمَرَ الْبَرِيْدَ فَلاَ يَقْصِرُ الصَّلٰوةَ

অর্থ: তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের সাথে এক বরীদ সফর করতেন। তখন তিনি ক্বসর করতেন না।

স্মর্তব্য যে, চার (৪) বরীদ ইংরেজী মাইল হিসেবে প্রায় ৫৭ মাইল হয়। অর্থাৎ ৩৬ ক্রোশ, তিন মানযিল।

এ কয়েকটা হাদীস নমুনাস্বরূপ পেশ করা হলো। অন্যথায় এ সম্পর্কে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তির আগ্রহ থাকে, তিনি যেন 'সহীহুল বিহারী শরীফ' পাঠ-পর্যালোচনা করেন।

এ সব ক'টি হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, শহর থেকে যেনতেনভাবে বের হয়ে গেলে 'সফর' হয় না। এর উপর সফরের বিধানাবলী জারী (কার্যকর) হয় না। সফরের জন্য ৪ (চার) বরীদ দূরত্ব, অর্থাৎ তিন 'মানযিল' দূরত্বে যাওয়া চাই। সাহাবা-ই কেরামের এর উপরই আমল ছিলো।

যুক্তির দাবীও এ যে, শহর থেকে যে কোনভাবে বের হওয়া সফর না হওয়া চাই। কেননা, শহরের আশেপাশের যমীনকে শহরের 'ফানা' (সংলগ্ন এলাকা)

বলা হয়; যা থেকে শহুরে প্রয়োজনাদি পূরণ হয়ে যায়। যেমন- কবর স্থান, ঈদগাহ্, চারণভূমি, ঘোড় দৌঁড়ের ময়দান। এখানে পৌঁছে গেলে শহরে পৌঁছে যাওয়া বলে মনে করা হয়। কোন ব্যক্তি এ স্থানে ভ্রমন-বিনোদনের জন্য গিয়ে নিজেকে মুসাফির মনে করে না।

তাছাড়া, এমন দূরত্বকে 'সফর' বলা হলে এটাও উচিৎ হবে যে, কোন নারী 'মুহরিম' ছাড়া মোটেই শহর থেকে বের হতে পারবে না। কেননা, নারীর জন্য মুহরিম ব্যতিরেকে সফর করা হারাম। তাছাড়া, ইসলামী কানূন হচ্ছে মুসাফির তিনদিন তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপর মসেহ করতে পারে। তখন এ নিয়মও প্রত্যেক মুসাফিরের বেলায় প্রযোজ্য হতে পারবেনা; যেমনটি আমি ইতোপূর্বে আরয করেছি। সুতরাং উচিৎ হবে- কমপক্ষে কোন একটা সীমা নির্দ্ধারিত হওয়া, যাকে শরীয়তসম্মত যুক্তিও সফর বলে মানতে পারে। আর যা দ্বারা ইসলামী কানূন ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জারী হতে পারে। ওই সময়সীমা হচ্ছে তিনদিনই।

তদুপরি, তিনদিনের দূরত্বের সফর হওয়া তো নিশ্চিত। এর থেকে কম দূরত্বের সফর হওয়া সন্দেহপূর্ণ। নামাযের চার রাক্'আত নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। সুতরাং নিশ্চিত জিনিষকে সন্দেহপূর্ণ জিনিষ দ্বারা বাদ দেওয়া যায় না। 'ইয়াক্বীন' (নিশ্চিত)কে 'ইয়াক্বীন'ই দূর করতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

আপত্তি-১.

এ মাসআলায় ওহাবীরা শুধু একটা হাদীস পেয়েছে, যা ভিন্ন ভিন্ন হাদীসগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রাভী (বর্ণনাকারী) থেকে বর্ণিত। সুতরাং ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِيْنَةِ اَرْبَعًا وَصَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায মদীনা মুনাওয়ারায় চার রাক্'আত পড়েছেন এবং যুলহুলায়ফায় আসরের নামায দু' রাক্'আত পড়েছেন।

দেখুন, যুল হুলায়ফাহ্ মদীনা শরীফ থেকে শুধু তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত। যাকে আজকাল বি'রে আলী বলা হয়। এটাই মদীনাবাসীদের জন্য হজ্জের মীক্বাত। যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফ থেকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন শুধু তিন মাইল দূরত্বে গিয়ে ক্বসর করতেন।

খন্ডন.

এ হাদীসে ভ্রমণের জন্য শুধু যুল হুলায়ফা পর্যন্ত যাওয়ার উল্লেখ নেই; বরং এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জের জন্য তাশরীফ নিয়ে যাবার ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে। অর্থাৎ হুযূর-ই আকরাম হজ্জের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে রওনা হয়ে যুল খুলায়ফাহ্ পৌঁছলে আসরের সময় হয়ে যায়। সুতরাং যেহেতু তিনি আগে যাচ্ছিলেন, সেহেতু এখানে ক্বসর পড়েছেন। এ কারণে এখানে বলা হয়েছে- صَلَّى الظُّهْرَ (তিনি যোহরের নামায পড়েছেন)। একবার মাত্র এ ঘটনা ঘটেছে। كَانَ يُصَلِّىْ (নামায পড়তেন) বলা হয়নি; যা থেকে প্রতীয়মান হতো যে, তিনি সব সময় এমনটি করতেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যা হচ্ছে ওই হাদীস, যা মুআত্তা-ই ইমাম মালিক এবং মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ -এ হযরত নাফি' থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। তা নিম্নরূপ:

اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ اِذَا خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلٰوةَ اِلَى الْحُلَيْفَةِ

অর্থঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর যখন হজ্ব কিংবা ওমরাহ করার জন্য রওনা হতেন, তখন যুলহুলায়ফায় পৌঁছে ক্বসর পড়তেন।

হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার এ আমল শরীফ তোমাদের পেশকৃত হাদীসের তাফসীর বা ব্যাখ্যা। এ থেকে ফিক্বহী মাসআলা এটা বুঝা গেলো যে, যে ব্যক্তি সফরের ইচ্ছা করে আপন মাতৃভূমি থেকে রওনা হয়ে যায়, তার লোকালয় থেকে বের হতেই নামায ক্বসর পড়বে। আর ফিরে এসে আপন লোকালয়ে প্রবেশ করতেই সে মুক্বীম হয়ে যাবে। এ হাদীস শরীফ আমাদের একেবারে অনুকূলে।

আপত্তি-২.

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে মহিলা আল্লাহ্ তা'আলা এবং ক্বিয়ামতের উপর ঈমান রাখে, তার জন্য এটা হালাল নয় যে, একদিন ও এক রাতের দুরত্বের সফর মুহরিম ছাড়া করবে।

এ হাদীস শরীফ দ্বারা বুঝা যায় যে, একদিন এক রাতের দূরত্ব অতিক্রম করা সফর। কারণ এটাকে হুযূর-ই আক্রাম সফর বলেছেন এবং তাঁর উপর সফরের বিধানাবলী জারী করেছেন। অর্থাৎ নারীর জন্য মুহরিম ছাড়া এতটুকু দূরে যাওয়া হারাম করে দেওয়া হয়েছে। বুঝা গেলো যে, সফরের জন্য তিন দিনের দুরত্ব অতিক্রম করা জরুরী নয়। একদিনেরও হয়ে যায়।

খন্ডন

এর দু'টি জবাব রয়েছে-

এক. আপনাদের মাযহাব এ হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হলো না। তোমাদের মাযহাব তো এ যে, শহরের বাইরে এক মাইল/দু' মাইল ভ্রমণের জন্য যাওয়াও সফর। আর এ হাদীসে একদিন ও রাতের দুরত্বের শর্তারোপ করা হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস তোমাদেরও বিপক্ষে।

দুই. আমি প্রথম পরিচ্ছেদে তিন দিনের রেওয়ায়ত এ বোখারী শরীফেরই পেশ করছি। আমরা দু'টি রেওয়ায়ত পেয়েছি, তিনদিন বিশিষ্ট ও একদিন বিশিষ্ট। যদি এক দিনের হাদীস প্রথমে এরশাদ হয় এবং তিনদিনের হাদীস পরবর্তী সময়ে বর্ণিত হয়, তাহলে একদিন বিশিষ্ট হাদীস মান্‌সূখ (রহিত)। আর যদি তিনদিন বিশিষ্ট হাদীস প্রথমে বর্ণিত হয় এবং একদিন বিশিষ্ট হাদীস পরবর্তীতে বর্ণিত হয়, তাহলে তিনদিন বিশিষ্ট হাদীস একদিন বিশিষ্ট হাদীস দ্বারা মান্‌সূখ হতে পারে না। কেননা, তিন দিনে একদিনও এসে যায়। আর যখন একদিনের দুরত্বে নারীর জন্য একাকী সফর করা হারাম হয়, তাহলে তিনদিনের সফরও হারাম হবে। সুতরাং তিনদিনের বর্ণনা যে কোন অবস্থাতেই আমল করার উপযোগী। আর একদিনের হাদীসের উপর আমল সন্দেহপূর্ণ। এ কারণে একদিনের হাদীস আমলযোগ্য নয়। তিনদিনের হাদীসই আমলযোগ্য। কারণ, হারাম হওয়া সন্দেহ দ্বারা প্রমাণিত হয় না। যেকোন অবস্থাতেই সফরের সময়সীমা তিনদিনের দূরত্বই হতে পারে।

আপত্তি-৩.

আজকাল মোটরগাড়ী ও রেল গাড়ী ইত্যাদিতে তিনদিনের সফর এক ঘন্টায় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। সুতরাং বলো মোজাগুলোর উপর মসেহের সময়সীমা তিন দিন এ মুসাফির কীভাবে পূর্ণ করবে? আপনাদের অভিমতানুসারেও এ হাদীস সাধারণভাবে আমলযোগ্য হলো না!

খন্ডন.

এ আপত্তি একবারে অনর্থক। একেতো কানূনের নিজের রোগ; অর্থাৎ কানূন খোদ্ সর্বত্র জারী হতে পারছে না! এটা হচ্ছে কানূনের দুর্বলতা (ত্রুটি)।

একটা হলো কোন কারণবশতঃ কানূন জারী না হওয়া। এটা কিন্তু কানূনের নিজস্ব রোগ বা দুর্বলতা নয়। শরীয়তে সফরে পদব্রজে কিংবা উটের গতি বিবেচ্য। যদি তা তিন দিনের হয় তাহলে সফর। এ গতিতে প্রত্যেক মুসাফিরের উপর এ মসেহের কানূন কার্যকর হওয়া চাই। যদি কেউ এক ঘন্টায় এতটুকু দুরুত্ব সফর করে ফেলে, তাহলে এটা একটা বাহ্যিক কারণ হলো; যার কারণে সে কানূনের আওতায় আসা থেকে বেঁচে গেলো। কানূন আপন জায়গায় সঠিক। আপনাদের কথার কারণে কানূনে দুর্বলতা আসে। সুতরাং আপনাদের কথা বাতিল। আমাদের অভিমতই সঠিক। ---o---

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

[সফরে সুন্নাত ও নফল পড়ার বিধান]

সফরে সুন্নাত ও নফল পড়ার বিধান

মুসাফিরের জন্য সফররত অবস্থায় শুধু ফরয নামাযে ক্বসর করার হুকুম রয়েছে। অর্থাৎ চার রাক্'আতের ফরযকে দু' রাক্'আত পড়বে। ফরয ব্যতীত সমস্ত নফল ও সুন্নাত নামায এবং বিতর ঘরের মতো পুরোপুরি পড়বে। এসব নামাযের যে হুকুম ঘরে রয়েছে, ওই একই হুকুম সফরেও রয়েছে। না এসব নামাযে ক্বসর আছে, না এ নামাযগুলো নিষিদ্ধ, না একেবারে মাফ। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীরা সফরে নফল নামায না নিজেরা পড়ে, না অন্য লোকদেরকে পড়তে দেয়। কেউ কেউ তো এ'তে অত্যন্ত কঠোর। এ জন্য আমি এ অধ্যায়ের বিন্যাসও দু'টি পরিচ্ছেদে করেছি- প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলার শরীয়তসম্মত দলীলাদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর বিপক্ষে ওহাবীদের আপত্তিসমূহ, সেগুলোর খন্ডন সহকারে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করুন! আ-মী-ন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সফরে সুন্নাত, বিতর ও নফল পুরোপুরি পড়বেন

মুসাফির শুধু চার রাক্'আত ফরযে ক্বসর করবে। অবশিষ্ট সমস্ত নামায পুরোপুরি পড়বে। সেটাকে রুখে দেওয়া কিংবা নিষেধ করা জঘন্য অপরাধ ও গুনাহ্। দলীলাদি নিম্নরূপ:

দলীল-১.

মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَا صَلّٰى তরজমা: আপনি কি ওই মারক্বুদ (ধিক্কৃত)কে দেখেছেন, যে মু'মিন বান্দাকে বাধা দেয়, যখন সে নামায পড়ে।

বুঝা গেলো যে, মুসলমানদেরকে নামায পড়তে বাধা দেওয়া কাফিরদের প্রথা এবং মহান রবের নিকট অতীব অপছন্দনীয়। এজন্য ফক্বীহগণ বলেন, যদি কেউ মাকরূহ সময়ে নামায পড়তে আরম্ভ করে, তবে তকে বাধা দিওনা; যাতে এ আয়াতের (হুমকি) আওতায় না আসেন। যখন নামায শেষ করে নেয়, তখন মাসআলা বলে দেবে। [শামী ইত্যাদি]

এ থেকে ওহাবীদের শিক্ষা গ্রহণ করা চাই, যারা মুসাফির মুসলমানদেরকে সুন্নাত ও নফল পড়া থেকে অতি কঠোরভাবে বাধা দেয়; বরং লড়তে-মরতেও তৈরী হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তা নামাযই তো। এটার প্রতি এতো চড়া ও কড়া মনোভাব কেন?

দলীল-২

মহান রব মক্কার কাফিরদের দোষ-ত্রুটিগুলো এভাবে বর্ণনা করছেন-

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍۭ بِنَمِيْمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ

তরজমা : তার কথা মানবে না, যে বেশি পরিমাণে শপথকারী, অপমাণিত, চুগলখোর, সৎকাজে বাধাদাতা, সীমাতিক্রমকারী, জঘন্য গুনাহ্গার।

বুঝা গেলো যে, লোকজনকে সৎকাজে বাধা দেওয়া কাফিরদের কুপ্রথা। তাদের কথা মোটেই মান্য না করা চাই। মুসলমানদেরকে সৎকার্যাদি থেকে বাধা দেওয়া ওহাবীদের জীবনের অতি পছন্দনীয় কাজ। তারা সিনেমা, জুয়া ও মদ্যপান দেখে উত্তেজিত হয়নি; তাহলে তারা ক্রোধান্বিত হয় কোন কাজ দেখে? সফরে সুন্নাত ও নফল নামায পড়লেই তাদের মেজাজ চড়ে যায়। কোন মুসলমান যেন তাদের কথা না মানে; বরং এ আয়াত শরীফ অনুসারে কাজ করবেন।

দলীল-৩.

মহান রব মু'মিনদের প্রশংসা করেছেন। তিনি এরশাদ করেন-

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

তরজমা: মু'মিন হচ্ছে তারা যে, যদি আমি তাদেরকে পৃথিবীতে বাদশাহী (শাসন ক্ষমতা) প্রদান করি; তবে তারা নামাযসমূহ কায়েম করে, সৎ কাজগুলোর নির্দেশ দেয় এবং মন্দ কাজগুলোতে বাধা দেয়।

যদি, খোদা না করুন, পৃথিবীতে ওহাবীদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়; তবে তারা লোকজনকে কোন জিনিষ থেকে বাধা দেবে? তারা বাধা দেবে সফরে সুন্নাত ও নফল পড়তে, আল্লাহর যিক্রের মজলিসগুলো করতে, মীলাদ শরীফ, খতম, ফাতিহা এবং ক্বোরআন তিলাওয়াত থেকে। তারা কোন জিনিষের হুকুম দেবে? তারা হুকুম দেবে-নাপাক কূপ থেকে ওযূ করার, কাক ও অন্ডকোষ খাওয়ার, শিশুদের প্রস্রাব ও বীর্যকে পবিত্র মনে করার, নিজের বীর্য দ্বারা দ্বারা যিনা করার ফলে ভূমিষ্ঠ কন্যার সাথে বিবাহ করে নেওয়ার; যেমনটি আমি এ কিতাবের শেষভাগে ওহাবীদের বিশেষ বিশেষ কতগুলো মাসআলা বর্ণনা করবো- ইন্শা-আল্লাহ্। (ওইগুলোর মধ্যে এসব বিষয়ও রয়েছে।)

হাদীস-৪ ও ৫

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ত্বাহাভী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তবে কিছুটা শাব্দিক ভিন্নতা সহকারে-

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ سَوَاءً ثَلٰثَ رَكْعَاتٍ وَلَا يَنْقُصُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ وَهِيَ وِتْرُ النَّهَارِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ঘরে ও সফরে নামাযসমূহ পড়েছি। সুতরাং আমি হুযূর-ই আক্রামের সাথে ঘরে যোহরের নামায চার রাক্'আত পড়েছি। এরপর দু' রাক্'আত সুন্নাত পড়েছি আর হুযূর-ই আক্রামের সাথে সফরে যোহর দু' রাক্'আত পড়েছি। এরপর দু' রাক্'আত সুন্নাত। আসর দু' রাক্'আত পড়েছি। এরপর তিনি কিছুই পড়েননি, মাগরবি ঘরেও সফরে এক সমান তিন রাক্'আত পড়েছেন। এর থেকে কম করতেন না; না ঘরে, না সফরে। তা হচ্ছে দিনের বিতর। এরপর দু' রাক'আত সুন্নাত পড়েছেন।

ত্বাহাভী শরীফে নিম্নলিখিত শব্দগুলো বেশি রয়েছে-

وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

অর্থ: হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এশার নামায দু' রাক্'আত পড়েছেন এরপর দু' রাক্'আত। দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফরে যোহরের ফরয দু' রাক্'আত এবং এরপর সুন্নাত দু' রাক্'আত, মাগরিবের ফরয তিন রাক্'আত এবং এরপর সুন্নাত দু' রাক্'আত, এশার ফরয দু' রাক্'আত, এরপর দু' রাক্'আত সুন্নাত পড়েছেন। যদি সফরে সুন্নাত কিংবা নফল পড়া নিষিদ্ধ হতো, তবে সরকার-ই পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেন পড়তেন? এ ওহাবীরা সুন্নাতের বিরোধিতায় অতি কট্টর!

হাদীস-৬ ও ৭

ইমাম আবূ দাঊদ ও তিরমিযী হযরত বারা ইবনে আযিব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ اِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে আঠারটি সফর করেছি। আমি তাঁকে দেখিনি যে, তিনি সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর যোহরের পূর্বেকার দু' রাক্'আত নফল ছেড়ে দিয়েছেন।

হাদীস -৮

ইমাম আবূ দাঊদ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَافَرَ وَاَرَادَ اَنْ يَتَطَوَّعَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন সফর করতেন এবং নফল পড়তে চাইতেন, তখন আপন উটনীকে ক্বেবলার দিকে ফেরাতেন তারপর তাকবীর বলে নফল পড়তেন।

হাদীস- ৯ ও ১০

ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِيْ اِيْمَاءً صَلٰوةَ اللَّيْلِ اِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফরে আপন বাহনের উপর নফল পড়তেন- যে দিকেই সেটা চেহারা ফেরাক না কেন। তখন তিনি ইঙ্গিতে নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদের নামায। ফরয ব্যতীত বিতরও বাহনের উপর পড়তেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফরে পথ অতিক্রম করতে করতে তাহাজ্জুদের নামাযও পড়ে নিতেন। আর এসব লোক (লা-মাযহাবীরা) যাত্রাবিরতিকারী মুসাফিরকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ পর্যন্ত পড়তে বাধা দিচ্ছে।

হাদীস-১১

মুআত্তা-ই ইমাম মালিক-এ হযরত নাফি' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ اِنَّ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى اِبْنَهُ عُبَيْدَاللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ

অর্থ: তিনি বলেন, নিশ্চয় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা আপন পুত্র ওবায়দুল্লাহকে সফরে নফল করতে দেখতেন। তখন নিষেধ করতেন না।

হাদীস-১২.

ইমাম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সফরে যোহরের দু' রাক্'আত নামায পড়েছি। এরপর দু' রাক'আত সুন্নাত। এটা ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন আর বলেছেন- এ হাদীস 'হাসান' পর্যায়ের।

হাদীস-১৩ ও ১৪

ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবূ দাঊদ হযরত আবূ ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে সফরে তা'রীসের রাতে ফজরের নামায ক্বাযা হয়ে যাবার অতি দীর্ঘ হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন, যার একাংশ নিম্নরূপ-

صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ كَمَا كَانَ يُصَلِّىْ

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাতগুলো ফরযের পূর্বে পড়েছেন। তার ফজরের ফরয পড়েছেন, যেমন সবসময় পড়তেন।

হাদীস ১৫-১৮

সর্ব ইমাম বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও আবূ দাউদ হযরত ইবনে আবী ইয়া'লা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ مَا اَخْبَرَنَا اَحَدٌ اَنَّه رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الضُّحٰى غَيْرُ اُمِّ هَانِئٍ ذَكَرَتْ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِىْ بَيْتِهَا فَصَلّٰى ثَمٰنَ رَكَعَاتٍ

অর্থ: তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত উম্মে হানী ব্যতীত অন্য কেউ এ খবর দেননি যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে চাশ্তের নামায পড়তে দেখেছেন। হযরত উম্মে হানী বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে গোসল করেছেন। আর আট রাক্'আত চাশতের নফল নামায পড়েছেন।

দেখুন, মক্কা বিজয়ের দিন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম মক্কা মু'আয্যামায় মুসাফির ছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্

সালাম আপন বোন উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিবের ঘরে চাশ্তের আট রাক্'আত নামায পড়েছেন; অথচ চাশ্তের নামায নফলই।

হাদীস-১৯.

ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الْحَضَرِ وَصَلٰوةَ السَّفَرِ فَكُنَّا نُصَلِّىْ فِى الْحَضَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا وَكُنَّا نُصَلِّىْ فِى السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

অর্থ: তিনি বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরেও ফরয নামায সম্পন্ন করেছেন, সফরেও। আমরা নিজ ঘরে ফরয নামাযের পূর্বে এবং পরে নফল পড়তাম এবং সফরেও ফরযের পূর্বে ও পরে নফল নামায পড়তাম।

হাদীস-২০

সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ النَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِىْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাহনের উপর ক্বেবলা ব্যতীত অন্য দিকে নফল নামায পড়তেন।

যুক্তির দাবীও এযে, সফরে সুন্নাত ও নফল না মাফ হোক, না ক্বসর করা হোক। এটাও কয়েকটা কারণে-

এক. হাদীসসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মি'রাজের রাতে নামায দু' দু' রাক্'আত করে ফরয হয়েছে। তারপর সফরে ওই দু' রাক্'আতই রয়েছে। নিজ ঘরে কোন কোন নামাযে পরিবর্দ্ধন করা হয়েছে। আর প্রকাশ থাকে যে, মি'রাজে ফরয নামাযই অপরিহার্য করা হয়েছিলো, সুন্নাত ও নফল ইত্যাদি নয়। সুতরাং ক্বসরও শুধু ফরয নামাযে হওয়া চাই; নফল ও সুন্নাতে না।

দুই. সফরের অবস্থায় ফরয নামাযে অনেক পাবন্দী (কড়া নিয়ম) রয়েছে- যেমন, বাহনের উপর, চলন্ত রেল গাড়ীতে এবং ক্বেবলা ব্যতীত অন্য দিকে সম্পন্ন হতে পারে না। কিন্তু সুন্নাত ও নফল নামাযে কোন কড়া নিয়ম (পাবন্দী) নেই- বাহনের উপর, ক্বেবলা ব্যতীত অন্য যে কোন দিকেও সম্পন্ন করা যায়। ফরযের জন্য মুসাফিরকে সফর ভাঙ্গতে হয় অর্থাৎ যাত্রা বিরতি করতে হয়। যার ফলে বিলম্ব হয়ে যায়। এজন্য ওই নামাযকে অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু

সুন্নাত ও নফলের জন্য সফর ভাঙ্গতে হয় না, চলন্ত বাহনের উপরও সম্পন্ন করে নেওয়া যায়। এ জন্য তাতে না ক্বসরের প্রয়োজন হয়, না মাফ করার প্রশ্ন আসে। এটা মনে করা যে, যখন সফরে ফরয কম করা হয়েছে, তখন সুন্নাতগুলোও কম হওয়া উচিৎ, এটা জঘন্য ভুল ধারণা।

দেখুন, জুমার ফরয নামায চার রাক্'আতের পরিবর্তে দু' রাক্'আত। কিন্তু সুন্নাতকে হ্রাস করা হয়নি। ফরয পৃথক নামায, সুন্নাত ও নফল পৃথক। অর্থাৎ সুন্নাত ও নফল ফরযের এমন কোন অনুগামী নয় যে, যদি ফরয পূর্ণাঙ্গ পড়া হলে সুন্নাতগুলোও পূর্ণাঙ্গভাবে পড়তে হবে, আর যদি ফরযে ক্বসর ক্বসর করা হয়, তবে সুন্নাতগুলোতেও ক্বসর করা হয়, তবে সুন্নাতগুলোতে ও ক্বসর করতে হবে। অথবা একেবার মাফ হয়ে যাবে।

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীদের নিকট এ মাসআলার বিপক্ষে খুব কম দলীলই রয়েছে; যেগুলোকে তারা সর্বত্র শব্দাবলী পরিবর্তন করে বর্ণনা করে। আমরা তাদের আপত্তিগুলো উল্লেখ করে সেগুলোর খন্ডন করার প্রয়াস পাচ্ছি-

আপত্তি-১

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম প্রমুখ হযরত হাফ্স ইবনে আসিম থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ صَحِبْتُ اِبْنَ عُمَرَ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ فَصَلّٰى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَآءَ رَحْلَهٗ وَجَلَسَ فَرَاَنَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَآءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا اَتْمَمْتُ صَلٰوتِىْ لِصَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لاَ يَزِيْدُ فِى السَّفَرِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ وَاَبَابَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَالِكَ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সাথে মক্কা মু'আয্যামায় রাস্তায় ছিলাম। তখন তিনি আমাদেরকে যোহরের নামায দু'রাক'আত পড়িয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর মানযিলে তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং বসে গেলেন, তখন তিনি কিছু লোককে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখলেন, বললেন, এসব লোক কি করছে? আমি আরয করলাম, "তারা নফল পড়ছে।" তিনি বললেন, "যদি আমি নফল পড়তাম, তবে তো নামাযই পুরোপুরি পড়তাম। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি সফরে দু' রাক্'আত অপেক্ষা বেশী পড়তেন না। আর আমি হযরত আবূ বকর, হযরত ওমর ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমকে এমনই (করতে) দেখেছি।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সফরে নফল ও সুন্নাত পড়া সুন্নাত-ই রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম) ও সুন্নাত-ই খোলাফা-ই রাশেদীনের পরিপন্থী। এ জন্য মুসাফির দু'রাক্'আত ফরয পড়বে, আর কিছু পড়বে না।

খন্ডন

এ আপত্তির কয়েকটা জবাব রয়েছে-

এক. এ হাদীস, হে আপত্তিকারীরা, আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, এ হাদীস শরীফ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফা-ই রাশেদীন সফরে কখনো দু' রাক্'আত ফরযের চেয়ে বেশি পড়েননি। আর আপনারা বলছেন যে, মুসাফির ইচ্ছা করলে ক্বসর পড়বে, অথবা পূর্ণ পড়বে। আপনারা পূর্ণ নামায পড়ার হুকুম এ হাদীসের বিপরীত কেন দিলেন?

দুই. হুযূর-ই আক্রামের এ হাদীস শরীফ থেকে নফল না পড়া প্রমাণিত হয়। আর আমাদের পেশ কৃত বহু হাদীস থেকে নফল পড়া প্রমাণিত হয়। সুতরাং আপনারা এ অনেক হাদীসের বিপক্ষে শুধু একটি হাদীস অনুসারে কেন আমল করছেন? ওই হাদীসগুলো অনুসারে কেন আমল করছেননা? শুধু কুপ্রবৃত্তির টানে নয় কি? কারণ, 'নাফসে আম্মাহ'র উপর নামায ভারী অনুভূত হয়।

তিন. খোদ্ সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার ওই হাদীসগুলো আমরা প্রথম পরিচ্ছেদে পেশ করেছি, যেগুলোতে তিনি বলছেন, ''আমি হুযূর-ই পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সফরে বাহনের উপর নফল পড়তে দেখেছি।'' তারপর ওই নফল ইত্যাদি পড়ার পক্ষের প্রমাণের হাদীসগুলোকে আপনারা কেন ক্বুবূল করছেন না? শুধু এ একটি হাদীসের উপর কেন আমল করছেন? নামাযকে কি হ্রাস করার আগ্রহ আছে?

চার. যখন ইতিবাচক ও নেতিবাচকের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়, তখন ইতিবাচককে নেতিবাচকের উপর প্রাধান্য দিতে হয়, যখন হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার দু' ধরনের রেওয়ায়ত রয়েছে- নফল পড়ার পক্ষে এবং নফল পড়ার বিপক্ষে, তখন নফল পড়ার পক্ষের রেওয়ায়তটি আমল করার উপযোগী হবে, না পড়ার পক্ষের না। দেখুন, হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর সশরীর মি'রাজ হয়নি, অন্যান্য সাহাবীগণ বলছেন, স্বশরীর মি'রাজ হয়েছে। আজ সমগ্র দুনিয়া সশরীর মি'রাজের প্রবক্তা। কেন? এ কারণে যে, ইতিবাচক, নেতিবাচকের উপর প্রাধান্য পেয়েছে।

পাঁচ. যখন হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, তখন সেগুলোর এমন অর্থ করা চাই, যার ফলে পরস্পর বিরোধ দূরীভূত হয়ে যায়। যখন হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার রেওয়ায়তগুলোতে পরস্পর বিরোধ রয়েছে, তখন আপনাদের পেশ কৃত এ হাদীসের অর্থ এটা দাঁড়ায় যে, 'নফল

নামায গুরুত্বের সাথে পড়বে। ওইগুলোর জন্য যাত্রাবিরতি করবে, দস্তর মতো নেমে পড়বে, যমীনের উপর দাঁড়িয়ে পড়বে, চলমান বাহনের উপর নফল পড়াকে জায়েয মনে করবে না। এটা না হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম থেকে প্রমাণিত, না খোলাফা-ই রাশেদীন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে। সুতরাং এ হাদীসের কিছু সংখ্যক শব্দও একথা বলছে যে, বর্ণনাকারী বলছেন, তিনি কিছুলোককে তাঁবুতে দাঁড়িয়ে নফল পড়তে দেখে একথা বলেছিলেন। অবস্থাটাও ছিলো সফরের, সফরও হজ্জের ছিলো, রাস্তাও দীর্ঘ পড়ে রয়েছিলো, তাড়াতাড়ি পৌঁছানোও জরুরী ছিলো, ওইসব হযরতের আমলের ওই পদ্ধতি অবলম্বনের কারণে সফরে কষ্ট পাবার আশংকা ছিলো। এ কারণে তিনি এটা বলেছিলেন। সুতরাং এ হাদীস না অন্য হাদীসগুলোর পরিপন্থী, না খোদ্ হযরত ইবনে ওমরের অন্যান্য রেওয়াতগুলোর বিরোধী। হে বিরুদ্ধবাদীরা, হাদীসে পরস্পর বিরোধ সৃষ্টি করবেন না; বরং সামঞ্জস্যের পথ বের করার চেষ্টা করুন।

ছয়. আপনাদের পেশকৃত এ হাদীসেও সফরে নফল পড়ার নিষেধ নেই। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা নিছক ক্বিয়াস করেই একথা বলেছেন যে, যদি নফল পড়ার প্রতি এমন গুরুত্ব আরোপ করা জরুরী হতো, তা হলে ফরয নামাযকে কেন পূর্ণাঙ্গভাবে পড়া হয় না?

আপত্তি-২.

যখন সফরে ফরয নামাযই চার রাক্'আতের স্থলে দু' রাক্'আত হয়ে গেছে, তখন সুন্নাত ও নফল তো ফরয নামায অপেক্ষা মর্যাদায় কম। সুতরাং উচিৎ ছিলো হয়তো তাও চার রাক্'আতের স্থলে দু' রাক্'আত হয়ে যাওয়া অথবা একেবারে মাফ হয়ে যাওয়া।

খন্ডন

আলহামদু লিল্লাহ্, আপনারা 'ক্বিয়াস'কে স্বীকার করে নিলেন। অর্থাৎ সুন্নাতকে ফরযের উপর ক্বিয়াস করতে শুরু করেছেন; কিন্তু আপনারা যেমন, আপনাদের ক্বিয়াসও তেমন। উত্তম হতো- মুজতাহিদ ইমামগণের ক্বিয়াসের অনুসরণ করলে। তা হলে তো আপনাদেরকে এমন ঢং বিহীন ক্বিয়াস করতে হতো না। ওহে জনাব! সুন্নাত ও নফলকে ফরযের উপর ক্বিয়াস করা যায় না। কারণ, ফরয নামাযে শুধু প্রথম দু' রাক্'আতে ভরপুর করে পড়া হয়, পরবর্তী দু' রাক্'আত কিছুটা খালি রেখে পড়া হয়; কিন্তু সুন্নাত ও নফলে তো চার রাক্'আত-ই ভরপুর

করে পড়তে হয়। বলুনতো, ওখানে সুন্নাত ও নফল ফরযের মতো কেন হলো না? ওখানেও বলে দিন- যখন ফরযের মধ্যে দু' রাক্'আতে কিছুটা খালি রাখা হয়, তখন উচিৎ ছিলো- সুন্নাত ও নফলের চার রাক্'আতে কিছুটা খালি থাকা। জুমার নামাযে ফরয নামায চার রাক্'আতের স্থলে দু' রাক্'আত হয়ে যায়; কিন্তু সুন্নাতগুলোর সংখ্যা হ্রাস পাবার স্থলে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। অর্থাৎ জুমার ফরযের পর চার রাক্'আত সুন্নাতই মু'আক্কাদাহ্ হিসেবে পড়তে হয়। ওখানেও আপনাদের উচিৎ এমনি ক্বিয়াস করা। আর বলা- যখন জুমার ফরয নামায চার রাক্'আতের স্থলে দু' রাক্'আত হয়ে গেলো, সুতরাং উচিৎ ছিলো- জুমার পরবর্তী সুন্নাতগুলো দু' রাক্'আতের স্থলে এক রাক্'আত হয়ে যাওয়া। বস্তুত সুন্নাত ও নফল নামাযে ক্বসর না থাকার কারণও আমরা প্রথম পরিচ্ছেদের যুক্তিগত দলীলগুলোতে আরয করেছি। মুসাফিরকে সুন্নাতের জন্য সফর ভঙ্গ করা (যাত্রাবিরতি করা)'র প্রয়োজন হয় না; বাহনের উপরই পড়ে নেওয়া যায়। এ জন্য ওইগুলোতে ক্বসরের প্রশ্নই আসে না।

জরুরী নোট

এ যে বলা হলো- নফল ও সুন্নাত নামায বাহনের উপরও পড়া যায়, বাহনের মুখ যেদিকেই থাকুক কেন? এটা মুসাফিরের জন্য পথ অতিক্রম করার অবস্থায়ই, যখন সে মরুভূমিতে থাকে; শহরে কিংবা অন্য কোন জায়গায় অবস্থানরত অবস্থার এ বিধান নয়। যদি মুসাফির কোন বস্তিতে দু' চার দিনের জন্য অবস্থান করে, তবে সুন্নাত এবং নফলও ফরযের মতো সমস্ত পূর্বশর্ত ও আরকান সহকারে সম্পন্ন করবে। গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের মতে, মুসাফির-চাই রাস্তা অতিক্রমকারী অবস্থায় থাকুক অথবা কোথাও দু/চার দিনের জন্য অবস্থানরত থাকুক, সুন্নাত ও নফল পড়বে না।

আপত্তি-৩.

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন 'রাহমাতুল্লিল আলামীন'। যখন মহান রব সফরে তাঁর ফরয নামাযে বিশেষ বিবেচনা করেছেন, তখন হুযূর-ই করীমের জন্যও তাঁর সুন্নাতগুলোকে হ্রাস করা শোভনীয়; সুন্নাত অপরিবর্তিত থাকা হুযূর-ই আকরামের রহমতের বরখেলাফ।

খন্ডন

জ্বী-হাঁ, যেহেতু হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রহমতে আলম, সেহেতু হুযূর-ই আক্রাম তাঁর সুন্নাতগুলোকেও হ্রাস কারণ, নামায হচ্ছে- রহমত, বোঝা নয়। হয়তো ওহাবীদের নাফ্সের উপর নামায বোঝা। এজন্য তাদের মনে এমন এমন প্রশ্ন জাগে। ওহে জনাব, আল্লাহ্ তা'আলার ফরয মু'মিন বালেগ হলেই বর্তায়। আর মৃত্যু বরণের পূর্বে ছেড়ে দেয়; কিন্তু সুন্নাতে রসূল কোন সময়, কোন অবস্থায় মু'মিনের সঙ্গ ছাড়ে না। মু'মিন সুন্নাতের রসূলের বাহু বন্ধনে পয়দা হয়, সুন্নাতের ছায়ায় লালিত-পালিত হয়, সুন্নাতে দামনে মৃত্যুবরণ করে, আর ইনশা-আল্লাহ্ সুন্নাতের মালিক ও প্রবর্তক মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পৃষ্ঠপোষকতায় ক্বিয়ামতে উঠবে। দেখুন, খৎনা, আক্বীকা, শিশুকে দু' বছর যাবৎ দু' পান করানো সুন্নাতই। তারপর মৃত্যুবরণ করার সময় ওযূ করানো, কা'বার দিকে মুখ করিয়ে দেওয়া, পুরুষের কাফন তিন কাপড়ে এবং নারীর কাফন পাঁচ কাপড়ে হওয়া- এসবই সুন্নাত।

এজন্য আমাদের নাম 'আহলে ফয়য' কিংবা 'আহলে ওয়াজিব' নয়; বরং 'আহলে সুন্নাত'। আমাদের হুযূর-ই আক্রামের সুন্নাত রহমতই, বোঝা নয়। রহমত কম না হওয়াই উত্তম। মহান রব 'মালিকুল মুলক' (বিশ্ব রাজ্যের মালিক)। তিনি মহান; যখন চান জান্নাতী করেন, যখন চান রহমত দান করেন; তাঁর রহমতগুলো এক সমান হয় না; কখনো কম হয়, কখনো বেশী। অনুরূপ, ফরয নামায মুক্বীমের জন্য পুরোপুরি; মুসাফিরের জন্য অর্দ্ধেক।

সপ্তদশ অধ্যায়

[সফরে ক্বসর ওয়াজিব]

সফরে ক্বসর ওয়াজিব

শরীয়তের মাসআলা হচ্ছে- মুসাফিরের উপর চার রাক্'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযে ক্বসর পড়া ফরয। মুসাফির এ নামায পুরোপুরি পড়তে পারে না। যদি ভুলবশত: দু' রাক্'আতের স্থলে চার রাক্'আত পড়ে নেয়, তবে তার ওই বিধান হবে, যে ফজরের ফরয নামায চার রাক্'আত পড়ে নেয়। অর্থাৎ যদি প্রথম 'আত্তাহিয়্যাত' পড়ে তৃতীয় রাক্'আত-এর জন্য দাঁড়িয়ে যায়, তবে 'সাজদাহ্-ই সাহ্ভ' করবে। অন্যথায় নামায পুনরায় পড়বে। কিন্তু যদি জেনে শুনে দু'-এর স্থলে চার রাক্'আত পড়ে নেয়, তবে তার নামায হবে না। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীরা বলেন, 'মুসাফিরের জন্য ইখ্তিয়ার আছে- চাই ক্বসর পড়ুক অথবা পুরোপুরি পড়ুক। মুসাফিরের জন্য কোন কিছুতে বাধ্যবাধকতা নেই।' এ জন্য আমি এ অধ্যায়ের দু'টি পরিচ্ছেদ করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের দলীলাদি, আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার বিপক্ষে প্রশ্নাবলী (আপত্তিসমূহ) ও সেগুলোর খন্ডন উল্লেখ করেছি। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ববুল করুন!

প্রথম পরিচ্ছেদ

সফরে ক্বসর জরুরী

সফরে ক্বসর জরুরী হবার পক্ষে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের অনেক প্রমাণ (দলীল) রয়েছে। ওইগুলো থেকে কয়েকটা নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে-

হাদীস-১-৪.

বোখারী, মুসলিম, মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ ও মুআত্তা-ই ইমাম মালিক-এ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ইবারত বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের-

قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ هَاجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِضَتْ اَرْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيْضَةِ الْاُوْلٰى

অর্থ: তিনি বলেন, প্রথমে নামায দু' দু' রাক্'আত করে ফরয হয়েছে। তারপর হুযূর-ই আক্রাম হিজরত করেছেন। তখন নামাযগুলো চার রাক্'আত করে ফরয হয়েছে। আর সফরের নামায প্রথম ফরযের উপরই রয়ে গেছে।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, হিজরতের পূর্বে প্রত্যেক নামাযের দু' রাক্'আত ছিলো। হিজরতের পরে কোন কোন নামায চার রাক্'আত করে দেওয়া হলো; কিন্তু সফরের নামায অনুরূপই রয়ে গেলো। সুতরাং যেমন হিজরতের পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি চার রাক্'আত পড়ে নিতো, তবে তার নামায হতো না, তেমনি এখন যে মুসাফির সফরে চার রাক্'আত পড়ে নেবে, তার নামাযও হবে না। আর 'ফরয' ও 'ফরীদ্বাহ্'-এ দু'টি শব্দের প্রতি অতি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন!

মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম মালিকের বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ-

فُرِضَتِ الصَّلٰوةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِى صَلٰوةِ الْحَضَرِ

অর্থ: প্রথমে সফর ও নিজ বাড়িতে নামাযগুলো দু' দু' রাক্'আত ফরয হয়েছিলো। তারপর সফরের নামায তো তেমনি রয়ে গেলো, আর নিজ বাড়ির নামাযের মধ্যে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

হাদীস-৫-৭

মুসলিম শরীফ, নাসাঈ ও ত্বাবরানী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত-

قَالَ فَرَضَ اللهُ الصَّلٰوةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً

অর্থ: তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের নবীর রসনা শরীফের উপর নিজ বাড়িতে চার রাক'আত আর সফরে দু' রাক্'আত এবং ভয়ের সময় এক রাক্'আত ফরয করেছেন। (অর্থাৎ জামা'আতে এক রাক্'আত)।

এ থেকে সুষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সফরে দু' রাক্'আতই ফরয, যেমন নিজ বাড়িতে ফজরের নামায।

হাদীস-৮-১৩.

বোখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اِلٰى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ

অর্থ: তিনি বলেন, আমরা হুযূর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে মক্কা মু'আয্যামাহ্র দিকে গিয়েছি। তখন হুযূর-ই আন্ওয়ার দু' দু' রাক্'আতই নামায পড়েছিলেন।

হাদীস-১৪-১৬.

বোখারী, মুসলিম ও নাসাঈ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِّنْ اِمَارَتِهٖ ثُمَّ اَتَمَّهَا

অর্থ: তিনি বলেন, আমি মিনাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার পেছনে দু' দু' রাক্'আত পড়েছি। আর হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতের প্রারম্ভিককালেও। তারপর হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পুরোপুরি পড়তে আরম্ভ করেছেন। (বিশেষ কারণে)

হাদীস-১৭.

ইমাম ত্বাবরানী হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اِفْتَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِى السَّفَرِ كَمَا فَرَضَ فِى الْحَضَرِ اَرْبَعًا

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফরে দু' রাক্'আতই ফরয করেছেন, যেমনিভাবে নিজ বাড়ি ঘরে চার রাক্'আত ফরয করেছেন।

হাদীস-১৮.২০

ইমাম নাসাঈ, ইমাম ইবনে মাজাহ্ ও ইমাম ইবনে হাব্বান হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ صَلٰوةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الضُّحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلٰوةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: তিনি বলেন, সফরে নামায দু' রাক্'আত, চাশতের নামায দু' রাক্'আত, ঈদুল ফিতরের নামায দু' রাক্'আত, জুমার নামায দু' রাক্'আত। এ দু'

রাক্'আত পূর্ণাঙ্গই, অপূর্ণ নয়, হুযূর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রসনা শরীফের উপর।

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সফরের নামায দু' রাক্'আত পড়া তেমনি জরুরী, যেমন জুমা ও দু' ঈদের নামায দু' রাক্'আত পড়া।

হাদীস-২১.

ইমাম মুসলিম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে কিছুটা দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার শেষাংশের শব্দাবলী (বচন) নিম্নরূপ-

فَسَاَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَه

অর্থ: আমি হুযূর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ক্বসরের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন হুযূর এরশাদ করেছেন- এটা আল্লাহর সাদক্বাহ্, যা তিনি করেছেন। এ সাদক্বাহ্কে কবূল করো।

এ হাদীস শরীফে اَمْرٌ فَاقْبَلُوْا -এর সীগাহ্ (ক্রিয়ার শব্দরূপ)। امر (নির্দেশ) ওয়াজিব করার জন্য আসে। বুঝা গেলো যে, যে ব্যক্তি সফরে চার রাক্'আত পড়ে, সে আল্লাহ্ তা'আলার সাদক্বাহ্ থেকে বিমুখ হয়। মহান রবের সাদক্বাহ্ কবূল করা এবং সফরে ক্বসর করা ফরয।

হাদীস-২২

ইমাম ত্বাবরানী তাঁর 'মু'জাম-ই সাগীর'-এ সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস্'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ اَبِىْ بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَفَرَّقَتْ بِكُمُ السُّبُلُ فَوَاللهِ لَوَدِدْتُ اَنَّ اَحَظَّى مِنْ اَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ مُتَقَبَّلَتَيْنِ -

অর্থ: তিনি বলেন, আমি সফরে হুযূর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে দু' রাক্'আত পড়েছি, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্বের পেছনে দু' রাক্'আত পড়েছি। তারপর তোমাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন পথ পরস্পর বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। মহান রবেরই শপথ! আমি আরয করছি যেন আমি চার রাক্'আতের স্থলে দু' মাক্ববূল রাক্'আতের হিস্সা পাই।

আমি নমুনা স্বরূপ শুধু বাইশটি হাদীস শরীফ পেশ করেছি। অন্যথায় এ প্রসঙ্গে অগণিত হাদীস রয়েছে। এসব পেশকৃত হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেলো যে,

সফরে ক্বসরই ফরয। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফা-ই রাশেদীন ক্বসরই পড়েছেন। চার রাক্'আত পড়তে সাহাবা-ই কেরাম হয়তো নিষেধ করেছেন নতুবা সেটার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

আক্বল বা যুক্তির দাবীও এযে, সফরে ক্বসরই ফরয। মুসাফিরকে ক্বসর কিংবা পূর্ণ পড়ার অনুমতি দেওয়া 'আক্বল-ই শর'ঈ' (শরীয়তসম্মত ক্বিয়াস)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, সফরে প্রত্যেক চার রাক্'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দু' রাক্'আত সর্বসম্মতভাবে ফরয, শেষ দু' রাক্'আত সম্পর্কে প্রশ্ন জাগছে যে, তাও মুসাফিরের উপর ফরয কিনা। যদি ফরয হয়, তবে সেগুলো না পড়ার ইখতিয়ার কেন দেয়া হবে? ফরয তো ফরযই, তাতে ইখতিয়ার থাকে না। ফরয ও ইখতিয়ার একত্রিত হতে পারে না। আর যদি ফরয না হয় বরং নফলই হয়; তবে একটি মাত্র তাকবীর-ই তাহ্রীমী দ্বারা ফরয ও নফল নামায সম্পন্ন হওয়া শরীয়তের নিয়মের পরিপন্থী; যার উপমা কোথাও পাওয়া যাবে না। ফরযের তাকবীর-ই তাহরীমাহ্ পৃথক, নফলের আলাদা হয়। এক তাহরীমার এক নামাযই হতে পারে; দু'টি হতে পারে না।

মোটকথা, ইচ্ছা করলে দু' রাক্'আত পড়বে, ইচ্ছা করলে চার রাক্'আত পড়বে- এটা শরীয়তসম্মত যুক্তি বা ক্বিয়াসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাছাড়া, যেভাবে নিজ ঘর-বাড়িতে চার রাক্'আতই ফরয, কমবেশী করার ইখতিয়ার নেই, তেমনি সফরে শুধু দু' রাক্'আত পড়া চাই, ইখতিয়ার নেই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

এ মাসআলায় আমি গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের দিক থেকে ওকালতি করতে গিয়ে এতবেশি আপত্তি ও সেগুলোর জবাব বা খন্ডন করার প্রয়াস পাবো, যেগুলো, ইনশা-আল্লাহ্, খোদ্ তাদেরও স্মরণ থাকবে না। মহান রব কবূল করুন!

আপত্তি-১.

মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

فَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

অর্থ: সুতরাং তোমরা যখন ভূ-পৃষ্ঠে সফর করবে, তখন তোমাদের উপর এজন্য গুনাহ্ বর্তাবে না যে, তোমরা কোন কোন নামায ক্বসর সহকারে পড়বে, যদি তোমাদের এ আশঙ্কা হয় যে, কাফিররা তোমাদেরকে কষ্ট দেবে।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, সফরে ক্বসর পড়া ফরয নয়; বরং কসর না পড়ারও অনুমতি রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার এরশাদ হয়েছে যে, তোমাদের উপর ক্বসর পড়লে গুনাহ্ হবে না। অর্থাৎ না ক্বসর পড়লে গুনাহ্ হবে, না ক্বসর না পড়লে গুনাহ্ বর্তাবে।

খন্ডন.

এ আপত্তির কতিপয় জবাব রয়েছে-

এক. এ আয়াত প্রকাশ্য অর্থে, হে আপত্তিকারীরা, আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, এখানে ক্বসরের জন্য কাফিরদের ভয়ের পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি তোমাদের কাফিরদের দিক থেকে ভয় থাকে, তাহলে ক্বসর করলে গুনাহ্ নেই। আর আপনারা বলছেন যে, নিরাপদ সফরেও ক্বসরের অনুমতি রয়েছে। এখন আপনারা যে জবাব দেবেন, আমাদের জবাবও তা হবে।

দুই. এ لَا جُنَاحَ (গুনাহ্ নেই) হাজীর সফা ও মারওয়ার সা'ঈ সম্পর্কেও এরশাদ হয়েছে। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন- فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا (সুতরাং যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র হজ্ব কিংবা ওমরাহ্ করে, তার উপর এতে গুনাহ্ নেই যে, সাফা ও মারওয়ার ত্বাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করবে।) অথচ সাফা ও মারওয়ার তাওয়াফ (সা'ঈ) হজ্জে ওয়াজিব এবং ওমরায় ফরয। অনুরূপ, সফরে ক্বসর করা ফরয। لَا جُنَاحَ (গুনাহ্ নেই) ফরয হবার পরিপন্থী নয়।

তিন. যদি সফরে ক্বসর পড়া নিছক মুবাহ্ হতো, তাহলে ক্বোরআন-ই করীম এভাবে এরশাদ করতো- তোমাদের উপর ক্বসর না করলে গুনাহ্ নেই। কেননা, 'মুবাহ্'র পরিচিতি হচ্ছে- সেটা করলেও গুনাহ্ নেই, না করলেও গুনাহ্ নেই। অন্যথায় ফরয কাজ করলে গুনাহ্ হয় না; বরং সেটা না করলে গুনাহ্ বর্তায়। সুতরাং করলে গুনাহ্ না হওয়া মুবাহ্ হওয়ার পক্ষে দলীল নয়। ফরয এবং ওয়াজিবও এমনই হয়।

চার. নবী করীমের পবিত্র জীবদ্দশায় সাহাবা-ই কেরাম মনে করছিলেন যে, চার রাক্'আতের স্থলে দু' রাক্'আত পড়লেন গুনাহ্ হবে। কেননা, তখন এ নামায অসম্পূর্ণ হবে। সুতরাং তাঁদেরকে বুঝানোর জন্য এটা এরশাদ হয়েছে। সুতরাং আয়াত একেবারে স্পষ্ট। আপনাদের জন্য উপকারী নয়।

আপত্তি নং-২.

শরহে সুন্নাহ্য় হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুহা থেকে বর্ণিত-

قَالَتْ كُلُّ ذٰلِكَ قَدْ فَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرَ الصَّلٰوةَ وَاَتَمَّ

অর্থ: তিনি বরেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব কিছু করেছেন- ক্বসরও পড়েছেন, পূর্ণ নামাযও পড়েছেন।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, সফরে ক্বসরও সুন্নাত এবং পূর্ণাঙ্গভাবে পড়াও সুন্নাত।

খন্ডন : এ আপত্তিও একাধিক জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীসের সনদে ইবরাহীম ইবনে ইয়াহিয়া রয়েছেন, যিনি সমস্ত মুহাদ্দিসের মতে দুর্বল। সুতরাং এ হাদীস একেবারে আমলযোগ্য নয়। দেখুন- 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত' এ হাদীসের ব্যাখ্যা।

দুই. এ হাদীস শরীফ ওইসব বরকতময় হাদীসের বিপরীত, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে আরয করেছি। শীর্ষস্থানীয় ও মর্যাদাবান সাহাবীগণ বলেছেন- হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সব সময় সফরে দু' রাক্'আত পড়েছেন ।

তিন. এ হাদীস স্বয়ং উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ওই রেওয়াতেরও পরিপন্থী, যা আমি প্রথম পরিচ্ছেদে পেশ করেছি। তিনি বলেন, প্রথমে নামায দু' দু' রাক্'আত ফরয হয়েছে। তারপর সফরে ওই দুই রাক্'আতই ফরয রয়ে গেছে, ঘর-বাড়িতে থাকাবস্থায় কোন কোন নামাযে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এটা কীভাবে হতে পারে যে, সফরে দু' রাক্'আত, ফরযও থাকবে, আর কখনো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চার রাক্'আতও পড়ে নিয়েছেন? সুতরাং এ হাদীসের তা'ভীল (ভিন্নব্যাখ্যা) দেওয়া ওয়াজিব বা অপরিহার্য।

চার. এ হাদীসে 'সফর' শব্দটি নেই। অর্থাৎ তিনি এটা বলেন নি যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সফরে ক্বসর পড়েছেন, পুরো নামাযও পড়েছেন। সুতরাং হাদীসের অর্থ এ'যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রারম্ভিককালে প্রথমে ক্বসর অর্থাৎ প্রত্যেক নামায দু' দু' রাক্'আত পড়েছেন, তারপর যখন রাক'আত বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং কোন কোন নামাযকে চার রাক্'আত করা হয়েছে এবং কোন কোন নামাযকে তিন রাক্আত তখন হুযূর-ই আক্রাম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম পূর্ণাঙ্গভাবে পড়েছেন; অর্থাৎ দু' রাক্'আত অপেক্ষা বেশী পড়েছেন। এমতাবস্থায় এ হাদীস শরীফ একেবারে স্পষ্টও হয়ে গেছে এবং পূর্ববর্তী হাদীসগুলোর পরিপন্থীও রইলো না।

পাঁচ. যদি এখানে সফররত অবস্থায় ক্বসর ও পূর্ণ নামায পড়ার অর্থও গৃহীত হয়, তবুও মর্মার্থ এ হবে যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সফররত অবস্থায় ক্বসর পড়েছেন, আর যখন কখনো পনর দিন অবস্থানের নিয়্যৎ করে নিয়েছেন এমন হয়, তখন পুরো নামায পড়েছেন। এখনও হাদীসটি একেবারে স্পষ্ট অর্থবোধক।

আজব ধরনের মজার কথা

গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীরা সব সময় হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের নিকট থেকে বোখারী ও মুসলিমের হাদীস দাবী করেন; কিন্তু যখন স্বয়ং তাদের, হাদীস পেশ করতে হয়, তখন বোখারী ও মুসলিমের হোক কিংবা না-ই হোক, সহীহ হোক কিংবা দ্ব'ঈফ (দুর্বল) হোক- যে কোন ধরনের হাদীস পেশ করতে লজ্জাবোধ করে না।

এ হাদীসও এমন দ্ব'ঈফ যে, সেটাকে 'সিহাহ্ সিত্তাহ্'য় বর্ণনা করেননি, ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উল্লেখই করেন নি বরং তিনিও একথা বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, ক্বসর তো হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরাত খোলাফা-ই রাশেদীন থেকে প্রমাণিত, পূর্ণ নামায পড়া তো শুধু হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার নিজের কাজই। সুতরাং ইমাম তিরমিযী ক্বসর নামাযের অধ্যায়ে বলেছেন-

وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه كَانَ يَقْصُرُ فِى السَّفَرِ وَاَبُوْا بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِّنْ خِلَافَتِه وَالْعَمَلُ عَلى هذَا عِنْدَ اَكْثَرِ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ -

অর্থ: হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ্ হাদীস এটা প্রমাণিত যে, তিনি সব সময় সফরে ক্বসর করতেন। আর আবূ বকর সিদ্দীক্বও, ওমর ফারূক্বও, হযরত ওসমানও তাঁর খিলাফতের প্রারম্ভিককালে। এর উপরই বেশীরভাগ আরিম সাহাবী এবং সাহাবী নন এমন বুযুর্গদের আমল রয়েছে। পক্ষান্তরে, সফরে পূর্ণ নামায পড়ার প্রসঙ্গে ইমাম তিরমিযী অত্যন্ত দুর্বল পন্থায় বর্ণনা করেছেন-

وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ الصَّلوةَ فِى السَّفَرِ

অর্থ: অবশ্য হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি সফরে নামায পুরোপুরি পড়তেন।

যদি হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার ওই মারফূ' হাদীস আমলযোগ্য হতো, যা আপনারা পেশ করেছেন, তবে ইমাম তিরমিযী মারফূ' হাদীস ছেড়ে শুধু হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার আমল শরীফের কথা উল্লেখ করতেন না।

সবচে' মজার কথা হচ্ছে সেটাই, যা সামনে আসছে-

وَالْعَمَلُ عَلى مَا رُوِىَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابِه

অর্থ: আমল করা হবে সেটা অনুসারে, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের থেকে বর্ণিত। অর্থাৎ ক্বসর ।

ইমাম তিরমিযীর এ বাণী থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাও ক্বসর এবং পুরোপুরি নামায পড়ার ইখতিয়ার দিতেন না; বরং তিনি সবসময় সফরে পুরোপুরি নামায পড়তেন, আলিমগণ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর কর্ম শরীফের উপর আমল করেছেন। অর্থাৎ সব সময় (সফরে) ক্বসর পড়েছেন।

আপত্তি-৩.

ইমাম নাসাঈ, দারে ক্বুত্বনী ও বায়হাক্বী হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَتْ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ فَطَرَ وَصُمْتُ وَقَصَرَ وَاَتْمَمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَصَرْتَ وَاَتْمَمْتُ وَاَفْطَرْتَ وَصُمْتُ قَالَ اَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ وَمَا عَابَ عَلَيَّ

অর্থ: তিনি বলেন, ''আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে রমযানে ওমরাহ্ করতে গিয়েছিলাম। তখন তিনি রোযা রাখেন নি, আমি রেখেছি। তিনি নামাযে ক্বসর করেছেন, আমি পুরোপুরি পড়েছি। তখন আমি আরয করলাম, ''ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি ক্বসর করেছেন, আমি পুরোপুরি পড়েছি। আপনি রোযা রাখেননি, আমি রোযা রেখেছি।'' তিনি এরশাদ করলেন, ''হে আয়েশা! তুমি ভাল করেছো।'' তিনি আমার কাজের উপর আপত্তি করেননি। এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, সফরে ক্বসরও জায়েয, পুরোপুরি পড়াও জায়েয।

খন্ডন

এ হাদীস শুধু দ্ব'ঈফ (দুর্বল)ই নয়; বরং নিছক ভুল এবং বানোয়াটও। কেননা, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন ওমরাহ্ রমযান মাসে করেন নি; হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট চারটা ওমরাহ্ করেছেন, যেগুলোর মধ্যে প্রতিটি করেছেন যিলক্বদ মাসে। অবশ্য বিদায় হজ্বের ওমরার ইহরাম করেছেন যিলক্বদ আসে আর ওমরার বিধানগুলো সম্পন্ন করেছেন যিলহজ্ব মাসে।

বিশেষ করে, হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার রমযান মাসে ওমরাহ্ করতে গিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকা এমন আজব ও জটিল বিষয় যে, ওই জটিলতার নিরসনও একমাত্র ওহাবী লা-মাযহাবীরাই হয়তো করতে পারবেন। হে লা-মাযহাবী ওহাবীরা! প্রথমে আপনাদের কথা নিজেদের বিবেকের পাল্লায় ওজন করুন, তারপর বলুন!

আপত্তি-৪.

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَاَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ بَعْدَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُثْمَانَ صَدْرًا مِّنْ خِلَافَتِهٖ ثُمَّ اِنَّ عُثْمَانَ صَلّٰى بَعْدُ اَرْبَعًا فَكَانَ اِبْنُ عُمَرَ اِذَا صَلّٰى مَعَ الْاِمَامِ صَلّٰى اَرْبَعًا وَاِذَا صَلّٰى وَحْدَهٗ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ

অর্থ: তিনি বলেন, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মিনায় দু' রাক্'আত পড়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব, তাঁরপর হযরত ওমর ফারূক্ব, আর হযরত ওসমান গণী, তাঁর খিলাফতের প্রারম্ভে (দু' রাক্'আত পড়েছেন)। অতঃপর হযরত ওসমান চার রাক্'আত পড়েছেন। আর হযরত ইবনে ওমর যখন ইমামের সাথে পড়তেন, তখন চার রাক্'আত পড়তেন, যখন একাকী পড়তেন, তখন দু' রাক্'আত পড়তেন।

যদি সফরে ক্বসর পড়া ফরয হতো এবং পুরোপুরি পড়া না-জায়েয হতো, তবে হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিনা শরীফে পুরো চার রাক্'আত কেন পড়তেন?

খন্ডন

এর কয়েকটা জবাব দেওয়ায় যায়-

এক. এ হাদীস শরীফ আপনাদের একেবারে বিপক্ষে। আপনারা তো মুসাফিরকে ক্বসর কিংবা পুরোপুরি পড়ার ইখতিয়ার দিয়েছেন, অর্থাৎ ইচ্ছা করলে ক্বসর পড়বে, ইচ্ছা করলে পুরোপুরি (চার রাক্'আত) পড়বে, কিন্তু এ হাদীস থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সব সময় ক্বসর পড়েছেন। হযরত ওসমান গনী তাঁর খিলাফতের প্রাথমিক দিকে যখন ক্বসর পড়েছেন, তখন পুরোপুরি পড়েন নি, তারপর যখন পুরোপুরি পড়তে আরম্ভ করেছেন, তখন কখনো ক্বসর পড়েননি। ইখতিয়ার তাঁদের মধ্যে কোন বুযুর্গই দেননি। আপনাদের এ ইখতিয়ার কোত্থেকে আসলো? কোন্ প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন?

দুই. হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুধু মিনা শরীফে পুরোপুরি পড়েছেন, সফরগুলোতে পড়েননি। বুঝা গেলো যে, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহুও সফরে পুরোপুরি পড়ার পক্ষে অভিমত দেননি । কোন বিশেষ কারণে শুধু মিনা শরীফে পুরোপুরি পড়তেন ।

তিন. হযরত ওসমান গণি রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিনায় পুরোপুরি পড়া এজন্য ছিলোনা যে, তিনি ক্বসর ও পুরোপুরি পড়াকে জায়েয (বৈধ) মনে করতেন; বরং এর কারণ অন্য কিছু ছিলো । কারণটি কি ছিলো সে সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মিনায় চার রাক্'আত পড়লেন, তখন লোকেরা তা মানতে অস্বীকার করলেন। তখন তিনি এরশাদ করেছেন, "আমি মক্কা মুকার্‌রামামায় পরিবার বিশিষ্ট হয়ে গিয়েছি । আমি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে এরশাদ করতে শুনেছি যে, যে কোন ব্যক্তি কোন শহরে পরিবার বিশিষ্ট হয়ে যায়, "সে যেন সেখানে মুক্বীমের নামায পড়ে। সুতরাং 'মুসনাদ-ই ইমাম আহমদ'-এর হাদীসের শেষাংশের শব্দগুলো নিম্নরূপ-

اَنَّه صَلَّى بِمِنى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فَاَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ - فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ تَاَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ وَاِنِّىْ سَمِعْتُ الخ (مِرْقَاة وَفَتْحُ الْقَدِيْر)

অর্থ: হযরত ওসমান মিনা শরীফে চার রাক্'আত পড়েছেন । সুতরাং লোকেরা তাঁর এ কাজের বিপক্ষে আপত্তি করলেন । তখন তিনি বললেন, যখন আমি মক্কা মু'আয্‌যামায় এসেছি, তখন থেকে আমি পরিবার বিশিষ্ট হয়ে গিয়েছি । আর আমি শুনেছি... । [মিরক্বাত, ফাত্হুল ক্বাদীর]

এ বর্ণনা থেকে তিনটি মাস্'আলা জানা গেলো-

এক. হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুধু মিনায় চার রাক্'আত পড়েছেন; প্রত্যেক সফরে পড়েননি ।

দুই. সাধারণভাবে সাহাবা-ই কেরাম তাঁর এ কাজের বিপক্ষে আপত্তি তুলেছিলেন; যা থেকে বুঝা গেলো যে, সমস্ত সাহাবী সফরে সব সময় ক্বসরই করতেন; পুরো নামায কখনো পড়তেন না; অন্যথায় তাঁর বিপক্ষে আপত্তি তুলতেন না ।

তিন. হযরত ওসমানগনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মক্কা মু'আয্‌যামায় জমি কিনেছিলেন । সেখানে ঘর নির্মাণ করেছেন । সেখানে তাঁর এক স্ত্রীকে রেখেছিলেন । এ কারণে মক্কা মু'আয্‌যামায় তাঁর এক প্রকার জন্মভূমি হয়ে গিয়েছিলো । আর নিজের জন্মভূমি (ঘরবাড়ি)তে যদি কেউ একদিনের জন্যও যায়, তবে সে মুক্বীম হয়ে যাবে এবং ক্বসর পড়বে না; পুরো নামায পড়বে ।

সুতরাং হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এ আমল লা-মাযহাবী ওহাবীদের এ ইখতিয়ারের মাসআলা থেকে অনেক ক্রোশ দূরে ।

দ্বিতীয় বর্ণনা হচ্ছে- হযরত ওসমান গনীর যমানার নও মুসলিম লোকেরা হজ্জে হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে দু' রাক্'আত পড়তে দেখে মনে করেছে যে, ইসলামে নামাযগুলো দু' দু' রাক্'আত করেই ফরয হয়েছে । যখন হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ ভুল বুঝাবুঝি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি এ ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য শুধু মিনায় পূর্ণ চার রাক্'আত পড়েছেন । সুতরাং ইমাম আবদুর রায্‌যাক্ব এবং দার-ই ক্বুত্নী হযরত ইবনে জুরায়জের সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

بَلَغَنِىْ اَنَّه اَوْفى اَرْبَعًا بِمِنى فَقَطْ مِنْ اَجَلِ اَنَّ اَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِىْ مَسْجِدِ خَيْفِ بِمِنى يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَازِلْتُ اُصَلِّيْهَا رَكْعَتَيْنِ مُنْذُ رَاَيْتُكَ عَامَ الْاَوَّلَ صَلَّيْتَهَا رَكْعَتَيْنِ فَخَشِىَ عُثْمَانُ اَنْ يَظُنَّ جُهَّالُ النَّاسِ الصَّلٰوةَ رَكْعَتَيْنِ وَاِنَّهَا كَانَ اَوْفَاهَا بِمِنى

অর্থ: আমি খবর পেয়েছি যে, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শুধু মিনায়ই চার রাক্'আত পড়েছেন । কেননা, এক গ্রাম্য লোক মসজিদে খায়ফে তাঁকে ডেকে বললো, "আমি বরাবর দু' রাক্'আতই পড়ে আসছি, যখন থেকে গত বছর আমি আপনাকে দু' রাক্'আত পড়তে দেখেছি ।" তখন হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মনে এ আশংকা সৃষ্টি হলো যে, মুর্খ লোকেরা নামায দু' রাক'আত বলেই মনে করে বসবে । এজন্য তিনি মিনায় চার রাক্'আত পড়েছেন ।

ইমাম আহমদ ও আবদুর রায্‌যাক্বের এ দু'টি বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, যখন হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকজনের এ ভুল বুঝাবুঝি সম্পর্কে জানতে পারলেন, তখন তিনি মক্কা মু'আয্‌যামায়ও নিজের ঘরবাড়ি নির্মাণ করে নিলেন, যাতে তিনি এখানে এসে মুক্বীম হয়ে যান, যাতে নামায পূর্ণাঙ্গভাবে পড়তে পারেন ।

সুতরাং হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এ কর্ম শরীফ থেকে গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীগণ কোনভাবেই দলীল গ্রহণ করতে পারেন না ।

আপত্তি-৫

যেভাবে শরীয়ত মুসাফিরকে রোযা রাখা কিংবা ক্বাযা করার ইখতিয়ার দিয়েছে, মুসাফিরের উপর সফরে না রোযা রাখা ফরয, না ক্বাযা করা ফরয; তেমনি

মুসাফিরের জন্য সফরে এ ইখতিয়ার থাকাও উচিৎ যে, সে ইচ্ছা করলে ক্বসর করবে, ইচ্ছা করলে পুরোপুরো পড়বে। তার উপর ক্বসর অপরিহার্য করে দেওয়া রোযার ইখতিয়ার প্রদানের পরিপন্থী।

খন্ডন

ধন্যবাদ আপনাদেরকে এ জন্য যে, আপনারাও 'ক্বিয়াস'কে স্বীকার করে নিয়েছেন। আপনারা নামাযের ক্বসরকে রোযার ক্বাযার উপর ক্বিয়াস করতে শুরু করেছেন। মুক্বাল্লিদ হানাফীরা ক্বিয়াসকে মানলে আপনাদের মতে শির্ক হয়ে যায় আর আপনারা ক্বিয়াসকে মানলেও আপনারা পাকাপোক্ত তৌহিদী থেকে যান। আফসোস!!

হে লা-মাযহাবীরা! রোযা মুসাফিরের জন্য মাফ হয়নি; বরং মুসাফির রোযাকে ক্বাযা করার অনুমতি পেয়েছে মাত্র। যদি তারা রোযা রাখে, তবে পুরোপুরি রাখবে, ক্বাযা করলে পুরো রোযার ক্বাযা দিতে হবে। কিন্তু ফরয নামায সফরে অর্দ্ধেক মাফ হয়ে গেছে। অর্থাৎ চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের শুধু 'দু' রাক্'আত অবশিষ্ট রয়ে গেছে। বাকী দু' রাক্'আত না এখানে (সফরে) পড়বে, না নিজ ঘরবাড়িতে গিয়ে পড়বে। ক্ষমা হয়ে যাওয়া এক জিনিষ, বিলম্বে সম্পন্ন করার অনুমতি অন্য জিনিষ। সুতরাং নামাযের ক্বসরকে রোযার বিলম্বের উপর ক্বিয়াস করা হচ্ছে 'ক্বিয়াস মা'আল ফারিক্ব' (অশোভন অনুমান)। মুসাফিরের উপর থেকে রোযা ক্ষমা করা হয়নি। অন্যথায় সেটার ক্বাযা ওয়াজিব হতো না। তার উপরও রোযা ফরয।

কিন্তু এ দু' রাক্'আত তার জন্য মাফ। এ জন্য ওই দু' রাক্'আতের ক্বাযা নেই। সুতরাং এ দু' রাক্'আত তার জন্য নফল। আর নফল নামায ফরযের তাহরীমাহ্ দ্বারা সম্পন্ন হওয়া শরীয়তের নিয়মের পরিপন্থী।

মাসআলা: মুসাফিরের উপর ফরয হচ্ছে- নিজের বাড়িঘরে পৌঁছার সাথে সাথে সফরের রয়ে যাওয়া রোযাগুলো সম্পন্ন করতে আরম্ভ করা। যদি সফরে আটটা রোযা ক্বাযা হয়ে যায়, যদি নিজ বাড়িতে পৌঁছে চার দিন পর মারা যায়; তবে ক্বিয়ামতে ওই চার রোযার জন্য পাকড়াও করা হবে। বাকী চার রোযার জন্য পাকড়াও করা হবে না। কারণ, ওইগুলো সম্পন্ন করার সময়ই পায়নি। রোগী ও হায়য সম্পন্না নারীরও এ বিধান। অর্থাৎ আরোগ্য হতেই রোযার ক্বাযা আরম্ভ করে দেবে।

---o---

অষ্টাদশ অধ্যায়

[ফজরের নামায উজ্জ্বল ভোরে পড়া চাই]

ফজরের নামায উজ্জ্বল ভোরে পড়া চাই

হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের মতে উত্তম হচ্ছে- ফজরের নামায অতি উজ্জ্বল ভোরে সম্পন্ন করা। যখন সূর্য-উদয়ের আধা ঘন্টা বাকী থাকে, তখন জমা'আত ক্বায়েম হবে। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের মতে, ফজরের নামায ওয়াক্বতের একেবারে প্রথম পর্যায়ে, অর্থাৎ খুব অন্ধকারে পড়ে নেওয়া চাই। এ জন্য আমি এ অধ্যায়েরও দু'টি পরিচ্ছেদ করেছিঃ প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের পক্ষের প্রমাণাদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন উল্লেখ করেছি।

জরুরী নোটঃ স্মর্তব্য যে, হানাফী মাযহাবে দু'টি নামায অর্থাৎ মাগরিবের নামায এবং শীতকালীন যোহর ব্যতীত সমস্ত নামায কিছুটা দেরীতে পড়া উত্তম। মাগরিবের নামায একটু বিলম্ব না করে পড়া মুস্তাহাব; অনুরূপ, শীতের মৌসুমে যোহরের নামাযও। যদি আমি এ কিতাবের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কা না করতাম, তবে আমি প্রত্যেক নামায বিলম্বে পড়ার পক্ষে দলীলাদি উপস্থাপন করতাম। এখানে শুধু ফজরের নামায বিলম্বে পড়ার পক্ষে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করছি, যাতে পাঠক সমাজ চিন্তা করে অনুধাবন করেন যে, হানাফী মাযহাব কতোই পাকাপোক্ত ও দলীল সমৃদ্ধ!

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফজরের নামায উজ্জ্বল ভোরে পড়া সাওয়াবের কাজ

প্রতিটি সময় ও মৌসুমে মুস্তাহাব হচ্ছে ফজরের নামায খুব উজ্জ্বল ভোরে পড়া। অবশ্য, ১০ যিলহজ্ব হাজীগণ মুযদালিফায় ফজরের নামায অন্ধকারে পড়ে নেবেন। আমাদের হানাফী মাযহাবের পক্ষে এ মাসআলার পক্ষে অনেক হাদীস শরীফ রয়েছে। ওইগুলো থেকে নমুনা স্বরূপ কয়েকটা পেশ করা হচ্ছেঃ

হাদীস নম্বর-১-৮.

সর্ব ইমাম তিরমিযী, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্, বায়হাক্বী, ইবনে হাববান, আবূ দাউদ ত্বায়ালিসী ও ইমাম ত্বাবরানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম কিছু কিছু পার্থক্য সহকারে হযরত রাফি' ইবনে খাদীজ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهٗ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ
وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ

অর্থঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ফজরের নামায খুব উজালা করে পড়ো, কারণ এর সাওয়াব বেশি, ইমাম তিরমিযী বলেছেন এ হাদীস সহীহ্।

স্মর্তব্য যে, এ হাদীস শরীফে উজালা করে পড়া মানে খুব উজালা করে পড়া, যখন আলো ছড়িয়ে পড়ে; এ অর্থ নয় যে, ফজর নিশ্চিতভাবে উদিত হবে। কারণ, এটা ব্যতীত তো নামাযই হয় না। আর যে উজালা হওয়ার ফলে সাওয়াব বেশী পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এ-ই আলো, যা আমি আরয করেছি।

হাদীস ৯-১০.

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'উদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَ مَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى لِغَيْرِ وَقْتِهَا اِلَّا بِجَمْعٍ فَاِنَّهٗ
جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَيُصَلِّىْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ وَقْتِهَا

অর্থঃ আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কখনো দেখিনি যে, তিনি কোন নামায ওয়াক্বত ব্যতীত পড়েছেন- মুযদালিফা ছাড়া। সেখানে হুযূর মাগরিব ও এশার নামায একত্রে পড়েছেন আর ওই দিনের ভোরে ফজরের নামায ওই নামাযের সময়ের একেবারে প্রারম্ভে পড়েছেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সবসময় ফজরের নামায খুবই উজ্জ্বল করে পড়তেন; কিন্তু মুযদালিফায় ১০ যিলহজ্ব অন্ধকারে অর্থাৎ স্বাভাবিক ওয়াক্বতের পূর্বে। যদি হুযূর-ই আক্রাম সব সময়ই ফজরের নামায ওয়াক্বতের একেবারে প্রারম্ভে পড়তেন, তাহলে মুযদালিফায় 'পূর্বে পড়া'র অর্থ কি? কেননা, এর পূর্বে তো ফজরের নামাযের সময়ই হয় না।

স্মর্তব্য যে, মুযদালিফায় কোন নামায তার ওয়াক্বতের পূর্বে হয় না। অবশ্য, মাগরিবের নামায এশার সময় সম্পন্ন করা হয়। আর ফজরের নামাযও সেটার ওয়াক্বতের মধ্যে। এর উপর সমস্ত উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে। আর এ হাদীসের এ অর্থ নয় যে, হুযূর-ই আক্রাম ফজরের নামায ওয়াক্বতের পূর্বে অর্থাৎ রাতে পড়েছেন; বরং প্রতিদিনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে পড়েছেন। এ অর্থের ভিত্তিতে হাদীস শরীফ একেবারে স্পষ্ট।

হাদীস-১১-১৪.

ইমাম আবূ দাঊদ ত্বায়ালিসী, ইবনে আবী শায়বাহ্, ইসহাক্ব ইবনে রাহওয়াইহ্ ও ইমাম ত্বাবরানী 'মু'জাম-ই হযরত রাফি' ইবনে খাদীজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ يَا بِلَالُ نُوِّرْ بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ حَتّٰى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنَ الْاَسْفَارِ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলালকে বলেছেন, হে বেলাল, ফজরের নামাযকে উজালা করে নাও; এ পর্যন্ত যে, লোকেরা উজালা হবার কারণে তাদের নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হবার স্থান দেখে নেয়।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায এমন সময়ে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, যখন তীরান্দাজ তার তীর পতিত হবার স্থান দেখতে পায়। আর এটা তখনই হতে পারে, যখন আলো খুব ছড়িয়ে পড়ে।

হাদীস-১৫.

ইমাম দায়লামী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَوَّرَ بِالْفَجْرِ نَوَّرَ اللهُ فِىْ قَبْرِه وَقَلْبِه وَقِيْلَ فِىْ صَلٰوتِه

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- যে ব্যক্তি ফজরের নামায আলোর মধ্যে পড়ে, আল্লাহ্ তা'আলা তার কবর ও তার হৃদয়ে আলো সৃষ্টি করেন, এক বর্ণনায় আছে- তার নামাযে আলো সৃষ্টি করেন।

হাদীস-১৬-১৭

ইমাম ত্বাবরানী আওসাত্বে বায্যার হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ اُمَّتِىْ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا اَسْفَرَ بِصَلٰوةِ الْفَجْرِ -

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মত দ্বীন-ই ফিত্বরাত' (মৌলিক দ্বীন)-এর উপর থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফজরের নামায আলোর মধ্যে পড়বে।

হাদীস-১৮-২৩.

সর্ব ইমাম ত্বাহাভী, বোখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ একটু পার্থক্য সহকারে হযরত ইয়াসার ইবনে সালামাহ্র সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ عَلٰى اَبِىْ بَرْزَةَ يَسْئَلُهٗ اَبِىْ عَنْ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلٰوةِ الصُّبْحِ وَالرَّجُلُ يَعْرِفُ وَجْهَ جَلِيْسِه وَكَانَ يَقْرَاُ فِيْهَا بِالسِّتِّيْنَ اِلَى الْمِائَةِ

অর্থ: আমি আমার পিতার সাথে হযরত আবূ বারাযাহ্ সাহাবীর নিকট গেলাম। আমার পিতা তাঁকে হুযূর-ই আক্রামের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলেন। তখন তিনি বলেন, হুযূর-ই আক্রাম ফজরের নামায থেকে তখন অবসর গ্রহণ করতেন, যখন প্রত্যেকে আপন সাথীর চেহারা চিনতে পারতেন; অথচ হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ষাট থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত পড়তেন।

হাদীস-২৪.

ইমাম ত্বাহাভী তাঁর ত্বাহাভী শরীফে হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ فَكَانَ يُسْفِرُ بِصَلٰوةِ الصُّبْحِ

অর্থ: তিনি বলেন, আমরা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে ফজরের নামায পড়তাম। তিনি খুব উজ্জ্বলতায় ফজরের নামায পড়তেন।

হাদীস- ২৫.

ইমাম বায়হাক্বী সুনানে কুবরায় হযরত আবূ ওসমান নাহদীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَمَا سَلَّمَ حَتّٰى ظَنَّ الرِّجَالُ ذُوُا الْعُقُوْلِ اَنَّ الشَّمْسَ طَلَعَتْ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالُوْا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ قَالَ فَتَكَلَّمَ بِشَىْءٍ لَمْ اَفْهَمْهُ فَقُلْتُ اَىَّ شَىْءٍ قَالَ قَالُوْا لَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর ফারূক্বের পেছনে ফজরের নামায পড়েছি। তখন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত সালাম ফেরাননি, যতক্ষণ না বিবেকবানগণ মনে করেন যে, সূর্য উদিত হয়ে গেছে। যখন তিনি সালাম ফেরালেন, তখন লোকেরা আরয করলেন, "হে আমীরুল মু'মিনীন, সূর্য উদিত হবার পথে। তিনি কিছু বলেছেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত ওমর কি বলেছেন? লোকেরা বললেন, তিনি বলেছেন, যদি সূর্য বেরিয়ে আসতো, তবে আমাদেরকে গাফিল পেতো না।

হাদীস-২৬.

ইমাম বায়হাক্বী সুনানে কুবরায় হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَ صَلَّى بِنَا اَبُوْ بَكْرٍ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَقَرَاَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَالُوْا كَادَتِ الشَّمْسُ تَطْلُعُ قَالَ لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِلِيْنَ

অর্থ: তিনি বলেন, আমাদেরকে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব নামায পড়িয়েছেন; তাতে তিনি 'সূরা-ই আলে ইমরান' পড়েছেন। লোকেরা বললেন, সূর্য উদিত হবার উপক্রম হয়েছে। তিনি বলেন, "যদি উদিত হতো, তবে আমাদেরকে উদাসীন পেতে না।"

হাদীস-২৭-২৮.

ইমাম ত্বাহাভী ও মোল্লা খুসরু মুহাদ্দিস আপন 'মুসনাদ'-এ ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা থেকে, তিনি হযরত হাম্মাদ থেকে, তিনি হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ مَا اجْتَمَعَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى شَيْءٍ كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى التَّنْوِيْرِ فِى الْفَجْرِ وَالتَّعْجِيْلِ فِى الْمَغْرِبِ قَالَ الطَّحَاوِىُّ لَا يَصِحُّ اَنْ يَّجْتَمِعُوْا عَلٰى خِلَافِ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ কোন মাসআলার উপর এমন ঐকমত্য পোষণ করেন নি, যেমন ফজরের নামাযকে আলোকিত করে পড়া ও মাগরিবের নামায বিলম্ব না করে পড়ার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম ত্বাহাভী বলেন, এটা অসম্ভব যে, সাহাবা-ই ক্বেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিপরীত আমলের উপর একমত হবেন!

এসব হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব ও ওমর ফারূক্ব, খুব উজালায় ফজরের নামায পড়তেন; এমনকি লোকজনের এ সন্দেহ হয়ে যেতো যে, সূর্য উদিত হয়ে গেলো কিনা। সাহাবা-ই কেরামের সর্বসম্মত আমল এ ছিলো যে, ফজরের নামায একেবারে আলোর মধ্যে পড়া হবে।

হাদীস-২৯.

ত্বাহাভী শরীফ হযরত আলী ইবনে রবী'আহ্র সূত্রে বর্ণনা করেন-

قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُوْلُ لِقَنْبَرٍ اَسْفِرْ اَسْفِرْ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি হযরত আলী মুরতাদ্বাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, হে কাম্বর, আলোকিত করো, আলোকিত করে (ফজরের নামায) পড়ো।

বুঝা গেলো যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অত্যন্ত আলোকিত করে ফজরের নামায পড়তেন, যেমনটি اَسْفِرْ (উজালা করো) দু'বার এরশাদ করা থেকে বুঝা গেলো।

আমি এখানে এ ২৯ হাদীস নমুনা হিসেবে পেশ করলাম। যদি আরো বেশি বিশ্লেষণ জানা উদ্দেশ্য হয়, তবে ত্বাহাভী শরীফ ও 'সহীহুল বিহারী' শরীফ পাঠ-পর্যালোচনা করুন!

মোটকথা, বুঝা গেলো যে, উজালা করে ফজরের নামায পড়া রসূলে করীমের সুন্নাত, সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত আর সাহাবীগণের সর্বসম্মত আমল।

যুক্তির দাবীও এ'যে, ফজরের নামায উজালায় পড়া হোক। তাও কয়েকটা কারণেঃ

এক. 'ফজর' (فجر) শব্দের আভিধানিক অর্থ- উজালা ও আলোকিত। সুতরাং ফজরের নামায উজলার মধ্যে পড়লে কাজ নাম অনুসারে সম্পন্ন হবে। আর আঁধারে পড়া নামেরও বিপরীত হয়।

দুই. উজালায় নামায পড়া জমা'আত বড় হওয়ার মাধ্যম। কারণ, বেশীরভাগ মুসলমান ফজরে দেরীতে জাগ্রত হয় ও উঠে। যদি বিলম্ব না করেও উঠে, তবুও তখন কারো কারো গোসল ও ওযূ করতে এবং সুন্নাত পড়তে হয়; কেউ কেউ তখন সুন্নাতের পর ইস্তিগফার ও কিছু আমল-যিকর করে থাকেন। ফজরের ওয়াক্বতের প্রারম্ভে ফজরের জমা'আত সম্পন্ন করে নিলে অনেক লোক জমা'আত ধরতে পারে না, অথবা তাকবীর-ই উলা (প্রথম তাকবীর) ইমামের সাথে ধরতে পারে না। উজালা করে পড়লে সমস্ত নামাযী অতি উত্তমরূপে জমা'আতের তাকবীর-ই উলায় শরীক হতে পারে। দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আযকে দীর্ঘ ক্বিরাআত পড়তে এজন্য নিষেধ করেছিলেন যে, এটা মুক্বাতাদীদের জন্য কষ্টকর ছিলো। যেসব কারণে জমা'আত ছোট হয়ে যায়, ওইসব কারণ থেকে বিরত থাকা উত্তম। অন্ধকারে পড়া জমা'আত ছোট হয়ে যাবার কারণ। 'ইসফার' (আলোকিত করে ফজর পড়া) জমা'আত বড় হবার ও মুসলমানদের জন্য সহজ হবার উপায়। সুতরাং 'ইসফার' (আলোকিত করে ফজরের নামায পড়া) উত্তম।

তিন. অন্ধকারে মুসলমানদের জন্য মসজিদে আসা কষ্টকর হবে; আলোতে সহজ। সুতরাং হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে অন্ধকারে স্বয়ং নামাযরত অবস্থায় শহীদ করা হলো, তখন সম্মানিত সাহাবীগণ ফজরে খুব উজালা করার উপর গুরুত্ব ছিলেন। দেখুন, ত্বাহাভী শরীফ, সহীহুল বিহারী এবং ইবনে মাজাহ্ শরীফ ইত্যাদি।

চার. ফজরের নামাযের কয়েকটি কারণে মাগরিবের নামাযের সাথে সামঞ্জস্য (সাদৃশ্য) রয়েছে। যেমন-মাগরিব রাতের প্রথম নামায, ফজর দিনের প্রথম নামায। মাগরিব কাজ-কারবার বন্ধ হবার সময় আর ফজর কাজ-কারবার খোলার সময়। মাগরিব ঘুমের, আর ফজর ঘুম থেকে উঠার সূচনার সময়। সব সময় ফজরের সময়সীমা মাগরিবের সমান হয়। অর্থাৎ যে কোন সময়ে যতক্ষণ সময় মাগরিবের হবে, ততটুকু ফজরেরও হয়। সুতরাং যখন ফজরের নামায মাগরিবের নামাযের সদৃশ হলো, তখন মাগরিবের নামায যেমন আলোতে পড়া উত্তম, তেমনি ফজরের নামায উজালায় পড়া উত্তম হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

ফজরের নামায বিলম্বে পড়ার বিপক্ষে এ পর্যন্ত ওহাবী লা-মাযহাবীদের পক্ষ থেকে যে পরিমাণ আপত্তি জানা গেছে, সেগুলো আমি বিস্তারিতভাবে, সেগুলোর খন্ডন সহকারে আরয করছি। যদি পরবর্তীতে আর কোন আপত্তি জানা যায়, তখন ইনশা-আল্লাহ্ পরবর্তী সংরক্ষণে সেটার খন্ডনও করা হবে।

আপত্তি-১.

তিরমিযী শরীফে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَلِىُّ ثَلٰثٌ لَا تُؤَخِّرْهَا : اَلصَّلٰوةُ اِذَا اَتَتْ وَالْجَنَازَةُ اِذَا حَضَرَتْ وَالْاَيِّمُ اِذَا وَجَدْتَّ لَهَا كُفُوًا

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর উদ্দেশে এরশাদ করেছেন, হে আলী, তিনটি বিষয়ে দেরী করোনা: নামায, যখন সেটার সময় এসে যায়; জানাযা, যখন হাযির হয়ে যায় এবং কন্যার বিবাহ্, যখন তার জন্য 'কুফূ' (সম পর্যায়ের বর) মিলে যায়।

তাছাড়া, এ তিরমিযী শরীফে সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَقْتُ الْاَوَّلُ مِنَ الصَّلٰوةِ رِضْوَانُ اللهِ وَالْوَقْتُ الْاٰخِرُ عَفْوُ اللهِ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, নামাযের ওয়াক্বতের প্রথমাংশে মহান রবের সন্তুষ্টি রয়েছে আর নামাযের ওয়াক্বতের শেষ ভাগে আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমা রয়েছে।

এ হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, প্রত্যেক নামাযকে সেটার ওয়াক্বতের প্রথমাংশে পড়ে নেওয়া চাই। হানাফী মাযহাবের লোকেরা ফজরের নামায দেরীতে পড়ে মহান রবের সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

খন্ডন

এ আপত্তির দু'টি জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস হে লা-মাযহাবীরা! আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, আপনারাও এশার নামায এবং গ্রীষ্মকালের যোহারের নামাযে বিলম্ব করাকে মুস্তাহাব ও উত্তম মনে করছো। তোমরাও তো আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হচ্ছো! সুতরাং এ প্রসঙ্গে তোমাদের যে জবাব হবে তা আমাদেরও হবে।

দুই. এ সব হাদীসে ওয়াক্বতের প্রারম্ভ মানে মুস্তাহাব ওয়াক্বত্বের প্রারম্ভ, গোটা ওয়াক্বতের প্রারম্ভ নয়। অর্থাৎ যখন নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্বত আরম্ভ হয়, তখন দেরী করো না। ফজরের নামাযের প্রারম্ভ হচ্ছে- আলোকিত হবার সময়; যেমন এশার নামাযের জন্য রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ এশার নামাযের ওয়াক্বতের প্রারম্ভ।

আপত্তি-২.

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিমসহ সকল মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বদা ফজরের নামায 'গালাস' অর্থাৎ অন্ধকারে পড়তেন। সুতরাং হানাফীদের দেরীতে ফজরের নামায পড়া সুন্নাতের পরিপন্থী।

খন্ডন : এ আপত্তিরও দু'টি জবাব দেওয়া যায়-

এক. 'গালাস' (غلس) মানে অন্ধকার-চাই সময় অনুসারে অন্ধকার হোক, অথবা মসজিদের অন্ধকার হোক। হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায আলোতেই পড়তেন। কিন্তু মসজিদে অন্ধকার থাকতো; কেননা, মসজিদে নবভী শরীফে খুব গভীর করে নির্মাণ করা হয়েছিলো। ছাদে আলো আসার কোন ছিদ্র কিংবা ফাঁক ইত্যাদি ছিলো না। এখনও যদি মসজিদে জানালা কিংবা ফাঁক না থাকে, তবে ভিতরে খুব অন্ধকার থাকে; কেননা, তা খুব গভীর করে নির্মাণ করা হয়েছে। আঙ্গিনাও দূরে। এমতাবস্থায় এ হাদীস শরীফ ওই সব হাদীস শরীফের পরিপন্থী নয়, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে পেশ করেছি।

দুই. যদি غلس (গালাস) মানে ভোরের অন্ধকার হয়, তা হলে সেটাতো হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর কর্ম শরীফ। আর হুযূর-ই আক্রাম-এর বাণী শরীফ হচ্ছে সেটাই, যা আমি প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছি। অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রাম অন্ধকারে ফজরের নামায পড়েছেন; কিন্তু আমাদেরকে উজালা করে

পড়ার হুকুম দিয়েছেন। আর যখন হাদীস-ই ক্বওলী ও ফে'লী (যথাক্রমে বাণীগত ও কর্মগত হাদীস)-এর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তখন হাদীস-ই ক্বওলীকে প্রধান্য দেওয়া হয়। কেননা, কর্মগত হাদীসের মধ্যে হুযূর-ই আক্রামের বিশেষত্বের সম্ভাবনা থাকে। দেখুন, সরকার-ই দু'আলম খোদ্ নয় স্ত্রী বিবাহাধীন রাখেন; কিন্তু আমাদের জন্য মাত্র চারটি স্ত্রী রাখার অনুমতি দিয়েছেন। আমরা নির্দেশ অনুসারে আমল করে শুধু চার স্ত্রী রাখতে পারি; হুযূর-ই আক্রামের আমল শরীফ অনুসারে আমল করবো না। এ নিয়ম স্মরণ রাখা চাই। কারণ, বাণী শরীফ আমল শরীফের উপর প্রাধান্য পায়।

তিন. আমি প্রথম পরিচ্ছেদে আরয করেছি যে, আম সাহাবীগণ উজালায় ফজরের নামায পড়তেন; অথচ তাঁরা হুযূর-ই আক্রামের এ আমল শরীফ দেখেছিলেন। বুঝা গেলো যে, বাণীগত (قولی) হাদীসকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা তদনুযায়ী আমল করতেন; অন্য হাদীসকে আমলযোগ্য মনে করতেন না।

চার. ফজরের নামায অন্ধকারে হওয়া 'শর'ঈ ক্বিয়াস'-এরও পরিপন্থী। উজালায় হওয়া ক্বিয়াসের অনুরূপ। সুতরাং উজালায় নামায পড়ার বর্ণনা সম্বলিত হাদীস প্রাধান্য পাবে। কেননা, যখন হাদীসগুলোতে পরস্পর বিরোধ দেখা দেয়, তখন ওই হাদীসই প্রাধান্য পায়, যা ক্বিয়াসের অনুরূপ হয়।

দেখুন, এক হাদীসে আছে- اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ (আগুনে রান্নাকৃত বস্তু খেলে ওযূ ওয়াজিব হয়।) অন্য হাদীসে আছে- হুযূর-ই আক্রাম খানা খেয়ে নামায পড়ে নিয়েছেন; ওযূ করেননি। প্রথম হাদীস ক্বিয়াসের পরিপন্থী। আর দ্বিতীয় হাদীস ক্বিয়াসের অনুরূপ। সুতরাং দ্বিতীয় হাদীস প্রাধান্য পেয়েছে। প্রথম হাদীসের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ ওখানে 'ওযূ' মানে খানা খেয়ে হাত ধোয়া; কুল্লি করা; অনুরূপ, এখানে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হবে যে, 'গালাস' (অন্ধকার) মানে মসজিদের অন্ধকার; সময়ের নয়। যে কোন অবস্থায় আলোর হাদীসই প্রাধান্য পাবে।

আমাদের ঘোষণা

যে কোন ওহাবী সাহেব এমন মারফূ' হাদীস পেশ করুন, যাতে ফজরের নামায অন্ধকারে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেমনিভাবে আমরা উজালায় ফজরের নামায পড়ার এক/দু'টি নয়; বরং অনেক হাদীস পেশ করেছি, যেগুলোতে এ হুকুম দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ. 'অন্ধকার'-এর সমস্ত হাদীস 'জায়েয' (বৈধতা) বর্ণনার জন্য আর 'উজালা'র সমস্ত হাদীস 'মুস্তাহাব' বলে বর্ণনার জন্য। সুতরাং উভয় হাদীস

পরস্পর মিল সম্পন্ন; বিরোধী নয়; অর্থাৎ অন্ধকারে ফজর পড়া জায়েয। কেননা, হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এতদ্‌নুসারে আমল শরীফ করেছেন। আর উজালায় ফজরের নামায পড়া মুস্তাহাব। কেননা, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এর হুকুম দিয়েছেন।

আপত্তি-৩.

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصُّبْحَ فَتَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفُ مِنَ الْغَلَسِ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায থেকে এমন সময় অবসর গ্রহণ করতেন, যখন মহিলাগণ তাদের চাদরগুলোতে জড়িয়ে মসজিদ থেকে ফিরে যেতেন এবং অন্ধকারের কারণে তাঁদেরকে চেনা যেতো না।

বুঝা গেলো যে, ফজরের নামায এতোটুকু সময় হাতে রেখে আরম্ভ করা সুন্নাত, যখন ষাট কিংবা একশ' আয়াত পড়ে নামায সমাপ্ত করা যায়। তখনও কোন নামাযীকে অন্ধকারের কারণে চেনা যায় না। হানাফীরা এত বেশি উজালা করে ফজরের নামায পড়ে যে, নামায শুরু করার প্রারম্ভেই মানুষগুলোকে চেনা যায়। তাঁদের এ আমল সুন্নাতের পরিপন্থী।

খন্ডন

এর জবাবগুলো আপত্তি নং ২-এর মধ্যে দেওয়া হয়েছে। তা হলো- হয়তো সেখানে মসজিদের অন্ধকার থাকতো, ওয়াক্বতের অন্ধকার ছিলো না; নতুবা এ আমল শরীফের উপর হুযূর-ই আক্‌রামের ফরমান বা হুকুমকে প্রাধান্য দেওয়া হবে ইত্যাদি। এখানে আরেকটা জবাব দেওয়া যায়। তা হচ্ছে-

হুযূর আলায়হিস্ সালাম-এর যমানা শরীফে মহিলাদেরকেও জমা'আত সহকারে নামায পড়ার জন্য হাযির হবার নির্দেশ দেওয়া হতো। তাদের কথা বিবেচনা করে ফজরের নামায তাড়াতাড়ি পড়া হতো, যাতে ওই মহিলারা পর্দা সহকারে ঘরে চলে যেতে পারেন। তারপর হযরত ওমর ফারূক্বের যুগে মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করা হলো। সুতরাং এ বিবেচনাও খতম হয়ে গেলো। মহিলাদেরকে জমা'আতে হাযির হওয়া থেকে বিরত রাখার পূর্ণাঙ্গ গবেষণাধর্মী আলোচনা এবং সেটার কারণ আমার কিতাব 'ইসলামী যিন্দেগী'তে দেখুন।

আপত্তি-৪.

ইমাম তিরমিযী উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَتْ مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةً لِوَقْتِهَا الْاٰخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ

অর্থ: তিনি বলেন, হুযূর-ই আন্‌ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'বারও কোন নামায ওয়াক্বতের শেষভাগে পড়েননি; এ পর্যন্ত যে, মহান রব তাঁকে ওফাত দান করেছেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সমস্ত নামায, বিশেষ করে, ফজরের নামায ওয়াক্বতের প্রথম ভাগে পড়া হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর স্থায়ী সুন্নাত; এ হুকুম মানসূখ হয়নি। হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম আপন জীবদ্দশার শেষ পর্যন্ত এতদ্‌নুসারে আমল করেছেন। কিন্তু আপসোস! হানাফীগণ এমন স্থায়ী সুন্নাত পালন করা থেকে বঞ্চিত, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সব সময় আমল করেছেন।

খন্ডন

এ আপত্তির কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়:

এক. এ হাদীস সহীহও নয়; এর সনদ 'মুত্তাসিল'ও নয়। কেননা, এ হাদীসকে ইসহাক্ব ইবনে ওমর হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন মর্মে দেখানো হয়েছে; অথচ ইসহাক্ব ইবনে ওমর হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার সাথে কখনো সাক্ষাৎ করেননি; সুতরাং মধ্যখানে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছেন। এ কারণে ইমাম তিরমিযী এ হাদীসের সাথে বলেছেন-

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهٗ مُتَّصِلٌ

অর্থ: ইমাম আবূ ঈসা বলেছেন, এ হাদীস 'গরীব' পর্যায়ের এবং এর সনদ 'মুত্তাসিল' নয়।

এর পার্শ্বটীকায় আছে-

لِاَنَّهٗ لَمْ تَثْبُتْ مُلَاقَاةُ اِسْحٰقَ مَعَ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا

অর্থ: কেননা, ইসহাক্বের সাক্ষাৎ হযরত আয়েশার সাথে প্রমাণিত নয়। সুতরাং এ হাদীস আমল করার উপযুক্ত নয়। আফসোস! ওহাবীরা আমাদের থেকে তো একেবারে সহীহ্ ও টাকশালী হাদীস দাবী করেন; আর নিজেরা এমন দুর্বল ও আমলের যোগ্য নয় এমন সব হাদীস পেশ করার ব্যাপারে কোন চিন্তাই করে না।

দুই. এ হাদীস অনেক হাদীসের পরিপন্থী। কেননা, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অনেকবার নামায ওয়াক্বতের শেষভাগে পড়েছেন। যখন হযরত জিব্রাঈল নামাযগুলোর ওয়াক্বত আরয করার জন্য এসেছিলেন, তখন তিনি দু'দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়েছেন, প্রথম দিনে সকল নামায ওয়াক্বতের প্রথম ভাগে, আর দ্বিতীয় দিনে ওয়াক্বতের শেষ ভাগে। একদা এক ব্যক্তি হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামকে নামাযগুলোর ওয়াক্বত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তখন তিনি তাকে নিজের নিকট দু'দিন অবস্থান করালেন। একদিন নামাযগুলোকে ওয়াক্বতের প্রথম ভাগে পড়ালেন, দ্বিতীয় দিন ওয়াক্বতের শেষ ভাগে পড়ালেন। তা'রীসের রাতে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ফজরের নামায ক্বাযা পড়েছেন। খন্দকের যুদ্ধে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম কয়েক ওয়াক্বতের নামায ক্বাযা করে পড়েছেন। সাধারণভাবে সফরে হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম যোহরের নামায ওয়াক্বতের শেষ ভাগে এবং আসর ওয়াক্বতের শুরুতে পড়তেন। অনুরূপ, মাগরিবের নামায ওয়াক্বতের শেষভাগে এবং এশা ওয়াক্বতের প্রথম ভাগে পড়তেন। একবার হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ফজরের নামাযের জন্য একেবারে ওয়াক্বতের শেষভাগে তাশরীফ আনেন এবং অতি তাড়াতাড়ি ফজরের নামায পড়িয়েছেন। এরপর এরশাদ করলেন, "আজ একটি স্বপ্ন দেখছিলাম, মহান রব আপন কুদরতের হাত আমার পবিত্রতম বক্ষের উপর রেখেছেন। [মিশকাত শরীফ, বাবুল মাসাজিদ]

মোটকথা, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম অনেকবার নামাযসমূহ ওয়াক্বতের শেষভাগে পড়েছেন। আর এ হাদীসে রয়েছে যে, তিনি কোন নামায ওয়াক্বতের শেষভাগে দু' বারও পড়েন নি। সুতরাং এ রেওয়ায়ত আমল করার যোগ্য নয়।

তিন. এ হাদীস, হে লা-মাযহাবীরা! আপনাদেরও বিপক্ষে। অতঃপর আপনারা এশার নামায ওয়াক্বতের শেষভাগে, অর্থাৎ রাতের এক কৃতীয়াংশ অতিবাহিত হলে পড়া মুস্তাহাব কেন বলে থাকেন? আর গ্রীষ্মকালে যোহরকে ওয়াক্বতের শেষ ভাগে পড়া মুস্তাহাব বলেন কেন? এ প্রশ্নের জবাবে আপনাদের জবাব যা হবে, আমাদের জবাবও তা হবে।

আপত্তি-৫.

হে হানাফীরা! আপনারা যে হাদীস পেশ করে ছিলেন, অর্থাৎ ফজরের নামাযকে উজালায় পড়ো, তাতে উজালা মানে সোবহে সাদিক্বের ওই আলো, যা দ্বারা ফজরের ওয়াক্বত হয়ে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়, আর হাদীসের মর্মার্থ দাঁড়ায়, ফজরের নামায সন্দেহপূর্ণ সময়ে পড়োনা; বরং যখন ইয়াক্বীন (নিশ্চিত বিশ্বাস) হয়ে যাবে যে, ফজরের নামাযের সময় হয়ে গেছে, তখন পড়ো, ওখানে 'ইসফার' মানে ওই আলো নয়; যা হানাফীরা বুঝে নিয়েছেন, অর্থাৎ খুব উজালা হওয়া। অনেক মুহাদ্দিস এ হাদীসের এ-ই মর্থার্থ বর্ণনা করেছেন।

খন্ডন

মোটেই নয়। কেননা, এতটুকু উজালা করাতো ফরয। সন্দেহের অবস্থায় ফজরের নামায পড়া জায়েযই নয়। আর এখানে বলা হয়েছে যে, এ উজালায় নামায পড়ার সাওয়াব বেশী। অর্থাৎ এ উজালা মুস্তাহাব; ফরয নয়। সুতরাং এ উজালা মানে ওই ভোরের আলো, যাতে ফজর পড়া মুস্তাহাব, আর আমরা যে অর্থ করেছি, তা-ই সঠিক। হাদীস বুঝার জন্য 'বুঝ শক্তি'র দরকার।

---o---

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়

[যোহরের নামায ঠান্ডা করে পড়ুন]

প্রথম পরিচ্ছেদ

যোহরের নামায ঠান্ডা করে পড়া চাই

যোহরের নামাযের সময় সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর থেকে শুরু হয় আর ওই সময় পর্যন্ত থাকে, যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া সেটার দ্বি প্রহরের ছায়া ব্যতীত দ্বিগুণ হয়ে যাবে। শীতকালে যোহরের নামায বিলম্ব না করে পড়া এবং গ্রীষ্মকালে কিছুটা দেরীতে পড়া, যাতে দুপুরের তীব্রতা চলে যায়, কিছুটা ঠান্ডা হয়ে যায়, সুন্নাত; কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা যোহরের নামায দুপুরের তীব্র গরমের মধ্যে পড়ে নেয় । আর এক দন্ড ছায়ার পর আসরের নামায পড়ে নেয় । নানাভাবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে (এ বলে যে,) "আপনাদের মাযহাব হাদীসের বিপরীত।" এ কারণে এ অধ্যায়ের দু'টি পরিচ্ছেদ করা হচ্ছে- প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলার পক্ষের প্রমাণাদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ সেগুলোর খন্ডন সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। হানাফীদের উচিৎ নিজেদের প্রমাণাদি ওহাবীদের খন্ডনগুলো স্মরণ রাখা।

যোহর ঠান্ডা করে পড়ুন

শীতের মওসূমে যেহেতু দুপুর ঠান্ডা থাকে, সেহেতু ওই সময়ে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার সাথে সাথে পড়ে নেওয়া সুন্নাত; কিন্তু গ্রীষ্মকালে দেরীতে পড়া সুন্নাত; যখন গরমের তীব্রতা কমে যায় এবং দুপুরের তাপ ঠান্ডা হয়ে যায়। দলীলাদি নিম্নরূপ:

হাদীস নং-১-৫.

সর্ব ইমাম বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবূ দাঊদ ও তিরমিযী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তাপ তীব্র হয়, তখন যোহরের নামায ঠান্ডা করে পড়ো। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীস 'হাসান-সহীহ্' পর্যায়ের।

হাদীস নং-৬-১০.

ইমাম আবূ দাউদ ত্বায়ালিসী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে, বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও বায়হাক্বী হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে, কিছুটা ভিন্নতা সহকারে, বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ وَاشْتَكَتِ النَّارُ اِلٰى رَبِّهَا فَقَالَتْ رَبِّ اَكَلَ بَعْضِىْ بَعْضًا فَاَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِى الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِى الصَّيْفِ الخ

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, গরমের তীব্রতা দোযখের আগুনের প্রজ্জ্বলন থেকে। সুতরাং যোহর ঠান্ডা করে পড়ো। দোযখ (আগুন) সেটার মহান রবের দরবারে অভিযোগ করলো, "হে আমার রব! আমার একাংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলেছে। তখন মহান রব সেটাকে দু'টি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেনঃ একটি নিঃশ্বাস শীতকালে, আরেক নিঃশ্বাস গরমকালে।

হাদীস নং ১১.

ইমাম নাসাঈ তাঁর নাসাঈ শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন-

قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَاكَانَ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ

অর্থ: তিনি বলেন, যখন গরম বেশি পড়তো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায ঠান্ডা করে পড়তেন। আর যখন ঠান্ডা পড়তো তখন তাড়াতাড়ি (বিলম্ব না করে) পড়ে নিতেন।

এ হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, গ্রীস্মকালে যোহর বিলম্ব না করে পড়া সুন্নাতের পরিপন্থী।

হাদীস নং-১২-১৯.

বোখারী, আবূ দাউদ, ইবনে আবী শায়বাহ্, তিরমিযী, আবূ দাউদ ত্বায়ালিসী, ত্বাহাভী, আবূ 'আওয়ানাহ্ ও বায়হাক্বী হযরত আবূ যার গিফারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُؤَذِّنَ لِلظُّهْرِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ اَبْرِدْ حَتّٰى

رَاَيْنَا فَيْئَ التِّلَالِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ قَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ -

অর্থ: তিনি বলেন, আমরা এক সফরে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। মুআয্যিন যোহরের আযান দিতে চাইলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ঠান্ডা করো।" তারপর তিনি আযান দিতে চাইলেন। তখন এরশাদ করলেন, "ঠান্ডা করো।" এ পর্যন্ত যে, আমরা টিলাগুলোর ছায়া দেখতে পেলাম। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "গরমের তীব্রতা দোযখের আগুনের তীব্রতা থেকেই। সুতরাং যখন গরম তীব্র হয়; তখন নামাযকে ঠান্ডা করে পড়ো। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, "এ হাদীস হাসান" সহীহ্ পর্যায়ের।

হাদীস নং ২০.

ইমাম ত্বাহাভী হযরত আবূ মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন-

رَاَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَجِّلُ هَا فِى السِّتَاءِ وَيُؤَخِّرُ هَا فِى الصَّيْفِ

অর্থ: তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন যে, তিনি যোহরের নামায শীতকালে তাড়াতাড়ি (বিলম্ব না করে) পড়তেন এবং গরমের মৌসুমে দেরীতে পড়তেন।

এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস পেশ করা যায়; কিন্তু সংক্ষেপে এ বিশটি হাদীস পেশ করে ক্ষান্ত হলাম। যদি বিস্তারিত বিবরণ দেখতে চান, তাহলে 'সহীহুল বিহারী' ও 'ত্বাহাভী শরীফ' পর্যালোচনা করুন!

স্মর্তব্য যে, জুমু'আহ্র নামাযের ওয়াক্বতও যোহরের মতো; গরমের মৌসুমে ঠান্ডা করে পড়া হবে। কিছু লোক প্রচন্ড গরমেও জুমু'আর নামায ওয়াক্বতের একেবারে প্রারম্ভে পড়ে নেয়। এটা সুন্নাতের পরিপন্থী। লা-মাযহাবী গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা হয়তো সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পূর্বেও জুমু'আর নামায পড়ে নিতে দ্বিধাবোধ করে না।

ইমাম বোখারী হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلٰوةِ اِذَاشْتَدَّ الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ يَعْنِى الْجُمُعَةَ -

অর্থ: তিনি বলেন, যখন তীব্র শীত পড়ে, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামায বিলম্ব না করে পড়তেন, আর যখন গরম খুব তীব্রভাবে পড়ে, তখন নামাযকে ঠান্ডা করে পড়তেন অর্থাৎ জুমু'আহর নামায।

মোটকথা, জুমু'আহর নামায যোহরের মতো শীতকালে তাড়াতাড়ি (বিলম্ব না করে) আর গরমের মৌসুমে কিছুটা দেরী করে, গরমের তীব্রতা খতম হয়ে যাবার পর পড়া চাই।

বিবেক বা যুক্তির দাবীও হচ্ছে- গরমের মৌসুমে যোহরের নামায ঠান্ডা করে পড়া চাই। কারণ, প্রচন্ড গরমে যোহরের নামায পড়া মুসলমানদের কষ্টের কারণ হয়। এতে জমা'আত ছোট হয়ে যাবার আশঙ্কা থাকে। কেননা, গরমের মৌসুমে সাধারণ ব্যবসায়ী লোকেরা দুপুরের খানা খেয়ে 'ক্বায়লূলা'হ্ করেন, অর্থাৎ দুপুরে বিশ্রাম নেয় এবং দুপুরের তাপের তীব্রতার সময়টুকু ঘরে অতিবাহিত করতে চায়। যদি এমতাবস্থায় যোহরের নামায পড়া হয়, তবে ওইসব লোক ক্বায়লূলার সুন্নাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর তখন তাদের জন্য মসজিদে হাযির হওয়া কষ্টকরও হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পবিত্র শরীয়ত সহজই করে দেয়।

ফলশ্রুতি

উপরিউক্ত হাদীস শরীফগুলো এবং যুক্তিরূপী দলীল থেকে বুঝা গেলো যে, যোহরের নামাযের সময় দু' দন্ড পরিমাণ ছায়া পর্যন্ত থাকে। আর আসরের নামাযের সময় দু দন্ড পরিমাণ ছায়া হাওয়ার পরক্ষণ থেকে আরম্ভ হয়। এর পক্ষে কতিপয় দলীল পেশ করা যায়-

এক. উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যোহরকে ঠান্ডা করে পড়তেন এবং এমনটি করার হুকুমও দিতেন। প্রকাশ থাকে যে, সর্বত্র, বিশেষ করে আরব ভূ-খন্ডে এক দন্ড ছায়ার পর দুপুরের তাপের প্রখরতা কমে যায়; এক দন্ড পর্যন্ত তীব্র গরম থাকে। যদি এক দন্ড পর্যন্ত ছায়া হতেই যোহরের সময় শেষ হয়ে যায়, তা হলে তো এ হাদীসগুলো ভুল ও অবাস্তব হয়ে যাবে।

দুই. উপরিউক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায় যে, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই সময় নামায পড়েছেন, যখন টিলাগুলোর ছায়া প্রকাশ পেয়ে গিয়েছিলো। এ দন্ড পরিমাণ ছায়া হওয়ার সময়ে টিলার ছায়া প্রকাশ পায় না। কেননা, বিস্তৃতির কারণে সেটার ছায়া এক দন্ডের পর প্রকাশ

পেতে পারে। যদি এ দন্ড হতেই যোহরের সময় খতম হয়ে যায়, তবে এ হাদীস ও ভুল সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

তিন. আসরের সময়সীমা সব সময় যোহরের সময়সীমা অপেক্ষা কম হওয়া চাই। যদি এক দন্ড হতেই যোহরের ওয়াক্বত খতম হয়ে যায়, তবে তা যোহরের সমান বরং কখনো যোহর অপেক্ষা দীর্ঘ হয়ে যাবে। এটা শরীয়তের কানুনের বর খেলাফ। কেননা, বোখারী শরীফ হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা একটি মরফূ' হাদীস বর্ণনা করেছে। তা হচ্ছে- হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতের উপমা ইহুদী ও খ্রিস্টান্দের মোকাবেলায় এভাবে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি কোন মযদূরকে ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত এক 'ক্বীরাত'-এর বিনিময়ে রাখলো। অন্যজনকে দুপুর থেকে আসর পর্যন্ত এক ক্বীরাত্বের বিনিময়ে রাখলো। তৃতীয় মযদূরকে আসরের নামায থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দু' ক্বীরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে রাখলো। প্রথম মযদূর ইহুদী, দ্বিতীয় মযদূর খ্রিস্টান আর তৃতীয় মযদূর মুসলমান। কারণ, তাঁর কাজের সময় স্বল্প, কিন্তু মযদূরী দ্বিগুণ। হাদীসে শেষাংশের ইবারত নিম্নরূপ:

اَلاَ فَاَنْتُمْ اَلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ اِلٰى مَغْرِبِ الشَّمْسِ اَلاَ لَكُمُ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ

অর্থ: খবরদার, তোমরাই হলে ওইসব লোক, যারা আসরের নামায থেকে সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত কাজ করে থাকো। তোমাদের মযদূরী দ্বিগুণ।

যদি আসরের সময় এক দন্ড হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয়ে যেতো, তা হলে তো যোহরের সমান বরং কখনো তদপেক্ষাও বেশী হয়ে যেতো। এমতাবস্থায় মুসলমানদের এ উপমা বর্ণনা করা হতো না। সুতরাং আসরের নামাযের সময় যোহর অপেক্ষা কম হওয়া চাই। এটা তখনই হতে পারে, যখন তা দু' দন্ড ছায়া হওয়ার পর থেকে আরম্ভ হয়। যদি এক দন্ড হওয়ার পরক্ষণ থেকে আসরের সময় আরম্ভ হয়ে যায়, তাহলে বোখারী শরীফের এ হাদীসও ভুল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এজন্য মানতে হবে যে, আসরের ওয়াক্বত শুরু হয় দু' দন্ড ছায়া হওয়ার পর থেকে শুরু হয়।

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

এ মাসআলার বিপক্ষে গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীদের কিছু সংখ্যক আপত্তি তো ওইগুলোই, যেগুলোর জবাব আমি এর পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দিয়েছিলাম। যেমন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "নামায ওয়াক্বতের প্রারম্ভে পড়া উত্তম।" অথবা, যেমন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন তিনটি বিষয়ে বিলম্ব করো না- নামায, তাওবা ও কন্যার বিবাহ্। কিছু কিছু আপত্তি এগুলো ব্যতীত। আমরা ওই আপত্তিগুলো, সেগুলোর খন্ডন সহকারে আরয করছি। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ববূল করুন!

আপত্তি-১.

ইমাম আবূ দাঊদ ও ইমাম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা'তে হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করেছেন, হযরত জিব্রাঈল আমাকে দু' দিন নামায পড়িয়েছেনঃ একদিন প্রতিটি নামায ওয়াক্বতের প্রথম ভাগে পড়েছেন, আর দ্বিতীয় দিন প্রত্যেক নামায ওয়াক্বতের শেষ ভাগে। এর কিছু ইবারত নিম্নরূপ-

وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِّثْلَهٗ

অর্থঃ হযরত জিব্রাঈল আমাকে প্রথম দিনে আসর ওই সময় পড়িয়েছেন, যখন প্রত্যেকটা জিনিসের ছায়া এক দন্ড হয়ে গেছে।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, আসরের নামাযের সময় কোন জিনিসের ছায়া এক দন্ড হয়ে যাবার পর শুরু হয়ে যায়। আর যোহরের সময় এর পূর্বে খতম হয়ে যায়।

খন্ডন : এ আপত্তির কয়েকটা জবাব হতে পারে:

এক. এ হাদীস শরীফ, হে লা-মাযহাবীরা, আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, এ হাদীসে এ জায়গায় এও রয়েছে-,

فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهٗ مِثْلَهٗ

অর্থঃ যখন দ্বিতীয় দিন হলো, তখন হযরত জিব্রাঈল যোহরের নামায পড়িয়েছেন, যখন প্রত্যেক জিনিসের ছায়া এ দন্ড হয়ে গেলো।

বলুন, প্রথম দিনে ছায়া এক দন্ড হওয়ার পরপর আসর পড়িয়েছেন আর দ্বিতীয় দিনে বিশেষ করে ওই সময় যোহর পরিয়েছেন; অথচ আসরের সময় যোহরের সময় বের হয়ে যাবার পর আরম্ভ হয়। যদি এক দন্ড পরিমাণ ছায়া হতেই আসরের নামাযের সময় আরম্ভ হয়ে যায়; তবে দ্বিতীয় দিন ওই সময়ে যোহরের নামায কেন পড়ানো হলো।

দুই. এ হাদীসে এখানেই এ শব্দগুলো রয়েছে-

وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهٗ مِثْلَيْهِ

অর্থঃ আর দ্বিতীয় দিন আমাকে আসরের নামায তখন পড়িয়েছেন, যখন প্রত্যেক কিছুর ছায়া দু' দন্ড হয়ে গেলো।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, আসরের নামাযের আখেরী ওয়াক্বত ছায়া দু' দন্ড হওয়া পর্যন্ত; অথচ আখেরী ওয়াক্বত হচ্ছে সূর্যাস্ত।

তিন. এ হাদীসে প্রথম দিনের আসরের নামাযে শুধু এক দন্ড ছায়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় দিনের আসরের শেষ ওয়াক্বতে দু'দন্ড ছায়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; মূল ছায়ার কথা, যা দুপুরের সময় হয়, একেবারে উল্লেখ করা হয়নি; অথচ আপনারাও বলেন যে, এ দন্ড কিংবা দু' দন্ড মূল ছায়া ব্যতীত হওয়া চাই! সুতরাং এখানে যা আপনাদের জবাব হবে, তা আমাদের জবাবও।

চার. এ হাদীসে তো এটা রয়েছে যে, হুযূর-ই আক্রামকে এক দন্ড ছায়া হতেই আসরের নামায পড়িয়ে দিয়েছেন আর যে সব হাদীস আমি প্রথম পরিচ্ছেদে পেশ করেছি, সেগুলোতে একথার উল্লেখ রয়েছে যে, হুযূর-ই আক্রাম গরমের মৌসুমে যোহরের নামায ঠান্ডা করে আর টিলার ছায়া পড়তেই সম্পন্ন করেছেন; যা এক দন্ড হবার পরে হয়ে থাকে। সুতরাং হাদীসগুলো পরস্পর বিরোধপূর্ণ হলো। আর আমার পেশকৃত হাদীসগুলোই প্রাধান্য পাবে। কেননা, সেগুলো শরীয়তসম্মত ক্বিয়াসের অনুরূপ হলো। আর এ হাদীস আমল করা যোগ্য নয়; কেননা তা 'শর'ঈ ক্বিয়াস'-এর বিরোধী। পরস্পর বিরোধ দেখা দিলে হাদীসকে ক্বিয়াসের মাধ্যমে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

পাঁচ. হাদীস-ই জিব্রাঈলের এ আমল প্রথমে সম্পন্ন হয়েছে, কেননা মি'রাজ রাতের ভোরে হয়েছে, যখন নামায ফরয হয়েছিলো। আর হুযূর-ই আক্রামের আমল শরীফ, যা আমি প্রমাণ করেছি, অর্থাৎ ঠান্ডা করে নামায পড়া পরবর্তী সময়ের আমল। সুতরাং আপনাদের পেশকৃত হাদীস 'মানসূখ' (রহিত),

আমাদের পেশ কৃত হাদীসগুলো সেটার রহিতকারী (নাসিখ)। এ কারণে এ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

ছয়. শরীয়তের নিয়ম হচ্ছে- ইয়াক্বীন বিশিষ্ট জিনিষ সন্দেহ বিশিষ্ট জিনিষ দ্বারা দূরীভূত হতে পারে না। ইয়াক্বীনকে ইয়াক্বীনই অপসারিত করতে পারে। এ 'নিয়ম'-এর উপর শত শত মাসআলা অনুমিত হয়েছে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার সাথে সাথে যোহরের ওয়াক্ত নিশ্চিতভাবে এসে যায়। আর এক দন্ড ছায়া হতেই ওই ওয়াক্ত খতম হওয়া সন্দেহপূর্ণ। সুতরাং এ সন্দেহ দ্বারা যোহরের ওয়াক্ত খতম হবে না এবং আসরের ওয়াক্ত প্রবেশ করবে না বা আরম্ভ হবে না। দু' দন্ড ছায়া হলে যোহরের ওয়াক্ত খতম হওয়া ইয়াক্বীনী। সুতরাং এ নির্দেশই আমল (পালন) করার উপযোগী; আপনাদের কথা নয়।

আপত্তি-২

সাহাবা-ই কেরাম বলেন, "আমরা হুযূরের সাথে যোহরের নামায এত তাড়াতাড়ি পরতাম যে, ফরশ (মেঝে) খুব গরম থাকতো। আমরা সেটার উপর সাজদা করতে পারতাম না। এ কারণে সাজদার স্থানে কাপড় কিংবা ঠান্ডা পাত রেখে দিতাম। এ থেকে বুঝা গেলো যে, যোহরের নামায গরমকালেও ওয়াক্বতের প্রারম্ভে পড়ে নেয়া উচিৎ।

খন্ডন

এরও কতিপয় জবাব দেওয়া যায়:

প্রথমত, এ হাদীস ওইসব হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলোতে গ্রীষ্মকালের যোহর দেরীতে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আর ওই হাদীসগুলো 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ'র অনুরূপ। সুতরাং ওইগুলোই আমল করার যোগ্য। আর এ হাদীস আমল করার যোগ্য নয়; অথবা মানসূখ।

দ্বিতীয়ত, ফরশ (মেঝে)-এর তাপ, বিশেষ করে আরবে অনেক দেরীক্ষণ পর্যন্ত অর্থাৎ এ দন্ড পরিমাণ ছায়া হবার পর পর্যন্ত থাকে। এ (এ মেঝে)-এর গরম পূর্বেকার ছিলো; ওয়াক্বত কিন্তু ঠান্ডা হয়ে যেতো। সুতরাং এ হাদীস ওইসব হাদীসের মোটেই বিপরীত নয়; যেগুলোতে ঠান্ডা করে পড়ার নির্দেশ রয়েছে। যতটুকু পারা যায় হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

আপত্তি-৩.

সাহাবা-ই কেরাম বলতেন, "আমরা হুযূর-ই আক্রামের সাথে আসরের নামায এত তাড়াতাড়ি পড়ে নিতাম যে, আসরের নামাযের পর উট যবেহ্ করে সেটার গোশ্ত কেটে টুকরো করে ভুনে সূর্য ডুবার পূর্বে খেয়ে নিতাম। আর আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আসরের নামাযের পর তিন মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে আপন আপন ঘরে পৌঁছে যেতেন, অথচ তখনো সূর্য চমকাতে থাকতো; যেমনটি মুসলিম শরীফ ইত্যাদিতে আছে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, আসরের নামায ছায়া দু'দন্ড হবার পূর্বে পড়া হতো। কেননা, দু'দন্ডের পর এতটুকু সময় বাঁচে না যে, এ কাজ করা যাবে। (আপত্তিকারী আম ওহাবী)

খন্ডন

এ সব হাদীসই সঠিক; কিন্তু আপনাদের এ উল্লেখিত ফলশ্রুতি বের করা ভুল। দু'দন্ডের পর আসর পড়ে তিন মাইলের দুরত্ব অতি উত্তমরূপে অতিক্রম করতে পারে। আরববাসীরা অত্যন্ত দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়। আমাদের এখানেও কিছু লোক আছে, যারা মাত্র দশ মিনিটে এক মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে। তিন মাইলের পথ আধ ঘন্টায় অতিক্রম করে। আসরের সময়সীমা কোন কোন সময়ে (মৌসুমে) দু' ঘন্টা অপেক্ষাও বেশী হয়। অনুরূপ, উট যবেহ করে ফেলা এবং ভুনে খেয়ে নেওয়া সূর্যাস্তের পূর্বে সম্ভবপর হয়। আরবের লোকেরা যবেহ্ করা, গোশত পরিস্কার করা ও রান্না করার মধ্যে খুবই পটু হন। অভিজ্ঞতা থেকে এমনটি সুস্পষ্ট হয়।

আপত্তি-৪.

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত-

قَالَ مَا كُنَّا نَقِيْلُ وَلاَ نَتَغَدّٰى اِلاَّ بَعْدَالْجُمُعَةِ

অর্থ: আমরা (সাহাবীগণ) দুপুরে বিশ্রাম নিই না, নাস্তাও খাইনা কিন্তু জুমার পর। এ থেকে বুঝা গেলো যে, জুমার নামায প্রচন্ড গরমের মৌসুমেও বিলম্ব না করে পড়া চাই। দুপুরের বিশ্রাম এবং সকালের নাস্তা ও নামাযের পর খাওয়া উচিৎ। এতদ্সত্ত্বেও আপনারা কিভাবে বলছেন যে, গরমের মৌসুমে জুমা ঠান্ডা করে পড়ো?

খন্ডন : এ আপত্তির দু'টি জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস বাহ্যিক অর্থে, হে লা-মাযহাবীরা, আপনাদের বিপক্ষে। কেননা, এ থেকে একথা অপরিহার্য হয়ে যায় যে, নামায-ই জুমা নাস্তা ও দুপুরের বিশ্রাম

(ক্বায়লূলাহ্)'র পূর্বে পড়তে হবে। সুতরাং উচিৎ হবে ফজরের পর তাৎক্ষণিকভাবে জুমার নামায পড়ে নেওয়া। কেননা, নাস্তা তো একবারে ভোরে করা হয়। আপনারাও তো এত তাড়াতাড়ি জুমা পড়ার কথা বলছেন না।

দুই. হাদীস শরীফের মর্মার্থ এ যে, আমরা জুমার দিনে জুমার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের কারণে নামাযের পূর্বে না নাস্তা করতাম, না ক্বায়লূলাহ্ করতাম (বিশ্রাম নিতাম)। জুমার নামাযের পর আমরা এ কাজগুলো করতাম। অর্থাৎ নামাযের কারণে নাস্তা ও আরাম নামাযের পরেই করতাম; নাস্তা ও আরাম গ্রহণের জন্য জুমু'আহ্ পূর্বে পড়ে নিতাম না; যেমনটি আপনারা বুঝে নিয়েছেন।

তিন. এ হাদীস শরীফে শীতকালের জুমু'আর উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ ওই মৌসুমে দিন ছোটতর হয়; দুপুরে গরম থাকে না। এ কারণে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তেই জুমু'আহ্ পড়ে নিতেন; দুপুরের খাবার ও আরাম গ্রহণ জুমু'আর পরে করতেন। এখনো মদীনা মুনাওয়ার লোকেরা এমনই করে থাকেন। বোখারী শরীফে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

اَنَّالنَّبِىَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ كَانَيُصَلِّىالْجُمُعَةَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ

অর্থাৎ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর জুমু'আহ্ পড়তেন।

সুতরাং উপরে বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত হাদীসের অর্থ এ নয় যে, জুমু'আর নামায সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পূর্বে পড়া হতো। যেহেতু জুমু'আর নামায যোহরের নামাযের স্থলাভিষিক্ত, সেহেতু সেটা যোহরের সময়েই সম্পন্ন করা হবে। আর গরমের মৌসুমে ঠান্ডা করে এবং শীতকালে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তেই জুমু'আহ্ পড়ে নেওয়া হবে; যোহরের মতোই। এখন হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ নেই।

---o---

বিংশতিতম অধ্যায়

[আযান ও ইক্বামতের শব্দাবলী]

আযান ও তাকবীর (ইক্বামত)-এর শব্দাবলী

শরীয়তে আযান ও ইক্বামত (তাকবীর)-এর শব্দগুলো এবং বিধানাবলী পরস্পর প্রায় কাছাকাছিও এক ধরনের। যেসব শব্দ আযানের, ওই শব্দগুলো ইক্বামতেরও; শুধু ইক্বামতে 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্' (حَيَّ الْفَلَاحَ)-এরপর 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাত' (قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ) দু' বার বাড়িয়ে বলতে হয়। তারজী' (ترجيع) না আযানে আছে, না ইক্বামতে। আযানের সর্বমোট ১৫টি শব্দ রয়েছে আর ইক্বামতে সতেরটি শব্দ; যেমনটি সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীদের আযানও এ আযান থেকে আলাদা আর ইক্বামতও এ ইক্বামত থেকে ভিন্নতর। তারা আযানের উভয় 'শাহাদত'কে দু' দু' বারের পরিবর্তে চারবার করে বলে থাকেন। প্রথমে দু' বার নিম্নস্বরে, অতঃপর উচ্চ আওয়াজে। এ'কে 'তারজী' (ترجيع) বলা হয়। অর্থাৎ 'প্রথমে 'আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু নিম্নস্বরে বলেন, তারপর উচ্চস্বরে। এভাবে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রসূলাল্লাহ' বলেন। এ হিসেবে তাদের মতে, আযানের কলেমাগুলোর সংখ্যা পনের-এর স্থলে ঊনিশ হয়। আর তারা ইক্বামত (তাকবীর)-এর কলেমাগুলোকে একবার করে বলেন। তাও এভাবে যে, উভয় 'শাহাদত' এবং 'হাইয়্যা 'আলাস্ সালাহ্' ও 'হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ্'ও একেক বার বলেন। তাদের মতে, ইক্বামতের কলেমাগুলোর সংখ্যা দাঁড়ায় সতের-এর জায়গায় তের এবং দাবী করে ইসলামী আযান ও ইক্বামত হচ্ছে তা-ই, যা তারা বলছেন। আর তাদের পক্ষ থেকে ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রতি এ জন্য তিরস্কার ও তাঁর বিপক্ষে সমালোচনা এবং ওই পরম সম্মানিত স্বত্তাকে গালি দেয়ার মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে এ প্রচলিত ইসলামী আযানের প্রমাণাদি এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো সেগুলোর খন্ডন সহকারে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কবূল করুন!

প্রথম পরিচ্ছেদ

বর্তমানকার আযান ও ইক্বামতের পক্ষে প্রমাণাদি

সঠিক তথ্য হলো- আযান ও ইক্বামতের কলেমাগুলো দু' দু'টিই; না আযানে তারজী' আছে, না ইক্বামত (তাকবীর)-এর কলেমাগুলো একেকবার। প্রথমে 'তাকবীর' চারবার, পরিশেষে 'কলেমা-ই লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্' একবার। অবশিষ্ট শব্দগুলো দু'বার। প্রমাণাদি নিম্নে উপস্থাপিত হলো।

হাদীস নং ১-৬

সর্ব ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে খোযাইমাহ্, ইবনে হাববান, বায়হাক্বী ও দারু ক্বুত্বনী সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّه قَالَ كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّه يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ

অর্থঃ তিনি (হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন, হুযূর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে আযানের কলেমাগুলো দু' দু'বার ছিলো আর তাকবীর একেকবার এতদ্ব্যতীত যে, তাকবীর (ইক্বামত)-এ 'ক্বাদ্ ক্বা-মাতিস সালাতু'ও বলতেন।

এ হাদীস সম্পর্কে ইবনে জূযীর মতো কঠোরভাবে সমালোচনাকারী মুহাদ্দিসও বলেছেন-

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ وَثَّقَه اِبْنُ حَبَّان وَغَيْرُه (بهارى)

অর্থঃ এ সনদ সহীহ্ (বিশুদ্ধ)। সা'ঈদ আল-মাক্ববুরীকে ইবনে হাববান নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, আযানে তারজী' (ترجيع) নেই; অন্যথায় আযানের কলেমাগুলো দু' দু' বার হতো না; শাহাদত দু'টি চারচার বার হতো। ইক্বামত একেকবার হওয়ার ব্যাপারে জবাব দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আরয করা হবে।

হাদীস নং-৭.

ইমাম ত্বাবরানী 'মু'জাম-ই আওসাত্ব'-এ আবূ মাহযূরাহ্, রসূলে পাকের মুআয্যিনের পৌত্র, হযরত ইব্রাহীম ইবনে ইসমাঈল ইবনে আবদুল মালিক ইবনে আবু মাহযূরাহ্ থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ سَمِعْتُ جَدِّىْ عَبْدَالْمَلِكِ بْنَ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ اِنَّه سَمِعَ اَبَاهُ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ اَلْقٰى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اِلٰى اٰخِرِهٖ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ تَرْجِيْعًا

অর্থ: তিনি বলেন, আমি আমার দাদা আবদুল মালিক ইবনে আবূ মাহযূরাহকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, তিনি তাঁর পিতা আবূ মাহ্যূরাহ্কে বলতে শুনেছেন, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে আযানের একেক 'হরফ' (শব্দ) বলেছেন- 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' শেষ পর্যন্ত । এ'তে তারজী'র কথা উল্লেখ করেননি ।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, আযানে তারজী'র হুকুম হুযূর-ই আন্ওয়ার দেননি । সুতরাং তারজী' সুন্নাতের পরিপন্থী ।

হাদীস নং-৮ ও ৯

ইবনে আবূ শায়বাহ্ ও তিরমিযী হযরত ইবনে আবূ লায়লা তাবে'ঈ থেকে কিছুটা ভিন্ন বচনে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ زَيْدٍ الْاَنْصَارِىُّ مُؤَذِّنُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْفَعُ الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ

অর্থ: তিনি বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ আন্সারী হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মুআয্যিন আযান ও তাকবীর (ইক্বামত) দু' দু'বার বলতেন ।

এ হাদীস শরীফ থেকে দু'টি মাসআলা জানা যায়- এক. আযানে তারজী' নেই এবং দুই. ইক্বামত অর্থাৎ তাক্বীরের কলেমাগুলো দু' দু'বার বলা হবে; একবার করে না ।

হাদীস নং-১০.

ইমাম বায়হাক্বী হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেন-

اَنَّه كَانَ يَقُوْلُ الْاَذَانُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَالْاِقَامَةُ مَثْنٰى مَثْنٰى وَمَرَّ بِرَجُلٍ يُقِيْمُ مَرَّةً مَرَّةً فَقَالَ اِجْعَلْهَا مَثْنٰى مَثْنٰى لَا اُمَّ لَكَ

অর্থ: তিনি বলতেন, আযানও দু' দু' বার, তাকবীরও দু' দু'বার । আর তিনি (হযরত আলী) এক ব্যক্তির পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন, যে ইক্বামত একেকবার বল ছিলো । তখন তিনি বললেন, সেগুলো দু' দু'বার বলো । তোমার মা না থাকুক!

হাদীস নং ১১

ইমাম আবূ দাঊদ হযরত মু'আয ইবনে জবল থেকে এক দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন; যাতে আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ আনসারীর স্বপ্নের ঘটনা উল্লেখ করা

হয়েছে; যা তিনি আযান সম্পর্কে দেখেছিলেন । তিনি হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র দরবারে এসে আরয করলেন, "আমি এক ফেরেশতাকে স্বপ্নে দেখলাম, যিনি ক্বেবলার দিকে মুখ করে, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু...' শেষ পর্যন্ত বলেছেন । তারপর কিছুক্ষণ থেমে আযানের মতো তাকবীরও বলেছেন ।... শেষ পর্যন্ত ।

এ হাদীসের শেষ শব্দগুলো এ-ই ছিলো-

قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَّنْهَا بِلَالًا فَاَذَّنَ بِهَا

অর্থ: বর্ণনাকারী বলেন, হুযূর-ই আক্রাম হযরত আবদুল্লাহ্কে বললেন, "এ আযান হযরত বেলালকে বলে দাও ।" অতঃপর হযরত বেলাল আযান এ কলেমাগুলো দ্বারাই দিয়েছেন ।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, না স্বপ্নে দৃষ্ট ফেরেশতা আযানে তারজী'র শিক্ষা দিয়েছেন, না ইসলামের প্রথম আযানে তারজী' ছিলো, যা হযরত বেলাল হুযূর-ই আন্ওয়ারের উপস্থিতিতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দের শিক্ষা অনুসারে বলেছিলেন ।

একথাও প্রতীয়মান হয় যে, ইক্বামতও আযানের মতো দু' দু'বার; কিন্তু তা'তে 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাত'ও রয়েছে ।

হাদীস নং-১২ ও ১৩

ইবনে আবী শায়বাহ্ ও বায়হাক্বী হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লার সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ حَدَّثَنَا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ عَبْدَ اللهِ ابْنَ زَيْدِ نِ الْاَنْصَارِىَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَاَيْتُ فِى الْمَنَامِ كَاَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ اَخْضَرَانِ فَقَامَ عَلٰى حَائِطٍ فَاَذَّنَ مَثْنٰى مَثْنٰى وَاَقَامَ مَثْنٰى مَثْنٰى

অর্থ: তিনি বলেন, আমাদেরকে হুযূর-ই আক্রামের অনেক সাহাবী খবর দিয়েছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ আনসারী হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র দরবারে হাযির হন আর আরয করেছেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি- যেমন এক পুরুষ ব্যক্তি দন্ডায়মান হয়েছে, তার উপর দু'টি সবুজ কাপড় রয়েছে । অতঃপর সে দেওয়ালের উপর দন্ডায়মান হয়েছে, আর আযানও দু' দু'বার দিয়েছেন, ইক্বামত ও দু' দু'বার বলেছেন ।

স্মর্তব্য যে, মহান রব সাহাবা-ই কেরামকে আযানের শিক্ষা স্বপ্নে ফেরেশতার মাধ্যমে দিয়েছেন । এ স্বপ্নে না আযানে তারজী' আছে, না ইক্বামত একেকবার ।

বুঝা গেলো যে, হানাফী আযান ও তাকবীর (ইক্বামত) হচ্ছে তা-ই, যার শিক্ষা মহান রবই দিয়েছেন।

হাদীস নম্বর ১৪-১৬.

সর্ব ইমাম দার-ই ক্বুত্বনী, আবদুর রায্যাক্ব ও ত্বাহাভী হযরত আস্ওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ بِلَالاً كَانَ يُثْنِىْ الْاَذَانَ وَيُثْنِى الْاِقَامَةَ وَكَانَ يُبْدَأُ بِالتَّكْبِيْرِ وَيَخْتِمُ بِالتَّكْبِيْرِ

অর্থ: নিশ্চয় হযরত বেলাল আযানও দু' দু'বার বলতেন এবং ইক্বামতও দু' দু'বার বলতেন। এ দু'টিকে 'তাকবীর' দ্বারাই আরম্ভ করতেন এবং তাকবীর বলেই সমাপ্ত করতেন।

হাদীস নং-১৭.

ইমাম তাবরানী তাঁর কিতাব 'মুসনাদ-ই শাহীন'-এ হযরত জানাদাহ্ ইবনে আবূ উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ بِلَالٍ اَنَّه كَانَ يَجْعَلُ الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ سَوَاءٌ مَثْنٰى مَثْنٰى

অর্থ: তিনি হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আযান ও ইক্বামত উভয়টি সমান বলতেন; অর্থাৎ দু' দু'বার।

হাদীস নং-১৮

ইমাম দারু ক্বুত্বনী হযরত আবূ জোহায়ফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ بِلَالاً كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُقِيْمُ مَثْنٰى مَثْنٰى

অর্থ: হযরত বেলাল হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে আযান দু' দু'বার বলতেন এবং ইক্বামত ও দু' দু'বার (বলতেন)।

হাদীস নং-১৯.

ইমাম ত্বাহাভী হযরত হাম্মাদ ইবনে ইব্রাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন- قَالَ كَانَ ثَوْبَانُ يُؤَذِّنُ مَثْنٰى مَثْنٰى

অর্থ: হযরত সাওবান আযান দু' দু'বার বলতেন।

হাদীস নং-২০

ইমাম ত্বাহাভী হযরত ওবায়াদ, হযরত সালমাহ্ ইবনে আক্ওয়া'র আযাদ কৃত ক্রীতদাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ سَلْمَةَ بْنَ الْاَكْوَعِ كَانَ يُثْنِى الْاَذَانَ وَالْاِقَامَةَ

অর্থ: হযরত সালমাহ্ ইবনে আক্ওয়া' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আযান ও ইক্বামত দু' দু'বার বলতেন।

আমি এ বিশটি হাদীস শরীফ নমূনা স্বরূপ পেশ করলাম। অন্যথায় এ সম্পর্কে অনেক হাদীস শরীফ রয়েছে। যদি তাফসীল (বিস্তারিত বর্ণনা) দেখতে চান তবে 'সহীহুল বিহারী' ও 'ত্বাহাভী' শরীফ ইত্যাদি পাঠ-পর্যালোচনা করুন! এ হাদীসগুলো থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রতীয়মান হয়-

১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে সা'লাবাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্বপ্ন, যা ইসলামী আযানের মৌলিক দলীল, এর মধ্যে না তারজী'র উল্লেখ আছে, না ইক্বামত এককেবার বলার কথা আছে; বরং ওই আযান ও ইক্বামতের (তাকবীর) কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমভাবে প্রচলিত।

২. ফেরেশতা যে আযানের তা'লীম দিয়েছেন, তাতে তারজী'ও নেই এবং ইক্বামত একবার করে বলার উল্লেখ নেই। তা-ই হচ্ছে আমাদের আযান।

৩. হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর প্রসিদ্ধ মুআয্যিন হযরত বেলাল ও হযরত সাওবান প্রমুখ সব সময় ওই আযান ও ইক্বামত দিতেন, যা আম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত; অর্থাৎ হানাফী আযান ও ইক্বামত।

৪. অতি মর্যাদাবান সাহাবী ও তাবে'ঈগণ, যেমন- হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, হযরত সালমাহ্ ইবনে আক্ওয়া', হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ, হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ, হযরত ওবায়দ ও হযরত আবূ জুহায়ফাহ্ প্রমুখ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ও-ই আযান বলতেন ও বলার নির্দেশ দিতেন, যা প্রচলিত রয়েছে; তাঁরা তারজী' ও এককেবার ইক্বামত বলার পক্ষে অভিমত দিতেন না।

৫. হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এককেবার ইক্বামত দিতেন এমন লোককে পছন্দ করতেন না। তিনি দু' দু'বার বলার নির্দেশ দিতেন। যদি তারজী' ও ইক্বামত এককেবার বলা সুন্নাত হতো, তা হলে এসব হযরত, যাঁরা রসূলে আক্রামের মেজাজ শরীফ বুঝতেন, সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন, বিদ্'আত-ই সাইয়্যেআহ্কে ঘৃণা করতেন, এটাকে কেন বর্জন করেছেন, এমনটি যারা করতো তাদেরকে কেন তা করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদেরকে কেন তিরস্কার করেছেন?

আক্বল বা যুক্তির দাবী

আযানের শাহাদত দু'টিতে তারজী' না হওয়াই যুক্তির দাবী। কেননা, আযানে মূল জিনিস হচ্ছে- নামায ও কৃতকার্যতা। কারণ, আযান নামাযের আরকান ও দা'ওয়াত বা আহ্বানের জন্যই। অবশিষ্ট কলেমাগুলো হচ্ছে তাকবীর ও শাহাদত ইত্যাদি, বরকত অথবা ভূমিকা অথবা নামাযের প্রতি আগ্রহী ও সজাগ করার জন্যই। যখন 'সালাত' ও 'ফালাহ্'-এর মধ্যে বারবার বলা বা তারজী' নেই, যা হচ্ছে আযানের মৌলিক বিষয়, তখন এ কলেমাগুলোর মধ্যেও তারজী' না হওয়া চাই। যা সেটার তাবে' (অনুসারী)।

দ্বিতীয়ত, আযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে- নামাযের জন্য আম ঘোষণা। এ জন্য আযান উঁচু জায়গায় ও উঁচু আওয়াজে বলতে হয়; কান দু'টিতে আঙ্গুল লাগানো (ঢুকানো) চাই, যাতে আওয়াজ খুব উঁচু হয়ে বের হয়। এখন এ দু' শাহাদতকে প্রথমত: আস্তে আস্তে বলা আযানের উদ্দেশ্যের একেবারে বিপরীত। এর প্রতিটি কলেমা উঁচু আওয়াজে বলা চাই। দেখুন, আযানের শুরুতে তাকবীর চারবার বলা হয় এবং চারবারই খুব উঁচু আওয়াজে বলা হয়। যদি দু' শাহাদত ও চারবার হতো, তবে চারবার-ই উঁচু আওয়াজে হতো।

তৃতীয়ত, ইক্বামত আযানের মতোই, এমনকি সেটাকে কোন কোন হাদীসে আযান বলা হয়েছে। যেমন-হুযূরও আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন- بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلٰوةٌ অর্থাৎ প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যভাগে নামায রয়েছে; অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের মধ্যখানে নামায আছে। পার্থক্য শুধু 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সোয়ালা-ত'-এরই। অর্থাৎ এ বাক্যটা শুধু ইক্বামতে আছে, আযানে নেই। সুতরাং উচিৎ হবে- ইক্বামতের শব্দাবলীও আযানের মতো দু' দু' বার বলা।

চতুর্থত, আযানে কিছু সংখ্যক শব্দ দু' দু'বার এসেছে, অর্থাৎ প্রথমেও শেষেও; যেমন- তাকবীর ও কলেমা। আর ইক্বামতের কিছু সংখ্যক শব্দ দু' বার করে বলতে হয় না; বরং শুধু এক জায়গায় এসেছে, যেমন 'সালাত ও ফালাহ'। যেসব শব্দ বারংবার বলতে হয় তা প্রথমবারে দ্বিগুণ, দ্বিতীয় বারে তার অর্দ্ধেকএ তাকবীর প্রথম বারে চারবার, শেষের বারে দু' বার। তাওহীদের শাহাদত প্রথমবারে দু' দু'বার, শেষ বারে একেকবার। সুতরাং উচিত হচ্ছে- তাকবীর বা ইক্বামতেও তেমনি হওয়া। অতএব, হানাফী আযান ও ইক্বামত, যা আজ আম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত, একেবারে সহীহ্ ও সুন্নাতের অনুরূপ। এর বিরূপ সমালোচনা ও তিরস্কার করা মুর্খতা ও বোকামী বৈ-কি ছুই নয়।

--o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

হানাফী আযান ও ইক্বামতের বিপক্ষে গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবী। এ পর্যন্ত যেসব আপত্তি করেছে এবং যেগুলো আমাদের নিকট পৌঁছিছে, ওইগুলো খন্ডন সহকারে আরয করছি। যদি ভবিষ্যতে নতুন কোন আপত্তির খবর পাই, তাহলে ইন্শা-আল্লাহ্, পরবর্তী সংস্করণে সেগুলোর খন্ডন করা হবে।

আপত্তি-১.

মুসলিম শরীফে ইমাম মুসলিম হযরত আবূ মাহযূরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে পূর্ণ আযানের হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে স্বয়ং আযান শিক্ষা দিয়েছেন। এর কিছু বচন নিম্নরূপ:

ثُمَّ تَعُوْدُ فَتَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ - اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ -

অর্থ: উভয় শাহাদতের পর আবার বলো, 'আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্!"

এ থেকে বুঝা যায় যে, খোদ্ হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মাহযূরাহকে আযানের শাহাদত দু'টির মধ্যে তারজী' শিক্ষা দিয়েছেন। সুতরাং আযানে তারজী' সুন্নাত।

খন্ডন :

এ আপত্তির কতিপয় জবাব রয়েছে-

প্রথমত, হযরত আবূ মাহযূরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বর্ণনাগুলো জঘন্যভাবে পরস্পর বিরোধী। এ হাদীসে তিনি তারজী'র কথা উল্লেখ করেছেন, আর তাঁরই যে বর্ণনা (রেওয়ায়ত) আমি প্রথম পরিচ্ছেদে ত্বাবরানী শরীফের বরাতে পেশ করেছি, তাতে তারজী'র উল্লেখ মোটেই নেই। ইমাম ত্বাহাভী ওই হযরত আবূ মাহযূরাহ থেকে যে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, তাতে আযানের শুরুতে চার তাকবীরের পরিবর্তে দু' বার তাকবীরের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং হযরত আবূ মাহযূরার রেওয়ায়ত পরস্পর বিরোধের কারণে আমলের উপযোগী নয়; যেমনটি পরস্পর বিরোধের বিধান বা নিয়ম রয়েছে।

দ্বিতীয়ত,

হযরত আবূ মাহযূরাহর এ তারজী' বিশিষ্ট হাদীস ওই সব প্রসিদ্ধ হাদীসের বিপরীত, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে পেশ করেছি; যেগুলোতে তারজী'র উল্লেখ নেই। সুতরাং ওই মশহুর হাদীসগুলোই আমলের উপযোগী; এ হাদীস (খবর)-ই ওয়াহিদ নয়।

তৃতীয়ত,

হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম-এর প্রসিদ্ধ মুআয্যিন হযরত বেলাল ও হযরত সাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এবং এরপরে কখনো আযানে তারজী' করেননি। সুতরাং তাঁদের আমল বেশি গ্রহণযোগ্য।

চতুর্থত,

এ হাদীসে আবূ মাহযূরাকে আম সাহাবীগণ বর্জন করেছেন; তাঁদের আমল তারজী'র পক্ষে ছিলো না; বরং তারজী'র বিপক্ষে ছিলো। সুতরাং সেটাই বেশী শক্তিশালী।

পঞ্চমত,

আবূ মাহযূরার এ হাদীস 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈরও বিপরীত। কিন্তু আমাদের পেশকৃত হাদীসগুলো ক্বিয়াসের অনুরূপ। সুতরাং ওই হাদীসগুলো আমল করার উপযোগী; এ হাদীস নয়। পরস্পর বিরোধ হলে এ বিধান বা নিয়মই প্রযোজ্য।

ষষ্ঠত,

এখানে ওই জবাবই প্রনিধানযোগ্য ও প্রযোজ্য, যা 'ইনায়াহ্ শরহে হিদায়াহ্, প্রণেতা মহোদয় দিয়েছেন। তা হচ্ছে সাইয়্যেদুনা আবূ মাহযূরাহ্র নিকট, কাফির থাকাবস্থায় তাওহীদ ও রিসালত অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিলো; আর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের প্রতি তাঁর জঘন্য বিরোধিতা ছিলো। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি লজ্জার কারণে 'আশহাদু আল্ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' ও 'আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' নিম্নস্বরে বলেছেন, উচ্চস্বরে বলেননি। তখন হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁকে পুনরায়

উচ্চস্বরে এ কলেমাগুলো বলার নির্দেশ দিয়েছেন। এ পুনরায় বলার নির্দেশ দেওয়া ও তা পালন করানো ওই সময়ে ছিলো শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাঁর লজ্জাবোধ দূর করার জন্য। সুতরাং এ হুকুম ছিলো সাময়িক। যেমন আজ যদি কোন ব্যক্তি নিম্নস্বরে আযান দিয়ে দেয়, তাহলে তা পুনরায় উচ্চস্বরে দেওয়ানো হয়। এমতাবস্থায় হযরত আবূ মাহযূরাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এ হাদীস আমাদের প্রথম পরিচ্ছেদের হাদীসগুলোর বিপরীত নয়।

সপ্তমত,

আমাদের জবাবও তাই, যা 'ফাত্হুল ক্বাদীর' প্রণেতা দিয়েছেন। তা হচ্ছে- হযরত আবূ মাহ্যূরাহ্ এ উভয় শাহাদত 'মাদ্দ' ছাড়া বলে ফেলেছিলেন। এ জন্য দ্বিতীয়বার মাদ্দ সহকারে বলিয়েছেন। মোটকথা, এ তারজী' একটা বিশেষ ঘটনা ছিলো, ইসলামী সুন্নাত ছিলোনা।

আপত্তি নং-২

সর্ব ইমাম আবূ দাউদ, নাসাঈ এবং দারেমী হযরত আবূ মাহযূরাহ থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّالنَّبِىِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةًوَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আযান ১৯ কলেমায় এবং তাকবীর ১৭ কলেমায় শিক্ষা দিয়েছেন।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, আযানের কলেমা ১৯টি। এটা তারজী' দ্বারাই পূরণ হয়। যদি আযানে তারজী' না হয়, তা হলে সর্বমোট ১৫ কলেমা হয়। সুতরাং আযানে তারজী' জরুরী।

খন্ডন

এর একাধিক জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস, হে আপত্তিকারীরা, আপনাদেরও বিপরীত। কেননা, যদি এ হাদীস দ্বারা আযানে তারজী' প্রমাণিত হয়, তাহলে এটা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, ইক্বামতের কলেমাগুলো দু' দু'বার বলা হবে। যদি আপনাদের মতো একেকবার হতো, তবে সেটার কলেমাগুলোর সংখ্যা সতের-এর পরিবর্তে তেরটি

হয়। আপনারা কি অর্দ্ধেক হাদীসের উপর ঈমান আনেন আর অর্দ্ধেককে অস্বীকার করেন?

আযানের তারজী'র ওইসব খন্ডন বা জবাব প্রযোজ্য, যেগুলো আপত্তি নং-১ এর খন্ডনে দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে এটাও রয়েছে যে, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম হযরত আবূ মাহযূরাকে তারজী'র শিক্ষা একটি বিশেষ কারণে দিয়েছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

আপত্তি নং-৩

ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ تَكَرُّوْا النَّارَ وَالنَّاقُوْسَ فَكَرُّوْاالْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى فَاُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يُّشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ

অর্থ: তিনি বলেন, সাহাবীগণ নামাযের ঘোষণার জন্য আগুন জ্বালানো ও ঘন্টা বা বাজানোর প্রস্তাব করেছিলেন। তখন ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কথাও উল্লেখ করেছেন।

অর্থাৎ তারাও এ জিনিষগুলো দ্বারা তাদের ইবাদতের ঘোষণা দেয়। তখন হযরত বেলালকে নির্দেশ দেওয়া হলো যেন আযান দু' দু'বার বলেন এবং ইক্বামত বলেন একেবার।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেলো যে, ইক্বামতের কলেমাগুলো একেকবার বলা হবে।

খন্ডন

এ আপত্তিরও কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. হে আপত্তিকারীরা! এ হাদীস আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, এটা থেকে বুঝা গেলো যে, ইক্বামতের সমস্ত কলেমা একেকবার হবে; কিন্তু আপনারা বলছেন, ইক্বামতে প্রথমে তাকবীর চারবার বলতে হবে, 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাত' দু' দুবার বলা হবে। তারপর তাকবীর দু' বার বলা হবে। সুতরাং যে জবাব আপনারা দেবেন, তা আমাদের জবাবও হবে। যদি বলেন, অন্যান্য হাদীসে 'ক্বাদ ক্বা-মাতিস্ সালাত' দু'বার বলার নির্দেশ দিয়েছেন, হানাফীরা বলবেন যে, অন্যান্য হাদীসে এটাও আছে যে, ইক্বামতের সমস্ত কলেমা দু' বার করে বলা হবে। ওই হাদীসগুলো কেন আমলযোগ্য হবে না?

দুই. এ হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দের স্বপ্নের কথার একেবার উল্লেখ নেই; বরং বলা হয়েছে যে, যখন সাহাবীগণ আগুন কিংবা ঘন্টা বাজানোর

মাধ্যমে নামাযের ঘোষণার পরামর্শ দিয়েছেন এবং কোন কোন সাহাবী বলেছেন, এতে তো ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য হয়, ইসলামী ঘোষণা এর বিরোধী হওয়া চাই, তখন তাৎক্ষণিকভাবেই হযরত বেলালকে আযান ও ইক্বামতের হুকুম দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আযান ও ইক্বামত মানে বর্তমানকার প্রচলিত শরীয়তসম্মত আযান নয়; বরং আভিধানিক আযান, অর্থাৎ নামাযের ঘোষণা বুঝানো হয়েছে, যা মহল্লায় গিয়ে দেওয়া হবে। আর ইক্বামত জমা'আতের সময় মসজিদে উপস্থিত মুসল্লীদের একত্রিত করার জন্য দেওয়া হয়, যাতে বলা হয়, 'এসে যাও, জমা'আত দন্ডায়মান হচ্ছে।' যেহেতু এ ঘোষণা একবার বলা যথেষ্ট ছিলো, সেহেতু একবারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্বপ্নের ঘটনা সংঘটিত হলো, যা দ্বারা প্রচলিত আযান ও ইক্বামত দাঁড় করানো হয়েছে, ওই ঘোষণাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

তিন. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দের স্বপ্নে ফেরেশতা ইক্বামতের যেই শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে ইক্বামতের শব্দগুলো দু' দু'বার রয়েছে। বস্তুত: ওই স্বপ্নই আযান ও ইক্বামতের মূল উৎস। সুতরাং ওই রেওয়াতই আমলের উপযোগী। অন্যান্য বর্ণনাগুলো, যেগুলো এর বিপরীত, সেগুলো ভিন্ন ব্যাখ্যার উপযোগী অথবা আমল করার উপযোগী নয়।

স্মর্তব্য যে, এ স্বপ্ন শুধু হযরত আবদুল্লাহ্র নয় বরং তিনি ব্যতীত আরো সাতজন সাহাবী এ স্বপ্ন দেখেছেন। এ হাদীস শরীফ যেন 'মুতাওয়াতির' হিসেবে বিবেচ্য হয়ে গেছে।

চার. রেওয়ায়তগুলো এ কথায় একমত যে, হযরত বেলাল ও হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম আযানে তারজী' নিজের জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত করেননি। [মিরক্বাত শরহে মিশকাত দেখুন]

তাছাড়া, ওইসব বুযুর্গের ইক্বামতে ইক্বামতের কলেমাগুলো দু' দু' বার ছিলো। সুতরাং এটা কীভাবে হতে পারে যে, হযরত বেলালের মতো প্রসিদ্ধ মু'আয্যিন এবং হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম তাঁদের গোটা জীবন এবং আযানে তারজী' করেছেন তাক্বীরের কলেমাগুলো একেকবার বলেছেন? অথচ হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামই এ হুকুম দিয়েছেন! সুতরাং তারজী' ইত্যাদির সমস্ত রেওয়ায়ত ভিন্ন ব্যাখ্যার উপযোগী।

পাঁচ. এ রেওয়ায়ত গুলো 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ'র বিপরীত। আর আমার উপস্থাপিত হাদীসগুলো ক্বিয়াসের অনুরূপ। সুতরাং সেগুলোই প্রাধান্য পাবে। যখন

হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, তখন ক্বিয়াস দ্বারা একটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। দেখুন, হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন, اَلْوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ অর্থাৎ আগুনে রান্নাকৃত জিনিষ আহার করলে ওযূ ওয়াজিব হয়। অন্য রেওয়ায়তে এসেছে- হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম গোশ্ত খেয়ে নামায পড়েছেন; ওযূ করেননি। সুতরাং এ উভয় হাদীসের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ছিলো। সুতরাং ক্বিয়াসের কারণে বা মাধ্যমে দ্বিতীয় হাদীসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখন কেউ বলে না যে, খানা খেলে ওযূ ভেঙ্গে যায়। এটা 'ক্বানূনে কুল্লী' (সাধারণ নিয়ম)।

---o---

একবিংশতিতম অধ্যায়

[নফল নামায সম্পন্নকারীর পেছনে ফরয নামায হয় না]

নফল নামায সম্পন্নকারীর পেছনে ফরয নামায হয় না

শরীয়তের মাসআলা হচ্ছে- নফল নামায সম্পন্নকারীর পেছনে ফরয নামায আদায় হয় না। অবশ্য ফরয সম্পন্নকারীর পেছনে নফল নামায হয়ে যায়। ফরয নামাযে এটাও জরুরী যেন ইমামও ফরয সম্পন্নকারী হবেন। একথাও আবশ্যক যে, ইমাম ও মুক্বতাদী উভয়ে একই নামায পড়ছেন এমন হওয়া। যেমন- যোহরের নামায সম্পন্নকারী আসরের নামায সম্পন্নকারীর পেছনে নামায পড়তে পারে না; কিন্তু গায়র-মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) ওহাবীরা বলে বেড়ায় ফরয নামায নফল নামায সম্পন্নকারীর পেছনে পড়া জায়েয।

জরুরী নোট.

বালেগ মুসলমানের কোন নামায না-বালেগের পেছনে জায়েয নয়; না ফরয, না তারাবীহ্, না নফল। কেননা, না বালেগের উপর নামায ফরয নয়, নিছক নফল। আর না বালেগ নফল নামায শুরু করার পরও নফলই থেকে যায়। যদি ছোট ছেলে নামায শুরু করে ভঙ্গ করে ফেলে, তাহলে তার উপর সেটার ক্বাযা করা জরুরী নয়; কিন্তু বালেগ নফল আরম্ভ করলে একথা জরুরী হয়ে যায় যে, যদি সে ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে ক্বাযা ওয়াজিব হয়ে যায়। এ কারণে বালেগ কোন নামায না-বালেগের পেছনে পড়তে পারে না; কিন্তু গায়র-মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের মতে, এসব কিছু জায়েয। এ কারণে আমি এ অধ্যায়েরও দু'টি পরিচ্ছেদ করেছি, প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলার পক্ষে প্রমাণ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর বিপক্ষে কৃত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন উল্লেখ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ফরয নামায নফল নামায সম্পন্নকারীর পেছনে সম্পন্ন করা যেতে পারে না। এর পক্ষে অনেক হাদীস শরীফ ও ক্বিয়াস-ই শর'ঈ সাক্ষী হিসেবে রয়েছে। ওইগুলো থেকে কিছুটা পেশ করা হচ্ছে-

হাদীস নং ১ থেকে ৪ পর্যন্ত

সর্বইমাম তিরমিযী, আহমদ, আবূ দাঊদ (শাফে'ঈ) ও মিশকাত প্রণেতা মহোদয় আযানের বিবরণ শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ

অর্থ: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইমাম হলো যামিন আর মুআয্যিন হলো আমীন। হে আল্লাহ্, ইমামদেরকে হিদায়ত দাও এবং মুআয্যিনদেরকে ক্ষমা করো।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, ইমাম সমস্ত মুক্বতাদীর নামাযগুলোকে নিজের নামাযের অধীনে নিয়ে নেন। প্রকাশ থাকে যে, উন্নততর জিনিষ সেটার নিম্নতর জিনিষকে নিজের অধীনে নিতে পারে; নিম্নতর জিনিষ এমনটি করতে পারে না; অর্থাৎ সেটার উর্ধ্বতন জিনিষকে শামিল করে নিতে পারে না। ফরয নফলকে নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে পারে, কারণ তা নফল অপেক্ষা উত্তম। কিন্তু নফল ফরযকে নিজের অধীনে নিতে পারে না; কারণ তা ফরয অপেক্ষা নিম্নতর পর্যায়ের। অনুরূপ, প্রত্যেক ফরয নামায সেটার মত ফরযকে সেটার অধীনে নিতে পারে, অন্য ফরযকে পারে না। সুতরাং যদি ইমাম আসরের নামায পড়তে থাকেন, তবে তাঁর পেছনে (ইক্বতিদায়) যোহরের ক্বাযা পড়া যেতে পারে না। কেননা, আসরের নামায যোহরের নামাযকে নিজের অধীনে নিতে পারে না। কারণ, এ দু'টি নামায পরস্পর ভিন্ন।

হাদীস নং- ৫

ইমাম আহমদ হযরত সুলায়ম সালমা থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّهُ اَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَأْتِيْنَا بَعْدَ مَا نَنَامُ وَنَكُوْنُ فِىْ اَعْمَالِنَا بِالنَّهَارِ فَيُنَادِىْ بِالصَّلوٰةِ فَنَخْرُجُ اِلَيْهِ فَيُطَوِّلُ عَلَيْنَا فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا مُعَاذُ لَا تَكُنْ فَتَّانًا اِمَّا اَنْ تُصَلِّىَ مَعِىَ وَاِمَّا اَنْ تُخَفِّفَ عَلٰى قَوْمِكَ

অর্থঃ হযরত সুলায়ম হুযূর নবী-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হাযির হলেন। আর আরয করলেন, "হে আল্লাহর রসূল, হযরত মু'আয ইবনে জবল আমাদের নিকট আমরা শয়ন করার পর আসেন। আমরা দিনের বেলায় আমাদের কাজ কারবার নিয়ে মশগূল থাকি। তারপর নামাযের আযান দেয়। আমরা বের হয়ে তাঁর নিকট আসি। তিনি নামায খুব দীর্ঘায়িত করে পড়ান।" তখন তাঁকে হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করলেন, "হে মু'আয্ ফিৎনার কারণ হয়ো না। হয়তো আমার সাথে নামায পড়ে নাও, অথবা নিজের সম্প্রদায়কে হাল্কাভাবে নামায পড়াও।

স্মর্তব্য যে, হযরত মু'আয ইবনে জবল এশার নামায হুযূর-ই আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে পড়ে নিজে সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌঁছে তাঁদেরকে নামায পড়াতেন এবং খুব লম্বা করে পড়াতেন; যার অভিযোগ নবী করীমের দরবারে করা হয়েছে, যার ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

বুঝা গেলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত মু'আয ইবনে জবলকে এর অনুমতি দেননি যে, হুযূরের সাথে নামায পড়ে আপন সম্প্রদায়কে পড়াবেন। কেননা, নফল সম্পন্নকারীর পেছনে ফরয নামায জায়েয নয়; বরং বলেছেন, হয়তো আমার পেছনে পড়ো, তাহলে সম্প্রদায়কে পড়াবে না; অথবা সম্প্রদায়কে পড়াও, তখন আমার পেছনে পড়োনা।

হাদীস নং- ৬.

ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত হাম্মাদ থেকে তিনি হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اِذَا دَخَلْتَ فِىْ هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَاَنْتَ لَا تَدْرِىْ صَلٰوتَهُمْ لَا تُجْزِكَ وَاِنْ صَلّٰى الْاِمَامُ صَلٰوتَه وَنَوَالَّذِىْ خَلْفَه غَيْرَهَاجْزَأَتِ الْاِمَامَ وَلَمْ تُجْزِهُمْ - [رَوَاهُ الْاِمَامُ مُحَمَّدٌفِىْ الْاٰثَار]

অর্থঃ তিনি বলেন, যখন তুমি সম্প্রদায়ের নামাযে (জমা'আতে) শামিল হও, আর তুমি তাদের নামাযের নিয়্যৎ না করো, তখন তোমার জন্য এ নামায যথেষ্ট নয়। আর যদি ইমাম এক নামায পড়েন, আর পেছনের মুক্বতাদী অন্য কোন নামাযের নিয়্যৎ করে, তখন ইমামের নামায তো হয়ে যাবে, কিন্তু পেছনের লোকদের নামায হবে না।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মিল্লাতের আলিমদেরও এ অভিমত যে, নফল নামায সম্পন্নকারীর পেছনে নামায পড়তে পারে না, অনুরূপ এক ফরযের পেছনে অপর ফরয আদায় হতে পারে না।

যুক্তির দাবীও এযে, নফল সম্পন্নকারীর পেছনে ফরয আদায় হবে না। কেননা, ইমাম হলেন পেশোয়া। আর মুক্বতাদী তাঁর তাঁবেদার। ইমামের নামায হলো মূল। মুক্বতাদীর নামায তার শাখা। এ জন্য ইমামের সাহ্‌ভ হলে মুক্বতাদীর উপরও সাজদা-ই সাহ্‌ভ ওয়াজিব হয়ে যায়; কিন্তু মুক্বতাদীর সাহ্‌ভ হলে না ইমামের উপর সাজদাহ্-ই সাহ্‌ভ ওয়াজিব, না খোদ্ ওই মুক্বতাদীর উপর। ইমামের ক্বিরাআত মুক্বতাদীর জন্য যথেষ্ট, কিন্তু মুক্বতাদীর ক্বিরাআত ইমামের জন্য যথেষ্ট নয়। হানাফীদের মতে তো নিঃশর্তভাবে, ওহাবীদের মতে 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে। যদি ইমাম ওযূ ছাড়া নামায পড়ায় তবে, মুক্বতাদীর নামাযও হবে না। কিন্তু যদি মুক্বতাদী বে-ওযূ পড়ে নেয়; তবে ইমামের সাথে শুদ্ধ হবে। ইমাম সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে মুক্বতাদীর উপর সাজদাহ-ই তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে। মুক্বতাদী তা শুনুক, কিংবা না-ই শুনুক। কিন্তু যদি মুক্বতাদী ইমামের পেছনে সাজদার আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে না ইমামের উপর সাজদা-ই তিলাওয়াত ওয়াজিব, না খোদ্ ওই মুক্বতাদীর উপর। যদি ইমাম মুক্বীম হন, আর মুক্বতাদী হয় মুসাফির, তবে মুক্বতাদীকে পূর্ণ নামায পড়তে হবে; কিন্তু যদি ইমাম মুসাফির হন আর মুক্বতাদী মুক্বীম হয়, তবে ইমাম পূর্ণ নামায পড়বেন না; বরং ক্বসর করবেন। এ ধরনের অনেক মাসআলা আছে, যেগুলো থেকে বুঝা যায় যে, খোদ্ মুক্বতাদী ও তার নামায অনুগামী আর ইমাম ও ইমামের নামায মূল ও অনুকরণীয়। অনুকরণীয় অনুগামী অপেক্ষা উত্তম হবে অথবা সমপর্যায়ের। নফল নামায ফরয নামাযের চেয়ে কম মর্যাদার। সুতরাং উচিৎ হবে নফলের পেছনে ফরয আদায় (সম্পন্ন) না হওয়া, যাতে উঁচুতর ও শ্রেষ্ঠতর নিম্নতরের অনুগামী না হয়ে যায়। অনুরূপ এক ফরয অন্য ফরযের পেছনে শুদ্ধ হতে পারে না। কেননা এক প্রকার অন্য প্রকারের অনুগামী হতে পারে না। যখন ঈদের নামায পড়াচ্ছেন এমন ইমামের পেছনে ফজরের নামায শুদ্ধ হতে পারে না, তখন মাগরিব পড়াচ্ছেন এমন ইমামের পেছনে বিতরের নামায শুদ্ধ হতে পারে না। অনুরূপ, যোহর পড়াচ্ছেন এমন ইমামের পেছনে এশার নামাযের ক্বাযাও সম্পন্ন করা যাবে না। মোটকথা, জরুরী হচ্ছে- হয়তো ইমাম ও মুক্বতাদীর নামায এক হবে, অথবা মুক্বতাদীর নামায ইমামের নামাযের কম পর্যায়ের হবে। অর্থাৎ ইমাম ফরয পড়াবেন। (আর মুক্বতাদী নফল পড়তে পারবে।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন

আমি এখানে গায়র-মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের দিক থেকে কৃত আপত্তিগুলোও আরয করছি। ওইগুলো তারা করে থাকে। আর এমন কিছু প্রশ্নও উল্লেখ করছি, যেগুলো সম্পর্কে তারা এখনো চিন্তা-ভাবনাও করতে পারে নি। আর ওইগুলোর জবাবও দিয়ে দিচ্ছি-

আপত্তি নং-১.

আম মুহাদ্দিসগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, মি'রাজ রাতে পঞ্জেগানা নামায ফরয হয়েছে, এরপর দু' দিন যাবৎ হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম হুযূর-ই আক্রামকে পাঁচ ওয়াক্বতের নামায পড়িয়েছেন; প্রথম দিনে প্রত্যেক নামায ওয়াক্বতের প্রারম্ভে আর দ্বিতীয় দিনে ওয়াক্বতের শেষভাগে। আর এরপরে আরয করেছেন যে, হুযূর ওই ওয়াক্বতগুলোর মধ্যভাগে ওই নামাযগুলোর ওয়াক্বত। দেখুন, হুযূর-ই আক্রামের উপর এ নামাযগুলো ফরয ছিলো; আর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য নফল। কেননা, পাঁচ ওয়াক্বতের নামায ফেরেশতাদের উপর ফরয নয়; কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম ইমাম। আর হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম মুক্তাদী। বুঝা গেলো যে, নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয নামায দুরস্ত আছে; বরং ইসলামে প্রথম নামায এমনিভাবেই হয়েছে। অর্থাৎ নফলের পেছনে ফরয। আর এ কাজ নবী করীমের সুন্নাতও হযরত জিব্রাঈলের সুন্নাতও।

খন্ডন

এর দু'টি জবাব হতে পারে-

প্রথমত, বলুন, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম এ নামাযগুলো পড়ানোর জন্য কি মহান রবের হুকুমে এসেছিলেন, না নিজের তরফ থেকে এসে গিয়েছিলেন, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত? দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা তো হতেই পারে না, কেননা, হযরত জিব্রাঈল আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কখনো আসতেন না। মহান রব এরশাদ করছেন-وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ

অর্থ: আমরা (ফেরেশতারা) মহান রবের হুকুম ব্যতীত অবতীর্ণ হই না।

সুতরাং একথা মানতে হবে যে, তিনি (হযরত জিব্রাঈল) মহান রবের হুকুমে এসেছেন। যখন হযরত জিব্রাঈলকে মহান রব এ নামাযগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তো তাঁর উপর ওইগুলো ফরয হয়ে গিয়েছিলো। মহান রবের হুকুমই তো কোন কাজকে ফরয করে থাকে। সুতরাং এ নামাযগুলোতে নফলের পেছনে ফরয পড়া হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ওই দু' দিনে না হুযূরের উপর এ নামাযগুলো ফরয ছিলো, না সাহাবীদের উপর; কেননা, যদিও মি'রাজের রাতে নামাযগুলো ফরয করা হয়েছিলো; কিন্তু তখনো তাঁদেরকে আদায় করার তরীক্বা এবং ওয়াক্বতের শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কানূন ব্যাখ্যা করার পূর্বে কাজে পরিণত করা ওয়াজিব হয় না। এ কারণে সমস্ত মুসলমান না হযরত জিব্রাঈলের পেছনে এ নামাযগুলো পড়েছেন, না এ দু'দিনের নামাযগুলো ক্বাযা করেছেন। সুতরাং হুযূর-ই আক্রাম হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর পেছনে নফল পড়েছেন। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, আপনাদের আপত্তি শিখড় থেকেই উপড়ে পড়েছে।

আপত্তি নং-২.

ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأْتِىْ قَوْمَه فَيُصَلِّىْ بِهِمْ

অর্থ: তিনি বলেন, হযরত মু'আয ইবনে জবল হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায পড়তেন, তারপর নিজের সম্প্রদায়ের নিকট আসতেন এবং তাদেরকে নামায পড়াতেন।

দেখুন, হযরত মু'আয এশার ফরয হুযূর-ই আক্রামের পেছনে পড়ে নিতেন। তারপর আপন সম্প্রদায়ে এসে পড়াতেন। তাঁর নামায নফল ছিলো, আর সমস্ত মুক্তাদীর নামায ফরয। বুঝা গেলো যে, নফল সম্পন্নকারীদের পেছনে ফরয নামায পড়া সাহাবীদের সুন্নাত।

খন্ডন : এ আপত্তিরও কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. হতে পারে হযরত মু'আয ইবনে জবল হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে নফল পড়তেন আর সম্প্রদায়ের সাথে ফরয পড়তেন। হযরত মু'আয একথা কোথাও বলেননি যে, আমি হুযূরের পেছনে ফরয পড়ে

নিই। আর মুক্বতাদীদের আগে নফলের নিয়্যত করে দাঁড়াই। সুতরাং হে আপত্তিকারীরা! আপনাদের জন্য এ হাদীস মোটেই উপকারী নয়।

দুই. এ হাদীস শরীফে একথা আসেনি যে, হযরত মু'আয এ কাজ হুযূর-ই আক্রামের অনুমতিক্রমে করেছেন, যাতে হুযূর একথা এরশাদ করেছেন- তুমি ফরয আমার পেছনে পড়ে নাও, আর নফল মুক্বতাদীদের সাথে। এটা হযরত মু'আয ইবনে জবলের ইজতিহাদ ছিলো; যা বাস্তবিকপক্ষে সঠিক ছিলোনা। একাধিকবার সাহাবা-ই কেরাম দ্বারা ইজতিহাদী ভুল-ত্রুটি সম্পন্ন হয়েছে।

তিন. আমি প্রথম পরিচ্ছেদে হাদীস পেশ করেছি যে, যখন হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্রতম দরবারে হযরত মু'আযের এ আমল সম্পর্কে খবর দেওয়া হলো, তখন হুযূর-ই আক্রাম তা করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। আর নির্দেশ দিলেন হয়তো আমার সাথে নামায পড়ো, অথবা মুক্তাদীদেরকে হালকা করে নামায পড়াও। বুঝা গেলো যে, হযরত মু'আযের এ ইজতিহাদ নবী করীমের সুন্নাতের পরিপন্থী হবার কারণে আমল করার উপযোগী নয়।

আপত্তি নং-৩.

ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম বোখারী এ-ই হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে হযরত মু'আযের এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ

قَالَ كَانَ مُعَاذٌيُصَلِّىْ مَعَالنَّبِىِّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ اَلْعِشَآءَثُمَّ يَرْجِعُ اِلى قَوْمِه فَيُصَلِّىْ بِهِمُ الْعِشَآءَ وَهِىَ لَهُفَافِلَةٌ

অর্থ: তিনি বলেন, হযরত মু'আয হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এশার নামায পড়ে নিতেন। তারপর সম্প্রদায়ের দিকে ফিরে যেতেন। তখন তাদরেকে এশার নামায পড়াতেন। এ নামায তাঁর জন্য নফল ছিলো।

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেলো যে, হযরত মু'আয ইবনে জবল হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নফল পড়তেন না বরং ফরযই পড়তেন। আর মুক্বতাদীদের সামনে নফল নামায সম্পন্ন করতেন; সুতরাং এ কথা বলা যেতে পারে না যে, তিনি হুযূর-ই আক্রামের পেছনে নফল এবং মুক্বতাদীদের সাথে ফরয পড়তেন।

খন্ডন

হে আপত্তিকারী, আপনার উপস্থাপিত হাদীস হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত মু'আযের এ ঘটনা উদ্ধৃত করে নিজের ভঙ্গিতে

ও অনুমানের নিরীখে বলছেন যে, তিনি হুযূরের সাথে ফরয পড়তেন। তাতে একথা নেই যে, হযরত মু'আয নিজের নিয়্যত ও ইচ্ছা সম্পর্কে বলেছেন। অন্যের নিয়্যৎ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া নিশ্চয়তার সাথে বলা যায় না। আর না তাতে একথা আছে যে, তাঁকে হুযূরের অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীস কোন মতেই আপনার পক্ষে দলীল হতে পারে না।

আপত্তি নং-৪.

বোখারী শরীফে হযরত আমর ইবনে সালমাহ্ থেকে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, ''আমাদের সম্প্রদায় একটা ঘাঁটি তথা উপত্যকায় অবস্থান করে, যাকে বিভিন্ন কাফেলা অতিক্রম করতো। আমি হেজাযী কাফেলাগুলো থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থাদি এবং ক্বোরআনের আয়াতগুলো জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতাম। মক্কা বিজয়ের পর আমার পিতা মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হয়ে আপন সম্প্রদায়ের তরফ থেকে ইসলাম গ্রহণ করেন। ওখান থেকে নামাযের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। তাঁকে হুযূর-ই আক্রাম বলেছেন, ''যে কেউ আযান দিয়ে দিতে পারবে; কিন্তু নামায সে-ই পড়াবে, যার ক্বোরআন বেশী মুখস্থ আছে।'' যখন তিনি ফিরে আসলেন, তখন তিনি জানতে পারলেন যে, সবার চেয়ে ক্বোরআন আমার বেশী মুখস্থ আছে। তিনি আমাকে ইমাম বানিয়ে দিলেন। তখন আমার বয়স মাত্র ছয়/সাত বছর ছিলো। আমি লোকজনকে নামায পড়াতাম। হাদীসের শেষ ভাগের বচনগুলো নিম্নরূপঃ

فَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ كُنْتَ اِذَا سَجَدْتُّ قَلَصَتْ عَنِّىْ فَقَالَتْ اِمْرَاَةٌ مِّنَ الْحَىِّ اَلَا تُغَطُّوْنَ عَنَّا اِسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوْا لِىْ قَمِيْصًا

অর্থ: আমার উপর একটা চাদর থাকতো। যখন আমি সাজদাহ্ করতাম, তখন (আমার সতর) খুলে যেতো। তখন গোত্রের এক মহিলা বললেন, ''তোমাদের ক্বারী সাহেবের নিতম্ব কেন ঢাকছোনা?'' অতঃপর লোকেরা আমার জন্য কাপড় কিনে কামীজ সেলাই করিয়ে দিলেন।

দেখুন, আমর ইবনে সালমাহ্ হলেন সাহাবী। আর সমস্ত সাহাবী তার পেছনে ফরয নামায পড়তেন। তখন আমর ইবনে সালমাহ্র বয়স শরীফ ছিলো ছয় বছর। তাঁর উপর কোন নামায ফরয নয়। নাবালেগ ছেলেদের নফলও খুবই নিম্ন পর্যায়ের হয়; কিন্তু যুবক ও বয়োপ্রাপ্ত লোকেরা তার পেছনে ফরয আদায় করেন। বুঝা গেলো যে, নফল সম্পন্নকারীর পেছনে ফরয আদায় হয়ে যায়।

খন্ডন

এর ওই জবাবগুলোই প্রযোজ্য, যেগুলো আপত্তি নং- ২ এর জবাবে দেওয়া হয়েছে। তা হচ্ছে- তাঁর এ আমল তাঁর নিজস্ব অভিমতানুসারে ছিলো; হুযূর-ই আক্রামের নির্দেশ কিংবা অনুমতিক্রমে ছিলোনা। যেহেতু এ হযরতগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন বেশি দিন হয়নি, শরীয়তের মাসআলাগুলো তাঁদের জানা ছিলোনা, সেহেতু অজানাবশত এমনটি করেছেন, যদি হে আপত্তিকারী, আপনি এ হাদীস থেকে এ মাসআলা প্রতিষ্ঠা করেন, তা হলে একথাও মেনে নিন যে, উলঙ্গ ইমামের পেছনেও নামায জাযেয, কেননা আমর ইবনে সালমাহ্ নিজে বর্ণনা করছেন, ''আমার কাপড় এতো ছোট ছিলো যে, সাজদাকালে কাপড় সরে যেতো এবং নিতম্বগুলো বস্ত্রহীন হয়ে যেতো। এতদ্সত্ত্বেও এসব হযরত নামায পড়তে থাকতেন। কেউ নামায পুনরায় পড়েননি। কেন? শরীয়তের মাসআলাগুলো জানা না থাকার কারণে। আফসোস! আপনারা চোখ বন্ধ করে হাদীস পড়তে থাকেন!

এ সমস্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেলো যে, এ মাসআলা সম্পর্কে ওহাবী, লা-মাযহাবীদের নিকট সুস্পষ্ট মারফূ' হাদীস মওজূদ নেই, না বাণীগত হাদীস, না কর্মগত হাদীস। এমনিতেই কয়েকটা সন্দেহের ভিত্তিতে এ মাসআলার পেছনে পড়ে গেছে। আর ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে, অনর্থক শত্রুতার কারণে, অশালীন সমালোচনা করে থাকে। আর তাঁর দরবারে বিভিন্ন বেয়াদবী ও গালিগালাজ পর্যন্ত করে বসছে।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়

[রক্ত ও বমির কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়]

রক্ত ও বমির কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়

শরীয়তের মাসআলা হচ্ছে এ যে, আটটি জিনিষ ওযূ ভঙ্গ করে দেয় । সেগুলো হচ্ছে- যে জিনিষ প্রস্রাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে বের হয়, অলসতার নিদ্রা, বেহুঁশ হওয়া, নেশা, উম্মাদনা, নামাযে অট্টহাসি দেওয়া, প্রবহমান রক্ত এবং মুখভর্তি বমি । এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ ফিক্বহ্ শাস্ত্রের কিতাবাদিতে দেখুন । কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) সম্প্রদায়ের মতে, না প্রবহমান রক্ত ওযূ ভঙ্গ করে, না মুখভর্তি বমি । সুতরাং কোন হানাফী যেন কোন গায়র-মুক্বাল্লিদ লা-মাযহাবীর পেছনে নামায না পড়ে । কেননা, এসব লোকের আক্বীদাও ভ্রান্ত এবং তাঁদের ওযূরও নির্ভরযোগ্যতা নেই । কে জানে, বমি করে কিংবা নাক দিয়ে রক্ত ঝরা ইত্যাদি সত্ত্বেও (নামায পড়তে) এসেছে আর ওযূ না করেই মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে গেছে কিনা । যেহেতু গায়র মুক্বাল্লিদগণ এ মাসআলায়ও খুব শোর-চিৎকার করে, সেহেতু আমি এ মাসআলা দু'টি পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি প্রথম পরিচ্ছেদে এর পক্ষে প্রমাণাদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে সেটার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ, সেগুলোর খন্ডন সহকারে । মহান রব কবূল করুন!

প্রথম পরিচ্ছেদ

হানাফীদের মতে মুখভর্তি বমি এবং শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে দেহের উপরিভাগে প্রবাহিত হয়ে পৌঁছে যাওয়া ওযূ ভঙ্গ করে দেয় । দেহের উপরিভাগ হচ্ছে, তাই যা ধৌত করা ফরয । দলীলাদি নিম্নরূপঃ

দলীল নং-১

দার-ই কুত্বনী হযরত তামীম-ই দারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْوَضُوْءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ওযূ ওয়াজিব প্রতিটি প্রবহমান রক্তের কারণে ।

দলীল নং-২

ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَصَابَهُ قَيْءٌ اَوْ رُعَافٌ اَوْقَلْسٌ اَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার বমি কিংবা নাকে রক্ত অথবা মযী এসে যায়, তবে সে যেন নামায থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং ওযূ করে ।

দলীল নং-৩.

ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে হযরত ফাত্বিমা বিনতে আবূ জায়শ হাযির হয়ে আরয করতে থাকেন, "আমার 'ইস্তিহাযাহ্' রোগের কারণে রক্ত এত বেশি প্রবাহিত হয় যে, আমি কখনো পাক হতে পারিনা । আমি কি নামায ছেড়ে দেবো?" তিনি বললেন, "এটা হায়য নয়, রগের রক্ত ।" সুতরাং

اِجْتَنِبِى الصَّلٰوةَ اَيَّامَ مَحِيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ وَتَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَاِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ -

অর্থ: হায়যের সময় সীমার মধ্যে নামায থেকে বিরত থাকো, তারপর গোসল করো এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য ওযূ করো, তারপর নামায পড়ো যদিও রক্ত চাটাইর উপর টপকে পড়তে থাকে ।

এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, ইস্তিহাযাহ্ (রোগ)-এর খুন ওযূ ভঙ্গ করে দেয়, অন্যথায় হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ওই বিবি সাহেবার উপর ওযর সম্পন্নের বিধানাবলী জারী করতেন না এবং প্রত্যেক নামাযের সময় তাঁর উপর ওযূ অপরিহার্য করে দিতেন না । দেখুন, যার অনবরত বায়ু ও প্রস্রাবের ফোঁটা বের হবার রোগ আছে, সে প্রত্যেক নামাযের সময় একটি ওযূ করে নামায পড়তে থাকবে; কেননা, বায়ু ও প্রস্রাব ওযূ ভঙ্গকারী বস্তু ।

দলীল নং-৪.

ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاءَ اَوْ رَعُفَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيَبْنِ عَلٰى صَلٰوتِهٖ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ

অর্থ: তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন, যার নামাযে বমি অথবা নাকে রক্ত এসে যায়, সে যেন নামায থেকে পৃথক হয়ে যায়; তারপর ওযূ করে নেয় এবং ইতোপূর্বে যতটুকু নামায পড়েছে সেটার উপর ভিত্তি করে বাকী নামায পড়ে নেয়; যতক্ষণ না কথা বলে ফেলে ।

দলীল নং ৫ ও ৬.

ইমাম তিরমিযী ও আবূ দা'ঊদ হযরত ত্বাল্ক্ব ইবনে আলীর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اَعْرَابِىٌّ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلرَّجُلُ مِنَّا يَكُوْنُ فِىْ الْفَلَاةِ فَتَكُوْنُ مِنْهُ رُوَيْحَةٌ وَيَكُوْنُ فِى الْمَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ مُلَخَّصًا

অর্থ: এক গ্রাম্য লোক আরয করলো, "হে আল্লাহর রসূল, আমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি মরুভূমিতে থাকে, তার বায়ু বের হয়ে যায়। আর পানির ব্যাপারে থাকে স্বল্পতা।" তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ বমি করে, তখন সে যেন ওযূ করে নেয়। (সংক্ষেপিত)

এমনটি রয়েছে 'জামে'উল উসূল'-এ 'জম'উল ফাওয়া-ইদ'-এ এবং 'মাজমা'উয্ যাওয়া-ইদ'-এ।

দলীল নং-৭.

ইমাম তিরমিযী হযরত আবুদ্ দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَتَوَضَّأَ فَلَقِيْتُ ثَوْبَانَ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ صَدَقَ اَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوْءَهُ وَحَدِيْثُ حُسَيْنٍ اَصَحُّ شَيْئٍ فِىْ هٰذَا الْبَابِ

অর্থ: একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বমি এসেছিলো। তারপর তিনি ওযূ করেছেন। তারপর আমি দামেস্কের মসজিদে হযরত সাওবানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তিনি হযরত আবুদ্ দারদার এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আবুদ্ দারদা সত্য বলেছে। পানি আমিই ঢেলেছিলাম।" অর্থাৎ আমিই ওযূ করাচ্ছিলাম। হোসাঈনের এ হাদীস অতিমাত্রায় বিশুদ্ধ এ অধ্যায়ে।

দলীল নং-৮.

ইমাম ত্বাবরানী তাঁর 'কবীর'-এ হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেন-

رَفَعَه قَالَ اِذَا رَعُفَ اَحَدُكُمْ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ لِيُعِدْ وُضُوْءَهُ

অর্থ: তিনি সরাসরি হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরাতে (مَرْفُوْعًا) বলেন, যখন তোমাদের মধ্যে কারো নামাযে নাক থেকে রক্ত ঝরে যায়, তখন সে যেন (নামায থেকে) আলাদা হয়ে যায়, আর রক্ত ধুয়ে নেয়, তারপর পুনরায় ওযূ করে।

দলীল নং-৯.

দারু কুত্বনী হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَاءَ اَحَدُكُمْ اَوْ رَعُفَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اَوْ اَحْدَثَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমাদের মধ্যে কারো নামাযে বমি অথবা নাক থেকে রক্ত ঝরে পড়ে অথবা কারো ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তখন সে যেন নামায থেকে আলাদা হয়ে যায় আর ওযূ করে নেয়।

দলীল নং-১০.

ইবনে আবী শায়বাহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ مَنْ رَعُفَ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ فَاِنْ لَّمْ يَتَكَلَّمْ بَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهٖ وَاِنْ تَكَلَّمَ اسْتَأْنَفَ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার নামাযে নাক থেকে রক্ত বের হয়ে যায়, সে যেন (নামায থেকে) আলাদা হয়ে যায় এবং ওযূ করে, তারপর যদি কথাবার্তা না বলে, তাহলে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করবে, আর যদি কথাবার্তা বলে ফেলে, তবে শুরু থেকে পুনরায় পড়ে নেবে।

দলীল নং- ১১.

ইমাম মালিক হযরত ইয়াযীদ ইবনে ক্বিস্ত্ব লায়সী থেকে বর্ণনা করেন-

اِنَّه رَأٰى سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ رَعُفَ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَاَتٰى حُجْرَةَ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُتِىَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنٰى عَلٰى مَا قَدْ صَلّٰى

অর্থ: তিনি হযরত সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবকে দেখলেন যে, তাঁর নাক থেকে নামাযের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। তখন তিনি হযরত উম্মে সালামাহ্, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র বিবির ঘরে আসলেন। অতঃপর তাঁকে পানি দেওয়া হলো। তিনি ওযূ করলেন, তারপর ফিরে গেলেন এবং অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করলেন।

দলীল নং-১২.

ইমাম আবূ দাঊদ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَحْدَثَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيَأْخُذْ بِاَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ (مشكوة مايجوز من العمل)

অর্থঃ তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন নামাযে কারো ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়, তখন সে যেন তার নাক চেপে ধরে তারপর চলে যায়। [মিশকাত, মা-ইয়াজুয মিনাল আমল]

এ হাদীস শরীফে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযীকে তাদবীর এটা বলেছেন যে, যদি নামাযে কারো বায়ু বের হয়ে যায়, তখন সে নিজের লজ্জা ঢাকার জন্য নাকের উপর হাত রেখে দেবে, যাতে লোকেরা মনে করে যে, তার নাকের বাঁশী ফুটু হয়ে গেছে। তারপর মসজিদ থেকে বের হয়ে ওযূর স্থানে গিয়ে ওযূ করে নেবে। যদি নাক থেকে রক্ত বের হলে ওযূ না ভাঙ্গতো, তাহলে এ তাদবীর অকেজো হতো।

আমি নমুনা স্বরূপ বারটি হাদীস পেশ করলাম। অন্যথায় এ সম্পর্কে বহু হাদীস মওজূদ আছে। যদি আগ্রহ থাকে, তবে 'সহীহুল বিহারী' শরীফ পাঠ-পর্যালোচনা করুন।

বিবেক বা যুক্তির দাবীও হচ্ছে প্রবাহিত রক্ত ও মুখভর্তি বমি ওযূ ভঙ্গ করে, কেননা, ওযূ হচ্ছে পবিত্রতা। নাপাকী বের হলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়া চাই। এ কারণে, প্রস্রাব, পায়খানা ও বায়ু বের হবার কারণে ওযূ চলে যায়। প্রবহমান রক্ত, মুখ ভর্তি বমি, নাপাক, ক্বোরআন-ই করীম এরশাদ হচ্ছে- اَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا (অথবা প্রবাহিত রক্ত)। এ কারণেই প্রবহমান রক্ত বিশিষ্ট পশু যবেহ্ করলে হালাল হয়ে যায়, যাতে আল্লাহর নামের উপর ভিত্তি করে নাপাক রক্ত বের হয়ে যায়। সুতরাং যেমন প্রস্রাব, পায়খানা ও বায়ু বের হওয়ার কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। কেন? এ জন্য যে, নাপাক জিনিষ বের হয়েছে। তেমনি প্রবাহিত রক্ত ও বমি বের হলেও ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাওয়া চাই। কেননা, এগুলোও নাপাক, যেগুলো শরীর থেকে বের হয়েছে।

অনুরূপ, ইস্তিহাযা ও অর্শ্বরোগের রক্ত দ্বারা এবং পুরুষের প্রস্রাবের জায়গা থেকে রক্ত বের হলে সর্বসম্মতিক্রমে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। 'ইস্তিহাযা'র রক্ত সম্পর্কে তো 'হাদীস-ই মারফূ'ও বর্ণিত হয়েছে। যেমন আমি এ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। যখন এ তিন ধরনের রক্ত ওযূ ভঙ্গ করে দেয়, তখন নিঃসন্দেহে অন্য স্থান থেকে রক্ত বের হলেও তা ওযূ ভঙ্গ করে দেবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

বাস্তবতা হচ্ছে গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের নিকট এ মাসআলার বিপক্ষে কোন মজবুত দলীল নেই; শুধু আছে কিছু সন্দেহ; কিন্তু আলোচনার পূর্ণতার জন্য আমি তাদের খন্ডনও করে দিচ্ছি-

আপত্তি-১.

ইমাম আহমদ ও তিরমিযী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وُضُوْءَ اِلَّا مِنْ صَوْتٍ اَوْ رِيْحٍ

অর্থঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ওযূ নেই; কিন্তু আওয়াজ অথবা নিম্নস্বরে বায়ুর কারণে।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, ওযূ শুধু বায়ু দ্বারা ভঙ্গ হয়, রক্ত ও বমি এটা ব্যতীত। সুতরাং এটা দ্বারা ওযূ ভঙ্গ না হওয়া চাই। এখানে اِلَّا (কিন্তু) সীমিতকরণের জন্য।

খন্ডন

এর দু'টি জবাব দেওয়া হতে পারেঃ

এক. এ হাদীস শরীফ, হে আপত্তিকারীরা, আপনাদেরও বিপক্ষে। কেননা, আপনারাও বলছেন যে, প্রস্রাব, পায়খানা বরং নারী অথবা লজ্জাস্থানকে স্পর্শ করলেও ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। আর اِلَّا এর সীমিতকরণের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, বায়ু ব্যতীত অন্য কোন জিনিষ দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হবে না। সুতরাং তখন আপনাদের যা জবাব হবে, তা আমাদেরও হবে।

দুই. এ সীমিতকরণ আপেক্ষিক; প্রকৃত নয়। অর্থ হলো- যদি কারো থেকে বায়ু বের হবার আশংকা থাকে, তবে আওয়াজ কিংবা দুর্গন্ধ অথবা নিশ্চিতভাবে অনুভূত হওয়া ব্যতীত ওযূ ভঙ্গ হবে না। এর তাফসীর (ব্যাখ্যা) হচ্ছে ওই

হাদীস, যা মুসলিম শরীফ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করছে-

اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهٖ شَيْئًا فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَئٌ اَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدُ رِيْحًا

অর্থ: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজের পেটে কোন নড়াচড়া পায়, এ কারণে তার সন্দেহ হয়ে যায় যে, কিছু বায়ু বের হলো কিনা। তখন সে মসজিদ থেকে বের হবে না এ পর্যন্ত যে, আওয়াজ শুনবে অথবা দুর্গন্ধ পাবে।

এ হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো যে, আপনাদের পেশকৃত হাদীস ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যার বায়ু বের হবার আশঙ্কা থাকে। হাদীসের মর্মার্থ অন্য কিছু; কিন্তু আপনারা অন্য কিছু বলছেন!

আপত্তি-২

ইমাম হাকিম হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّه كَانَ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ مِنْهُ فَتَرَفَهُ الدَّمُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِيْ صَلٰوتِهٖ-

অর্থ: তিনি যাতুর রাক্বা' যুদ্ধে ছিলেন। এক সাহাবীর গায়ে তীর লাগলো। তাঁর দেহ থেকে রক্ত বের হলো; কিন্তু তিনি রুকূ' করেছেন, সাজদাহ্ করেছেন এবং নামায পূর্ণ করে নিলেন।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সাহাবীটার গায়ে নামাযরত অবস্থায় তীর লেগেছে। রক্ত বের হয়েছে। কিন্তু তিনি নামায ভঙ্গ করেননি; বরং রুকূ'-সাজদা করে নামায পরিপূর্ণ করে নিয়েছেন। যদি রক্ত বের হওয়া ওযূ ভঙ্গকারী হতো, তবে তিনি তখনই নামায ভঙ্গ করে ওযূ করে নিতেন। তারপর নামায হয়তো নতুনভাবে পড়তেন, অথবা ওই নামাযকে পরিপূর্ণ করতেন। বুঝা গেলো যে, রক্ত ওযূ ভঙ্গ করে না।

খন্ডন : এ আপত্তির কয়েকটা জবাব হতে পারে:

এক. এ হাদীসতো, হে আপত্তিকারীরা, আপনাদেরও পরিপন্থী। কেননা, যখনই ওই সাহাবীর গায়ে তীর লেগেছে, রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তখন নিশ্চয় তাঁর কাপড় ও শরীর রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি নামায পড়তে থাকেন। সুতরাং আপনাদের উচিত হবে যে, আপনারা রক্ত, প্রস্রাব ও পায়খানা লেগে

একাকার হয়েছে এমন কাপড়েও নামায পড়া জায়েয বলা; অথচ সমস্ত মুসলমানের এতে ঐকমত্য রয়েছে যে, নামাযীর দেহ ও কাপড় পাক-পবিত্র হওয়া চাই। সুতরাং এ হাদীস কোন মতেই আমলযোগ্য নয়।

দুই. এ হাদীসে একথার উল্লেখ নেই যে, ওই সাহাবী এ আমল হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনুমতিক্রমে করেছেন। বুঝা গেলো যে, অন্যকিছু সম্পর্কে অবগতি তাঁর ছিলোনা। এজন্য তিনি এমনটি করে ফেলেছেন।

তিন. এ হাদীস ওইসব 'মারফূ' ও 'মাওক্বূফ' হাদীসের পরিপন্থী, যেগুলো আমরা ইতোপূর্বে, প্রথম পরিচ্ছেদে আরয (উপস্থাপন) করেছি। সুতরাং সেটা আমলযোগ্য নয়।

চার. এ হাদীস ক্বোরআন-ই করীমেরও বিপরীত। কেননা, মহান রব শরীর ও কাপড় পাক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। মহান রব এরশাদ ফরমান- وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (আবর্জ্জনা থেকে দূরে থাকো) আরো এরশাদ ফরমান- وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (আপন কাপড়গুলো পাক রাখো)। আর এ হাদীস থেকে বুঝা গেলো যে, ওইসব বুযুর্গ অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন দেহ ও কাপড়ে নামায পড়ে নিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীস একেবারে আমলযোগ্য নয়।

পাঁচ. যে সাহাবীর এ ঘটনা তিনি কে? তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তিনি কি ফক্বীহ্, না ফক্বীহ্ নন। যদি ফক্বীহ্ হন, তাহলে তিনি ইজতিহাদ করে এমন কাজ করেছেন, যা মারফূ' হাদীস ও সমস্ত ফক্বীহ্ সাহাবীদের বিপরীত। আর যে ইজতিহাদ হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তা বর্জন করা ওয়াজিব। আর যদি তিনি ফক্বীহ্ না হন, তাহলে তো তাঁর এ বিচ্যুতি হয়ে গেছে। সুতরাং এ হাদীস কোন মতেই আমলযোগ্য নয়।

আপত্তি-৩.

যদি রক্ত ওযূ ভঙ্গ করে, তাহলে তো সামান্য রক্ত প্রবাহিত হলেও তা ওযূ ভঙ্গ করা উচিৎ। যেমন প্রস্রাব ওযূ ভঙ্গকারী, চাই প্রবাহিত অথবা শুধু এক ফোঁটাই বের হোক। যখন সামান্য রক্ত, অর্থাৎ প্রবহমান নয় এমন হয়, তখন ওযূ ভঙ্গ করে না, তখন বেশি পরিমাণের রক্তও ওযূ ভঙ্গকারী নয়। অনুরূপ, বমি যদি ওযূ ভঙ্গকারী হতো, তাহলে তা মুখ-ভর্তি পরিমাণ বের হোক কিংবা অল্প পরিমাণ বের হোক, ওযূ ভঙ্গ করতো। এ পার্থক্য আপনারা কোত্থেকে বের করলেন?

খন্ডন

আলহামদুলিল্লাহ্! আপনারা, হে আপত্তিকারীরা, ক্বিয়াসের বৈধতা তো স্বীকার করলেন। বেশী রক্তকে অল্প রক্তের উপর, রক্তকে প্রস্রাবের উপর ক্বিয়াস করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু আপনারা যেমন আপনাদের ক্বিয়াসও তেমন। ওহে জনাব! আবর্জ্জনা বের হওয়া ওযূ ভঙ্গ করে। প্রস্রাব নি:শর্তভাবে অপবিত্র, কম হোক কিংবা বেশী হোক; তবে রক্ত প্রবহমান হলে অপবিত্র। মহান রব এরশাদ ফরমান- اَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا (অথবা প্রবহমান রক্ত), প্রবহমান নয় এমন রক্ত নাপাক নয়। সুতরাং আনপনাদের ওই ক্বিয়াস ক্বোরআনী আয়াতের পরিপন্থী।

তাছাড়া, প্রত্যেক আবর্জ্জনা সেটার খনি তথা উৎসস্থলে থাকাবস্থায় পবিত্র থাকে। খনি (উৎসস্থল) থেকে বের হয়ে নাপাক হয়ে যায়। দেখুন, অন্ত্রগুলোতে পায়খানা আর মূত্রথলিতে প্রস্রাব ভর্তি থাকে। কিন্তু সেখানে পবিত্র। এ কারণে আপনাদের নামায শুদ্ধ হয়। যদি এগুলো নাপাক হতো, তবে নামায কোন অবস্থায় শুদ্ধ হতোনা। আবর্জ্জনা বহনকারীদের নামায বিশুদ্ধ হতোনা। অনুরূপ, পঁচা ডিম, যার ভিতরে রক্ত হয়ে গেছে, পকেটে রেখে নামায পড়া যায়। এর ভিতরকার রক্ত, যেহেতু সেটার খনি (উৎসস্থল)তে রয়েছে, সেহেতু তা পবিত্র। যখন একথা বুঝে নিলেন, তখন প্রস্রাব ও রক্ত বের হবার মধ্যে পার্থক্যও বুঝে নিন। প্রস্রাবের উৎসস্থল হলো মূত্রথলি। তা মূত্রথলি থেকে বের হয়ে প্রস্রাবের নালিতে এসে প্রকাশিত হয়। সুতরাং তখন সেটা নাপাক; যদিও এক ফোঁটা হয়; কিন্তু তবে রক্ত সমগ্র শরীরে দৌড়াচ্ছে। আর চামড়ার নিচে সেটার খনি রয়েছে। যদি কোথাও সূঁচ চুবে যায়, তবে রক্ত বের হয়ে যায়; কিন্তু (বের হয়ে) প্রবাহিত হয়নি, তাহলে সেটা আপন খনি বা উৎসস্থলে রয়েই প্রকাশিত হয়েছে; নাপাক নয়। অবশ্য, যখন প্রবাহিত হয়ে যায়, তখন বুঝে নাও যে, সেটা আপন খনি থেকে পৃথক হয়ে গেছে, আর নাপাক হয়ে গেছে। এ পার্থক্যের ভিত্তিতে প্রস্রাব তো প্রকাশ পেতেই ওযূ ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু রক্ত প্রবাহিত হয়ে ভঙ্গ করে দেবে। মোটকথা, রক্ত বের হওয়া এক জিনিষ, প্রকাশ পাওয়া আরেক জিনিষ। সুতরাং প্রস্রাবকে রক্তের উপর ক্বিয়াস করা মোটেই সঠিক নয় (قياس مع الفارق)।

আপত্তি-৪.

'আয়নী শরহে বোখারী'তে এমন বহু হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ وَلَمْ يَتَوَضَّاْ

অর্থ: নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বমি করেছেন এবং ওযূ করেননি।

যদি বমি ওযূ ভঙ্গ করতো, তবে হুযূর-ই আক্বরাম বমি করে কেন ওযূ করতেন না?

খন্ডন

মা-শা-আল্লাহ! এ কেমন উত্তম (!) আপত্তি। ওহে জনাব! একথাও হাদীস শরীফগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শৌচাগার থেকে তাশরীফ আনলেন। ওযূর জন্য পানি পেশ করা হলো। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওযূ করেন নি; সুতরাং বলে ফেলুন না যে, প্রস্রাব-পায়খানাও ওযূ ভঙ্গ করে না। ওহে, ওযূ না করার কারণ এ ছিলো যে, তখন ওযূর প্রয়োজন ছিলোনা। ওযূ ভঙ্গ হলে তাৎক্ষণিকভাবে ওযূ করা ওয়াজিব (অপরিহার্য) নয়। অবশ্য, যদি হুযূর এরশাদ করতেন যে, বমি ওযূ ভাঙ্গে না, তবে আপনারা তা পেশ করতে পারতেন। যদি এ হাদীসগুলো এ মাসআলার দলীল হতে পারতো, তবে ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি অবশ্যই উপস্থাপন করতেন। ইমাম তিরমিযী রক্ত ও বমি ওযূ ভঙ্গকারী হবার উপর অত্যন্ত সহীহ্ (বিশুদ্ধ) হাদীস পেশ করেছেন। আর ওযূ ভঙ্গকারী না হওয়ার পক্ষে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি; শুধু আলিমদের মাযহাব (অভিমত) বর্ণনা করেছেন। বুঝা গেলো যে, তাঁর দৃষ্টিতে বমি ও রক্ত ওযূ না ভাঙ্গার পক্ষে কোন হাদীস নেই। কেননা, তিনি প্রত্যেক মাসআলার উপর হাদীস পেশ করেন।

আপত্তি-৫.

বমি ও রক্ত সম্পর্কে আপনারা যেসব হাদীস পেশ করেছেন, যেগুলোতে এরশাদ হয়েছে যে, 'যে নামাযীর নামাযে বমি কিংবা নাকে রক্ত এসে যায়, তাহলে সে ওযূ করবে।' সেখানে 'ওযূ' মানে 'রক্ত' ও 'বমি' কাপড় থেকে ধুয়ে ফেলা, শরীয়তসম্মত ওযূ নয়; যেমনটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- اَلْوَضُوْءُ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ অর্থাৎ আগুনে রান্নাকৃত কোন জিনিষ আহার করলে ওযূ করতে হবে। ওখানে ওযূ মানে হাত ধোয়া, কুল্লি করা; শরীয়তসম্মত ওযূ নয়। কেননা, আহার করে হাত ধোয়া, কুল্লি করা সুন্নাত। এ কাজগুলো ওযূ ভঙ্গকারী নয়। এখানেও তদ্রূপ। সুতরাং আপনাদের দলীলগুলো ভুল।

খন্ডন

বাস্তবিপক্ষে আপনাদের এ প্রশ্ন (আপত্তি)-ও তেমনি, যেমনটি হয়তো আজ পর্যন্ত কেউ চিন্তাও করেনি। মন ও মেধা অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এটাই হচ্ছে- তাহরীফ বা পরিবর্তন-পরিবর্দ্ধন। প্রথমত, আপনারা একথা চিন্তা করেননি

যে, ওখানে ওযূর পারিভাষিক অর্থ খোদ্ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করে দিয়েছেন। তা হচ্ছে তিনি একবার খানা আহার করে হাত ধুয়েছেন, কুল্লি করেছেন আর এরশাদ করেছেন - هَذَا وُضُوْءٌ مِّمَا مَسَّتْهُ النَّارُ (অর্থাৎ এটা হচ্ছে আগুনে রান্নাকৃত খাদ্য খাবার পর ওযূ)। এখানে আপনারা এ অর্থ ছেড়ে অখ্যাত অর্থটি কেন গ্রহণ করে বসেছেন। তাছাড়া, এ হাদীসে একথা রয়েছে যে, যার নামাযে বমি অথবা নাকে রক্ত এসে যায়, সে যেন ওযূ করে এবং অবশিষ্ট নামায পূরণ করে। যদি 'কাপড় ধোয়া'র অর্থ গ্রহণ করা উদ্দেশ্য হতো, তবে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করা জায়েয হতোনা; বরং পুনরায় পড়তে হতো। যার কাপড় নামাযে নাপাক হয়ে যায় এবং তা ধৌত করে, সে শুধু অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করতে পারবেনা, পুনরায় পূর্ণাঙ্গ নামায পড়বে। সুতরাং তোমাদের এ ব্যাখ্যা নিছক বাতিল (ভিত্তিহীন)।

---o---

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়

[না পাক পবিত্র করা প্রসঙ্গে]

নাপাক কূপ পবিত্র করার প্রসঙ্গে

শরীয়তের মাসআলা হচ্ছে- যদি কূপ, গর্ত কিংবা কলসী ইত্যাদিতে স্বল্প পরিমাণ নাপাকও পড়ে, তবে সেটার পানি নাপাক হয়ে যাবে। ফলে ওই পানি না পান করা যাবে, না তা দ্বারা ওযূ ইত্যাদি করা জায়েয হবে। এক ফোঁটা প্রস্রাবও কূপকে নাপাক করে ফেলে। আর সমুদ্র, পুকুর অথবা প্রবহমান পানির বিধানাবলী ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা বলে, যখন পানি দু' মটকা পরিমাণ হয়, তবে তাতে যত বেশি নাপাক বস্তু পড়ুক না কেন, নাপাক হবে না, যতক্ষণ না সেটা রং অথবা গন্ধ কিংবা স্বাদ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং তাদের মতে, কূপের মধ্যে খুব পায়খানা করো, মূত্র ত্যাগ করো, কূপ পবিত্র থাকবে। আগ্রহ সহকারে সেটার পানি পান করো, ওযূ করো। তারপর বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় এ যে, এ মাসআলার উপর ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নানা ধরনের গালি দেয়। আর বলে- তিনি (ইমামে আ'যম) নাপাকী পড়া সত্ত্বেও কূপকে পবিত্র কেন সাব্যস্ত করলেন না, মুসলমানদেরকে প্রস্রাব পান করতে দিলেন না কেন?

সুতরাং হানাফীদের উচিৎ হচ্ছে- তাঁরা যেন না গায়র-ই মুক্বাল্লিদদের পেছনে নামায পড়েন, না তাদের কূপের পানির খোঁজখবর না নিয়ে পান করেন। তাদের কূপগুলোর বেশীরভাগ নাপাক থাকে, যেগুলোর পানি দিয়ে তারা কাপড় ধৌত করে, গোসল করে, ওযূ করে, না তাদের শরীর পাক, না কাপড় পাক। যেহেতু এ মাসআলা নিয়ে এসব লোক খুব ঠাট্টা-মযাক করে, শোর-চিৎকার করে, আর বলে, (হানাফীদের বর্ণিত) এ মাসআলা নাকি হাদীসের একেবারে পরিপন্থী।

এজন্য আমি এ মাসআলারও দু' পরিচ্ছেদ করছি, প্রথম পরিচ্ছেদে এ মাসআলাগুলোর পক্ষে দলীলাদি আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন উল্লেখ করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

কূপ নাপাক হওয়ার বর্ণনা

কূপ যত গভীরই হোক না কেন, যত পানিই থাকুক না কেন আর তাতে যদি তাতে এক ফোঁটা মদ অথবা প্রস্রাব পড়ুক অথবা ইঁদুর-বিড়াল পড়ে মরুক, তবে সেটা নাপাক, পবিত্র করা ব্যতীত সেটার পানি ব্যবহারের যোগ্য নয়। এ সম্পর্কে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত আছে। ওইগুলো থেকে আমি নমুনা স্বরূপ কয়েকটা মাত্র নিম্নে উল্লেখ করছি। দেখুন-

হাদীস নং ১-৪.

সর্ব ইমাম মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ ও ত্বাহাভী হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ اَنَّه نَهٰى اَنْ يَبُوْلَ اِلَى فِى الْمَآءِ الرَّاكِدِثُمَّ يَتَوَضَّأُفِيْهِ

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্থির পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন তারপর তা দ্বারা ওযূ করতেও নিষেধ করেছেন।

হাদীস নং ৫-৯.

ইমাম মুসলিম ও ইমাম ত্বাহাভী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَالنَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ لَا يَغْتَسِلُ اَحَدُكُمْ فِى الْمَآءِ الدَّآئِمِ وَهُوَجُنُبٌ
فَقَالَ كَيْفَ يَفْعَلُ يَااَبَا هُرَيْرَةَ قَالَيَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেউ যেন স্থির পানিতে জনাবতের (ফরয) গোসল না করে। আবূ সা-ইব জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আবূ হোরায়রা! তাহলে জুনুবী কি করবে? তিনি বললেন, "পৃথকভাবে পানি নিয়ে নেবে।"

এ হাদীস ইমাম আহমদ, ইবনে হাব্বান ও আবদুর রায্যাক্ব প্রমুখ মুহাদ্দিস ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনাকারী থেকে ভিন্ন ভিন্ন বচনে বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস শরীফগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, গর্ত, কূপ ও সমস্ত স্থির পানিতে না প্রস্রাব করবে, না জানাবতের গোসল করবে। যদি এমনটি করে ফেলা হয়, তবে পানি অপবিত্র হয়ে ব্যবহার যোগ্য থাকবে না। যদি দু' মটকা পানি নাপাক করলেও নাপাক না হতো, তাহলে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ নিষেধাজ্ঞা জারী করতেন না।

হাদীস নং ১০-১২.

সর্ব ইমাম তিরমিযী, হাকিম (মুস্তাদ্‌রাক) ও ইবনে আসাকির হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে ভিন্ন ভিন্ন বচনে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ
مَرَّاتٍ وَّاُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ وَاِذَا وَلَغَ الْهِرَّةُ غُسِلَ مَرَّةً اَللَّفْظُ لِاِبْنِ عَسَاكِرِ

অর্থ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন কুকুর পাত্রে চেটে নেয়, তখন সেটাকে সাতবার ধুয়ে নেবে। প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষে মেজে নেওয়া হবে। আর যখন বিড়াল চেটে যায়, তখন একবার ধোয়া হবে।

এ হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, যদি পাত্রে কুকুর মুখ লাগায়, তবে পাত্রটি সাত বার ধু'তে হবে এবং একবার মাটি দিয়েও মেজে নেওয়া হবে। আর যদি বিড়াল পাত্র থেকে পান করে ফেলে, তবে শুধু একবার ধৌত করবে, পাত্র ছোট হোক, যেমন ডেক্‌সি, লোটা কিংবা বড় পাত্র হোক, যাতে দু/চার মটকা পানির সংকুলান হয়। যদি দু' মটকা পরিমাণ পানি কোন নাপাক বস্তু দ্বারা নাপাক না হতো, তাহলে ওই পাত্র কেন নাপাক হয়ে যেতো, যাতে এ পানি রয়েছে? কুকুরের মুখতো পানিতে পড়েছে, আর পানি পাত্রে লেগেছে। যখন তা দ্বারা পাত্র নাপাক হয়ে গেছে, তখন পানি নিশ্চিতভাবে নাপাক হয়ে গেছে, চাই দু' মটকা পরিমাণ হোক, অথবা তার চেয়ে কম বা বেশি পরিমাণ হোক।

হাদীস নং ১৩-১৫.

ইমাম দারু কুত্বনী ও ইমাম ত্বাহাভী হযরত আবুত্ব ত্বোফায়ল থেকে আর ইমাম বায়হাক্বী হযরত ইবনে আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বরাতে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ غُلَامًا وَقَعَ فِىْ بِئْرِ زَمْزَمَ فَنُزِحَتْ

অর্থ: সাহাবীদের যুগে ঝমঝম কূপে একটি বালক পড়ে গিয়েছিলো। অত:পর কূপের পানি বের করে নেওয়া হয়েছিলো।

হাদীস নং ১৬-১৭

ইমাম ইবনে আবী শায়বাহ্ ও ইমাম ত্বাহাভী হযরত আত্বার বরাতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আত্বা তাবে'ঈ। বর্ণনাটি নিম্নরূপ-

اَنَّ حَبْشِيًا وَّقَعَ فِىْ زَمْزَمَ فَمَاتَ فَاَمَرَبِهٖ اِبْنُ الزُّبَيْرِ فَنُزِحَ مَآءُ هَا فَجَعَلَ الْمَاءُ
لَايَنْقَطِعُ فَنَظَرَ فَاِذَا عَيْنٌ تَجْرِىْ مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَقَالَ اِبْنُ الزُّبَيْرِ حَسْبُكُمْ

অর্থ: এক হাবশী ঝমঝম কূপে পড়ে মারা গেলো। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র হুকুম দিলেন। পানি বের করা হলো। (কিন্তু) পানি শেষ হচ্ছিলো না। তিনি ভিতরে তাকালেন। দেখলেন একটা ঝর্ণা হাজরে আস্‌ওয়া'-এর দিক থেকে আসছিলো। হযরত ইবনে যোবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ''যথেষ্ট।''

হাদীস নং ১৮.

ইমাম বায়হাক্বী হযরত ক্বাতাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ جَبْشِيًا وَقَعَ فِىْ زَمْزَمَ فَمَاتَ فَاَنْزَلَ رَجُلاً اِلَيْهِ فَاَخْرَجَهٗ ثُمَّ
قَالَ اِنْزَحُوْا مَافِيْهَا مِنْ مَّآءٍ

অর্থ: তিনি হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন, ঝমঝম কূপের মধ্যে একজন হাবশী পড়ে মারা গিয়েছিলো। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে তাতে নামালেন, যে তাকে বের করে আনলো। অতঃপর হযরত ইবনে আববাস বললেন, যে পানি কূপের মধ্যে আছে, তা বাইরে ফেলে দাও।

এ হাদীস শরীফগুলো থেকে কতিপয় মাস্‌আলা জানা যায়-

এক. যদি কূপের মধ্যে কোন রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী মরে যায়, তবে কূপ নাপাক হয়ে যায়।

দুই. নাপাক কূপ পাক করার পদ্ধতি হচ্ছে- সেটার পানি ফেলে দেওয়া হবে। সেটার দেওয়ালগুলো ইত্যাদি ধোয়ার প্রয়োজন হবে না।

তিন. যদি কূপের পানি নিঃশেষ করা না যায়, তবে পরোয়া নেই, যে পরিমাণ পানি বর্তমানে মওজূদ থাকে ওই পরিমাণ পানি বাইরে ফেলে দেওয়া হবে। যে পানি এরপরে বের হবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।

চার. যে বালতি ও রশি দ্বারা নাপাক কূপের পানি বের করা হবে, সেটা ধোয়ারও প্রয়োজন নেই। কূপের সাথে ওইগুলোও পবিত্র হয়ে যাবে। যদি গায়র-মুক্বাল্লিদ ওহাবী এ হাদীসগুলোতে গভীরভাবে চিন্তা করে নেয়, তাহলে ইমামে আ'যমকে গালি দেওয়ার মতো জঘন্য কাজ করা, হানাফীদের ঠাট্টা-মযাক, শোর-চিৎকার করা অবশ্যই ছেড়ে দেবে।

হাদীস নং-১৯.

ইমাম ত্বাহাভী ইমাম শা'বী তাবে'ঈ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)'র বরাতে বর্ণনা করেছেন-

عَنِ الشَّعْبِىِّ فِى الطَّيْرِ وَالسِّنَّوْرِ وَنَحْوِ هِمَا يَقَعُ فِى الْبِئْرِ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ دَلْوًا

অর্থ: ইমাম শা'বী পাখী ও বিড়াল ইত্যাদি সম্পর্কে বলেন, যদি এগুলো কূপে পড়ে মরে যায়, তবে চল্লিশ বালতি পনি বাইরে ফেলে দেওয়া হবে।

হাদীস নং- ২০.

ইমাম ত্বাহাভী হযরত হাম্মাদ ইবনে সুলায়মান তাবে'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّه قَالَ فِىْ دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِىْ بِئْرٍ فَمَاتَتْ قَالَ يُنْزَحُ قَدْرُ اَرْبَعِيْنَ دَلْوًا اَوْ خَمْسِيْنَ ثُمَّ يُتَضَأُ مِنْهَا

অর্থ: তিনি বলেন, যখন কূপে মুরগী পড়ে মরে যায়, তখন তা থেকে চল্লিশ বালতি অথবা পঞ্চাশ বালতি পানি বাইরে ফেলে দেবে। তারপর তা থেকে ওযূ করা যাবে।

হাদীস নং- ২১.

ইমাম ত্বাহাভী হযরত মায়সারাহ্ ও যাদান থেকে বর্ণনা করেন-

عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اِذَا سَقَطَتِ الْفَارَةُ اَوِالدَّابَّةُ فِى الْبِئْرِ فَاَخْرِجْهُمَا حَتّٰى يَغْلِبَكَ الْمَاءُ

অর্থ: হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইঁদুর অথবা অন্য কোন প্রাণী কূপে পড়ে মরে যায়, অত:পর ওই দু'টোকে বের করে নাও, তারপর সেটার পানি বের করে নাও, এ পর্যন্ত যে পানি তোমার উপর বিজয়ী হয়ে যায়।

হাদীস নং-২২.

ইমাম ত্বাহাভী হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ তাবে'ঈ থেকে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ فِى الْبِئْرِ تَقَعُ فِيْهَا الْفَارَةُ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ

অর্থ: হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ বলেন, যখন কূপে ইঁদুর পড়ে মরে যায়, তখন তা থেকে কয়েক বালতি পানি বের করে ফেলে দেওয়া হবে।

হাদীস নং- ২৩.

শায়খ আলাউদ্দিন মুহাদ্দিস ইমাম ত্বাহাভীর বরাতে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন (আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন)-

عَنْ اَنَسٍ اَنَّه قَالَ فِى الْفَارَةِ اِذَا مَاتَتْ فِى الْبِئْرِ وَاُخْرِجَتْ مِنْ سَاعَتِهَا يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُوْنَ دَلْوًا

অর্থ: হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ইঁদুর কূপের মধ্যে পড়ে যায় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা থেকে সেটাকে বের করে নেওয়া হয়, তখন বিশ বালতি পানি বের করে নেওয়া হবে।

হাদীস নং-২৪.

ইমাম আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বা হযরত খালিদ ইবনে মাসলামাহ্ থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ عَلِيًّا سُئِلَ عَمَّنْ بَالَ فِىْ بِئْرٍ قَالَ يُنْزَحُ (انتصار الحق : صفحه ٢٥٧

অর্থ: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো এ সম্পর্কে যে, কেউ কূপের মধ্যে প্রস্রাব করে দিলো। (তাহলে কীভাবে কূপটি পবিত্র করা হবে?) তিনি বললেন, "কূপের পানি বের করে নেওয়া হবে।

[ইন্তিসারুল হক্ব: পৃ. ২৫৭]

এ চব্বিশ হাদীস শরীফ নমুনা হিসেবে পেশ করা হলো, যেগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, নাপাক বস্তু পড়লে কূপ নাপাক হয়ে যায়। আর সেটার পানি বের করে নেওয়াই হচ্ছে সেটার পবিত্রতা। যদি এর চেয়েও বেশি বিশ্লেষণধর্মী বর্ণনা দেখতে চান, তাহলে 'ত্বাহাভী শরীফ' ও 'সহীহুল বিহারী শরীফ' দেখুন।

আক্বল বা যুক্তির দাবীও এযে, কূপ ইত্যাদিতে নাপাক বস্তু পড়লে তা নাপাক হয়ে যাওয়া। কেননা, যখন নাপাক বস্তু লেগে গেলে কাপড়, শরীর ও পাত্র ইত্যাদি সব জিনিস নাপাক হয়ে যায়, তখন পানিতে, যা পাতলা জিনিস, নাপাক জিনিস পড়লে যা অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, আরো উত্তম পর্যায়ে নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। তাছাড়া, যখন দু' মটকা দুধ, তেল, পাতলা (তরল) ঘি, মধু ও লাচ্ছি নাপাক বস্তু পড়লে নাপাক হয়ে যায়, তখন তো পানি এসব জিনিস অপেক্ষা বেশি পাতলা, তাও অবশ্যই নাপাক হয়ে যাওয়া চাই। অন্যথায় পার্থক্য বর্ণনা করো- দু' মটকা দুধ কেন নাপাক হয়ে যায়, আর এতটুকু পানি কেন না পাক হবে না? এ কারণে সরকার-ই মদীনা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ঘুম থেকে জাগ্রত হবার পর হাত না ধুয়ে পানিতে চুবিয়ে নিওনা।" [বোখারী, মুসলিম]

পানি চাই দু' মটকা হোক কিংবা তদপেক্ষা কম বা বেশি হোক। দেখুন ওযূবিহিন মানুষকে পানিতে হাত চুবাতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য নাপাক জিনিসগুলোকে পাক করার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। যেমন- তামা ও শীশার পাত্র শুধু মুছে নিলে পাক

হয়ে যায়। নাপাক জুতা শুধু তা পরে চলাফেরা করলে, মাটিতে ঘর্ষণ করা হলে পাক হয়ে যায়। নাপাক যমীন শুধু শুকে গেলে এবং নাপাক বস্তুর চিহ্ন চলে গেলে পাক হয়ে যায়। নাপাক কাপড় ও শরীর ধু'য়ে নিলে পাক হয়ে যায়। অনুরূপ, নাপাক কূপ সেটার পানি বের করে নিলে পাক হয়ে যায়। না পাক দুধ, তেল পাক দুধ ও তেলের সাথে মিশ্রিত হয়ে ভেসে গেলে পাক হয়ে যায়। মোটকথা সঠিক অভিমত হচ্ছে- কূপ ইত্যাদিতে নাপাক পড়লে সেটা নাপাক হয়ে যায়। তারপর সেটাকে পবিত্র করারও বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

এ পর্যন্ত গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা এ মাসআলায় যে পরিমাণ আপত্তি করতে পেরেছে, সেগুলোর খন্ডন আমরা বিস্তারিতভাবে আরয করছি। যদি এরপরও অন্য কোন আপত্তি আমাদের অবগতিতে আসে তাহলে ইনশা-আল্লাহ্ এ কিতাবের পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলোরও জবাব দেবো।

আপত্তি-নং ১.

ইমাম তিরমিযী হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ طُهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ

অর্থ: তিনি বলেন, আরয করা হলো, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি বুদ্বা'আহ্ কূপের পানি দিয়ে ওযূ করতে পারবো?" বুদ্বা'আহ্ এমন এক কূপ ছিলো, যা'তে হায়য (ঋতুস্রাব)-এর কাপড়, কুকুরের মাংস এবং দুর্গন্ধময় বস্তুগুলো ফেলা হতো। তখন হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করলেন, "পনি পবিত্র। সেটাকে কোন জিনিষ নাপাক করতে পারে না।"

'বুদ্বা'আহ্' মদীনা শরীফের একটি কূপ ছিলো, যা'তে সব ধরনের ময়লা-আবর্জ্জনা, এমনকি মৃত কুকুর পর্যন্ত ফেলা হতো; কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও সরকার-ই দু'আলম কূপটির অপবিত্রতা, এমনকি সেটা নাপাক হবার হুকুমও দেননি। আশ্চর্যের বিষয়, হুযূর-ই আক্রাম তো 'বুদ্বা'আহ্' কূপকে কুকুর, হায়যের কাপড় এবং সব ধরনের আব্বর্জনা পতিত হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে নাপাক বলেন নি। কিন্তু ইমাম-ই আযম আবূ হানীফা এক ফোঁটা প্রস্রাব পড়লেও সমগ্র কূপকে নাপাক বলে দিয়েছেন। হানাফী মাযহাবের অনুসরীদের এ মাসআলা (সমাধান) হাদীসের একেবারে পরিপন্থী। ইমাম আবূ হানীফা কি হুযূর-ই আক্রাম অপেক্ষা বেশী পাক ও পরিচ্ছন্ন ছিলেন?

খন্ডন

এ আপত্তির কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস তো হে আপত্তিকারীরা, আপনাদেরও বিপরীত। কেননা, এখানে 'পানি'র প্রতি কোন শর্তারোপ করা হয়নি। অর্থাৎ কতটুকু পানি হলে নাপাক হয় না। সুতরাং উচিৎ হবে- কলসি, লোটার পানিতেও হায়যের কাপড় ও কুকুরের মাংস ফেলে দিয়ে তা পান করে নেবে। কেননা, পানিকে কোন জিনিষই নাপাক করতে পারে না।

দুই. যদি এখানে পানি দ্বারা কূপের পানি বুঝায়, আর অর্থও এ হয় যে, কূপকে কোন জিনিষ নাপাক করে না, তবুও তা আপনাদের বিপক্ষে যায়। কেননা, আপনারা বলে থাকেন যে, যদি নাপাক বস্তু পড়ে কূপের পানির রং কিংবা গন্ধ কিংবা স্বাদ বদলে ফেলে, তাহলে তা নাপাক হয়ে যাবে। বলুন, এমন কোন্ কূপ আছে, যা মৃত কুকুর, হায়যের কাপড় এবং দুগন্ধময় জিনিসগুলো পড়লেও সেটার রং, গন্ধ ও স্বাদ বদলে ফেলে না? দিন ও রাতের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, যদি একটা মুরগীও কূপের মধ্যে মরে ফুলে-ফেটে যায়, তবে পানিতে বিকট দুর্গন্ধ এসে যায়। এ হাদীসের ভিত্তিতে আপনাদেরকে ফাত্ওয়া দিতে হবে যে, ওহাবী, লা-মাযহাবীদের কূপের মধ্যে মৃত কুকুর, শুকর, হায়যের কাপড় খুব ফেলা যাবে আর আপনারা ওই দুর্গন্ধময় পানি পান করতে থাকবেন। আপনারা (পানি নাপাক হওয়ার জন্য) গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তিত হওয়ার শর্ত কোত্থেকে সংযোজন করলেন?

তিন. এ হাদীস ওই সমস্ত হাদীসের বিপরীত, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে-হুযূর আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম স্থির পানিতে প্রস্রাব করতেও নিষেধ করেছেন আর এখানে 'মৃত কুকুর' নিক্ষেপ করতেও নিষেধ করছেন না। সুতরাং এ হাদীস আমল করার উপযোগী নয়; সমস্ত 'মাশহুর হাদীস'-এর পরিপন্থী।

চার. এ হাদীস 'ক্বিয়াস-ই শর'ঈ'রও বিপক্ষে। যেমন আমি প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। আর যখন হাদীসগুলোতে পরস্পর বিরোধ হয়, তখন যে হাদীস ক্বিয়াসের বিরোধী হয়, তা বর্জন করা ওয়াজিব (অপরিহার্য)। আর যা ক্বিয়াসের অনুরূপ হয়, তদনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। সুতরাং ওইসব হাদীস অনুসারে আমল করো, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি।

পাঁচ. এ বুদ্বা'আহ্ কূপ আমাদের দেশের কূপগুলোর মতো ছিলো না, বরং সেটার নিচে পানি প্রবহমান ছিলো; যেমন বর্তমানে মক্কা মু'আয্যমার কূপগুলো 'নহরে যোবায়দা'র উপরিভাগে খনন বা তৈরী করা হয়েছে। আর মদীনা মুনাওয়ারার

কূপগুলো 'নাহরে যারক্বা'র উপর অবস্থিত। বাহ্যিকভাবে কূপ মনে করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলো প্রবহমান পানির কতগুলো নহর। যেহেতু পানি প্রবহমান (জারী) ছিলো, সেহেতু যেসব নাপাক বস্তু তাতে পড়েছে, সবই ভেসে গেছে; তদস্থলে পাক-সাফ পানি এসে গেছে; না তাতে দুর্গন্ধ ছিলো, না কোন নাপাক বস্তু। প্রবহমান নহর ও প্রবহমান নদী (সমুদ্র)-এর বিধান এটাই।

সুতরাং ইমাম ত্বাহাভী ইমাম ওয়াক্বেদী থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّ بِئْرَ بُضَاعَةَ كَانَتْ طَرِيْقًا اِلَى الْبَسَاتِيْنِ فَكَانَ الْمَاءُ لَا يَسْتَقِرُّ فِيْهَا

অর্থ: নিশ্চয় বুদ্বা'আহ্ কূপে পানির রাস্তা ছিলো, যা বাগানগুলোর মধ্যে যেতো। তা'তে পানি স্থির থাকতো না।

এমতাবস্থায় সমস্ত হাদীস পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেলো এবং মাসআলার একেবারে সমাধান হয়ে গেলো। সুতরাং কূপে নাপাক বস্তু পড়লে তা নাপাক হয়ে যায়।

আপত্তি নং- ২.

ইমাম তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِى الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ

অর্থ: তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শুনেছি, এমতাবস্থায় যে, তাঁকে ওই পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, যা জঙ্গল কিংবা মরুভূমিগুলোতে থাকে, যার উপর পাখী ও পশুগুলো নেমে থাকে। তখন হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করেছেন- যখন পানি দু' মটকা পরিমাণ হয়, তখন নাপাক বস্তু বহন করতে পারে না।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, দু' মটকা পরিমাণ পানিতে নাপাক জিনিষ পড়লে নাপাক হয় না। ইমাম তিরমিযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক্ব থেকে বর্ণনা করেছেন, দু' মটকায় পাঁচ মশক হয়। যখন পাঁচ মশক পানি নাপাক হয় না, তখন কূপে তো শত-সহস্র মশক পানি থাকে। তা কীভাবে নাপাক হবে?

খন্ডন.

এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস, হে আপত্তিকারীরা, আপনাদেরও পরিপন্থী। কেননা, এ থেকে বুঝা যায় যে, দু' মটকা পরিমাণ পানি কখনো নাপাক হয় না, যত বেশি নাপাক বস্তু পড়ুক না কেন? خبث (খুব্‌স) শব্দের মধ্যে নাপাক বস্তুর পমিরাণের কোন শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং উচিৎ হবে, যদি দু' মটকা পানিতে চার মটকা প্রস্রাবও পড়ুক না কেন আর সেটার গন্ধ, স্বাদ ও রং সবই প্রস্রাবের মতোও হয়ে যায়, তবুও ওহাবী লা-মাযহাবীরা তা পান করতে থাকা। রং ও গন্ধ পরিবর্তিত না হওয়ার শর্ত আপনারা কোত্থেকে আরোপ করেছেন? এটাও হাদীসের পরিপন্থী।

দুই. لَمْ يَحْمِلِ الْخُبْثَ- এর এ অর্থ কিভাবে হলো যে, না পাক হবে না? এর অর্থ তো নাপাকী বরদাশ্‌ত করতে পারবে না। অর্থাৎ নাপাক হয়ে যায়। যখন এ সম্ভাবনাও মওজুদ থাকে, তখন আপনাদের দলীল গ্রহণ বাতিল বা ভিত্তিহীন।

তিন. যদি এ অর্থ করা হয় যে, দু' মটকা পানি কখনো নাপাক হয় না, তবে এ হাদীস ওই সমস্ত হাদীসের পরিপন্থী হয়ে যায়, যেগুলো আমি প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। হুযূর-ই আন্‌ওয়ার স্থির পানিতে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন, পানি দু' মটকা হোক অথবা কম বা বেশী হোক। আর সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ঝমঝম কূপে এক হাবশী পড়ে মারা গেলে সেটার পানি বের করিয়ে ফেলে দিয়েছেন। এটা কেন? সেটার মধ্যে তো হাজারো মটকা পানি ছিলো; সুতরাং এ হাদীস আমলযোগ্য নয়।

চার. قلتين শব্দটি قلة শব্দের দ্বিবচন। قلة মটকাকেও বলা হয়, আর মানুষের গড়ন তথা মাথা বরাবর দৈর্ঘকেও বলা হয় এবং পাহাড়ের চূড়াকেও বলা হয়। এখানে قلة মানে মানুষের গড়ন তথা মাথা বরাবর উঁচু। আর এটা দ্বারা গভীরতার পরিমাণ বলা উদ্দেশ্য নয়; বরং দৈর্ঘের পরিমাণ বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যখন পানি প্রবহমান হয় আর মানুষের গড়নের দ্বিগুণ পরিমাণ প্রবাহিত হবার জন্য সেটা ব্যবধান পেয়ে যায়, তখন ওই পানি কোন জিনিস দ্বারা নাপাক হবে না। কেননা, ওই পানি নদীগুলোর মতো প্রবহমান থাকবে, নাপাক বস্তুগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তাৎক্ষণিকভাবে অন্য পানি এসে যাবে। এ অর্থের ভিত্তিতে হাদীসগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধও থাকবে না। আর প্রতিটি হাদীস অনুসারে আমল করা ওয়াজিবও হবে। এ ব্যাখ্যা অতিমাত্রায় উত্তম। কেননা, যদি قلة -

এর অর্থ মটকা হয়, তাহলে একথা বুঝা যাবে না কত বড় মটকা, কোথাকার মটকা। আর পাঁচ মশক পরিমাণ নির্ণয় করাও সঠিক নয়। কারণ, হাদীস শরীফে এ পরিমাণের কথা উল্লেখ নেই। তাছাড়া, এটাও জানা নেই যে, মশক কত বড় এবং কোথাকার মশক। মোটকথা, হাদীসটা হবে 'মুজমাল' (সংক্ষিপ্ত বা অবিস্তারিত)। 'মুজমাল' অনুসারে আমল করা সম্ভবপর নয়।

পাঁচ. এ হাদীসে ওই সূরত (অবস্থা) বুঝানো উদ্দেশ্য যে, দু' মটকা পানি যমীনের উপর খুব প্রসারিত; বড় হাউজের পরিমানে হবে। অর্থাৎ একশ' হাত তলদেশ হবে। এখন যেহেতু এ পানি 'পুকুর' হিসেবে বিবেচিত হয়ে গেলো। সুতরাং মা'মূলী নাপাক বস্তু পড়লে নাপাক হবে না। এমতাবস্থায়ও হাদীসগুলোতে পরস্পর বিরোধ থাকছে না।

আপত্তি নং- ৩.

হানাফীদের বালতি বড় মর্যাদাবান। কারণ নাপাক কূপ থেকে শুধু না-পাক পৃথক করে বাইরে নিয়ে আসে; পবিত্র পানি ছেড়ে আসে। আশ্চর্য! যখন কূপের মধ্যে পাখী পড়ে মরে যায়, যা দ্বারা গোটা কূপ নাপাক হয়ে গেলো, আর হানাফীরা তা থেকে শুধু ত্রিশ বালতি বের করে আনে, তখন হয়তো এটা বলবে যে, গোটা কূপ নাপাক হয়নি, শুধু ত্রিশ বালতি পানি নাপাক ছিলো, যাকে এ কারামতী বালতি পৃথক করে নিয়ে এসেছে। যদি সমগ্র কূপ নাপাক হয়ে যেতো, তবে ত্রিশ বালতি পানি বের করে ফেলে দিলে সমগ্র কূপের পানি কীভাবে পাক হয়ে গেলো?

খন্ডন.

এ কারামত তো ওহাবী, লা-মাযহাবীদের বালতিতেও প্রকাশ পায়। যখন কূপের পানি গন্ধ, স্বাদ ও রং বদলে যাবার কারণে নাপাক হয়ে যায়, আর কূপও জারী হয়, যার পানি বন্ধ হয় না, এখন ওহাবীরা সেটাকে পাক করুক! বলুন এমতাবস্থায় সমগ্র কূপ নাপাক হয়েছে, না কিছু সংখ্যক বালতি পরিমাণ পানি! যদি কয়েক বালতি পানি না পাক হয়, তাহলে ওহাবীদের বালতি বাস্তবিকপক্ষে কারামাতী হবে; যা পৃথক করে শুধু নাপাক পানি বের করে আনলো! আর পবিত্র পানিতে হাত ও লাগায়নি! আর যদি সম্পূর্ণ কূপ নাপাক হতো, তবে তো কূপের সমস্ত পানি বেরও করেনি। কূপের চর্তুপাশের দেওয়ালগুলো ধৌতও করা হয়নি। এদিকে কূপ পবিত্র হয়ে গেলো। এটা কীভাবে হলো? এর যে জবাব ওহাবী, লা-মাযহাবীরা দেবেন তা-ই আমাদেরও জবাব হবে বলে বুঝে নিন। জনাব, পাখী পড়ে মরে গেলে সমগ্র কূপ নাপাক হয়ে যাবে; কিন্তু নাপাক জিনিসগুলো থেকে পবিত্র করার পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন জিনিস শুকে গেলো, কোন জিনিস জ্বলে গেলে, কোন জিনিষ ভেসে গিয়ে, কোন কোন জিনিষ মুছে ফেললে

পাক হয়ে যায় । অনুরূপ, এ কূপের পানি শুধু সহজতার জন্য চল্লিশ বালতি পানি বের করে ফেলে দিলে পাক হয়ে যায় । দেখুন, বীর্য না পাক; কিন্তু যখন কাপড়ে লেগে শুকে যায়, তখন শুধু কচলিয়ে ঝেড়ে ফেললে কাপড় পবিত্র হয়ে যায় । আপনাদের আক্বীদাও তদ্রূপ । বলুন, এ কাপড় ধৌত করা ব্যতীত পবিত্র হলো কীভাবে? শুধু সহজতার জন্যই । অনুরূপ সহজতার জন্য শুধু চল্লিশ বালতি পানি বের করে ফেলে দিলে সমগ্র কূপ পবিত্র হয়ে যায় ।

আপত্তি নং -৪.

যদি পাখী কিংবা ইঁদুর পড়ে মরলে কূপ নাপাক হয়ে যায়, তবে নাপাক পানির কারণে কূপটির দেওয়ালগুলোও নাপাক হয়ে যায় । আর যখন সেটাকে পবিত্র করার জন্য তাতে বালতি ফেলা হয়, তখন ওই বালতি, রশিও নাপাক হয়ে যায় । সুতরাং উচিৎ ছিলো সেটা পবিত্র করার জন্য দেওয়ালও ধৌত করা এবং বালতি রশিও পাক করে নেয়া হবে ।

খন্ডন.

এ আপত্তির জনাব আপত্তি নং তিন-এর জবাবে দেওয়া হয়েছে । এমন অবস্থায় শরীয়ত সহজ করে দেয় । কূপের দেওয়াল এবং বালতি-রশি ধৌত করা খুবই কঠিন কাজ ছিলো । এজন্য সেটা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে । আপনারাও আপনাদের নাপাক কূপ পবিত্র করার সময়, না কূপের দেওয়াল ধৌত করছেন, না বালতি-রশি ।

আপনাদের এ ক্বিয়াস বা অনুমান হাদীস শরীফের বিপরীত । আর 'নাস' বা ক্বোরআন-হাদীসের উদ্ধৃতির বিপক্ষে ক্বিয়াস বা অনুমানের ঘোড়া দৌঁড়ানো জায়েয নয় । আমি প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছি যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আববাস প্রমুখ সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম ঝমঝম কূপ পবিত্র করেছেন, কিন্তু না সেটার দেওয়াল ধুয়েছেন, না বালতি-রশি ।

---o---

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়

[অজ গ্রামে জুমু'আহ্ ও দু' ঈদের নামায নেই]

অজ গ্রামে জুমুআহ্ ও দু'ঈদের নামায হয় না

শরীয়তের মাসআলা হচ্ছে- জুমু'আর নামায ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায গ্রামে হয় না। এ তিন নামাযের জন্য 'শহর' অথবা 'শহর সংলগ্ন এলাকা' হওয়া পূর্বশর্ত। না গ্রাম্য লোকদের উপর জুমু'আহ্ ও দু' ঈদের নামায অপরিহার্য, না ওখানে (গ্রাম) এসব নামায জায়েয। অবশ্য যদি গ্রাম্য লোকেরা শহরে এসে এ নামাযগুলো পড়ে যায়, তাহলে সাওয়াব পাবে; কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা বলে, জুমু'আহ্ ও দু' ঈদের নামায প্রত্যেক স্থানে জায়েয। যোহরের নামাযের মতো প্রত্যেক গ্রামে ও শহরে হতে পারে। এ জন্য এ মাসআলার আলোচনাও দু'টি পরিচ্ছেদে করা হচ্ছে, প্রথম পরিচ্ছেদে এ নিষেধের প্রমাণ আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ মাসআলার বিপক্ষে আপত্তিগুলো ও সেগুলোর খন্ডন উল্লেখ করা হবে।

জরুরী নোট: স্মর্তব্য যে, 'শহর' হচ্ছে 'গ্রামের' বিপরীত। 'শহর' হলো ওই বস্তী (জনপদ), যেখানে অলিগলি ও বাজার থাকে। প্রয়োজনীয় জিনিষগুলো পাওয়া যায়। সেখানে কোন শাসকও থাকে। পক্ষান্তরে, যেখানে এগুলো পাওয়া যায়না, তা হচ্ছে 'গ্রাম'।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুমু'আহ্ ও দু' ঈদের নামাযের জন্য অন্যান্য শর্ত হলো জমা'আত ও খোৎবা ইত্যাদির মতো শহর কিংবা শহর সংলগ্ন এলাকা হওয়াও পূর্বশর্ত। অর্থাৎ এ নামাযগুলো শুধু শহরেই হবে, গ্রামে হতে পারে না; দলীলাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো। দেখুন-

দলীল নং-১.

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

يَآاَيُّهَا اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ

তরজমা: হে ঈমানদারগণ! যখন জুমু'আহর দিনে নামাযের আযান হয়ে যায়, তখন আল্লাহর যিক্রের দিকে দৌঁড় এবং বেচাকেনা ছেড়ে দাও।

[সূরা জুমু'আহ: আয়াত-৯, কান্যুল ঈমান]

এ আয়াত শরীফে মহান রব মুসলমানদেরকে জুমু'আর আযান হয়ে যাবার পর দু'টি নির্দেশ দিয়েছেন- জুমু'আর জন্য হাযির হওয়া এবং ব্যবসায়িক কাজ-কারবার ছেড়ে দেওয়া। এটা দ্বারা ইঙ্গিতে বুঝা গেলো যে, জুমু'আহ্ ওখানেই হবে, যেখানে ব্যবসায়িক কাজ কারবার হয়। আর প্রকাশ থাকে যে, ব্যবসায়িক কাজ-কারবার বাজার ও মন্ডিগুলোতেই হয়। আর বাজার ও মন্ডিগুলো শহরেই হয়।

হাদীস নং-১-৩.

ইমাম আবদুর রায্যাক্ব তাঁর 'মুসান্নাফ'-এ, আবূ ওবায়দ 'গরীব'-এ আর মারভেযী 'কিতাবুল জুমু'আহ'য় আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ

অর্থ: তিনি বলেন, জুমু'আহ্ ও তাকবীর-ই তাশরীক্ব হতে পারে না, কিন্তু (হতে পারবে) বড় শহরে।

হাদীস নং-৪.

ইবনে আবূ শায়বাহ্ এ-ই আমীরুল মু'মিনীন আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيْقَ وَلَا صَلٰوةَ فِطْرٍ وَلَا اَضْحٰى اِلَّا فِى مِصْرٍ جَامِعٍ اَوْ مَدِيْنَةٍ عَظِيْمَةٍ

অর্থ: তিনি বলেন, না জুমু'আহ্ হয়, না তাকবীর-ই তাশরীক্ব, না ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার নামায, কিন্তু (হয়) বড় শহরে।

হাদীস নং-৫.

ইমাম বায়হাক্বী আরফায় এ-ই হযরত আলী মুরতাদ্বার বরাতে বর্ণনা করেন-

قَالَ لَا تَشْرِيْقَ وَلَا جُمُعَةَ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ

অর্থ: তিনি বলেন, নেই কোন জুমু'আহ্, নেই তাকবীরে তাশরীক্ব; কিন্তু (আছে) বড় শহরে।

হাদীস নং-৬.

ফাত্হুল বারী, শরহে বোখারী: ২য় খন্ড: পৃ. ৩১৬-এ হযরত হুযায়ফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

قَالَ لَيْسَ عَلَى اَهْلِ الْقُرٰى جُمُعَةٌ اِنَّمَا الْجُمُعَةُ عَلَى اَهْلِ الْاَمْصَارِ مِثْلِ الْمَدَائِنِ

অর্থঃ তিনি বলেন, গ্রাম্য লোকদের উপর জুমু'আহ্ ফরয নয়; জুমু'আহ্ মাদা-ইনের মতো শহরবাসীদের উপর ফরয ।

হাদীস নং-৭-৯.

বোখারী, মুসলিম ও আবূ দা'উদ শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার বরাতে বর্ণিত-

كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُوْنَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَّنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيْ يَاْتُوْنَ فِى الْغُبَارِ وَالْعَرَقِ الخ

অর্থঃ লোকেরা জুমু'আহর নামাযের জন্য তাদের মান্যিল ও গ্রামগুলো থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় আসতো । তাদের গায়ে ধূলিবালি লেগে যেতো আর ঘাম বের হয়ে যেতো ।

হাদীস নং-১০.

ইমাম তিরমিযী হযরত সুয়ায়দ থেকে, তিনি ক্বোবাবাসীদের মধ্য থেকে এক সাহাবী থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, যিনি সাহাবী-ই রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন-

قَالَ اَمَرَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَشْهَدَ الْجُمُعَةَ مِنْ قُبَا

অর্থঃ তিনি বলেন, আমরা ক্বোবাবাসীদেরকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়েছেন যেন জুমু'আর নামাযের জন্য ক্বোবা থেকে হেঁটে মদীনা মুনাওয়ারাহ্য় চলে আসি ।

হাদীস নং- ১১.

ইমাম তিরমিযী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেন-

قَالَ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ اٰوَاهُ اللَّيْلُ اِلٰى اَهْلِهِ

অর্থঃ তিনি বলেন, জুমু'আহ্ তার উপর ফরয, যে জুমু'আহ্ পড়ে রাত অবধি নিজ ঘরে পৌঁছে যায় ।

হাদীস নং- ১২.

ইমাম ইবনে মাজাহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর থেকে বর্ণনা করেছেন-

اَنَّ اَهْلَ قُبَاءٍ كَانُوْا يَجْمَعُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অর্থঃ ক্বোবাবাসীরা জুমু'আহ্র দিনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে জুমু'আহ্ আদায় করতেন ।

হাদীস নং-১৩-১৪.

'মুআত্তা ইমাম মালিক'-এ بَابُ لاَ جُمُعَةَ فِى الْعَوَالِىْ এবং 'মুআত্তা-ই ইমাম মুহাম্মদ'-এ بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ وَاَمْرِ الْخُطْبَةِ -এ ইবনে শেহাবের বর্ণনায় সূত্রে, তিনি আবূ ওবায়দ মূসা ইবনে আযহার থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ شَهِدْتُّ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ فَصَلّٰى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَالَ اِنَّه اجْتَمَعَ لَكُمْ فِىْ يَوْمِكُمْ هٰذَا عِيْدَانِ فَمَنْ اَحَبَّ مِنْ اَهْلِ الْعَالِيَةِ اَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ اَذِنْتُ لَه

অর্থঃ তিনি বলেন, আমি হযরত ওসমানের সাথে ঈদের নামাযে হাযির হলাম । তিনি নামায পড়লেন, তারপর ফিরে আসলেন । আর বললেন, আজকের দিনে দু' ঈদ একত্রিত হয়ে গেছে । তখন গ্রাম্য লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমু'আহর জন্য অপেক্ষা করতে চায়, সে যেন তা করে । আর যে ফিরে যেতে চায়, আমি তাকে অনুমতি দিচ্ছি ।

এ শেষোক্ত হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, নবী করীম ও সাহাবীদের যুগে ক্বোবা ও অন্যান্য গ্রাম থেকে লোকেরা জুমু'আহ্ ও দু'ঈদের নামায পড়ার জন্য মদীনা মুনাওযারায় হাযির হতেন । তাঁরা তাঁদের গ্রামে এ নামাযগুলো পড়তেন না । যদি গ্রামে জুমু'আর নামায পড়া জায়েয হতো, তবে এসব হযরত ওখানেই নামায পড়ে নিতেন; ধূলিবালি, রোদের তাপ ও ঘামের কষ্ট সহ্য করে জুমু'আহ্ ও দু' ঈদের নামাযের জন্য মদীনা তাইয়্যেবায় আসতেন না । বোখারীর শব্দ يَنْتَابُوْنَ এবং মু'আত্তার শব্দ اَنْ يَرْجِعَ থেকে বুঝা গেলো যে, গ্রাম্য লোকদের উপর জুমুআহ্ ফরয নয়; অন্যথায় তাদের বারংবার আসার অর্থ কি? আর শুধু ঈদ পড়ে, যা জুমু'আর দিনে ছিলো, জুমু'আহ্ না পড়ে ফিরে যাবার অর্থই বা কি?

আক্বল বা যুক্তির দাবীও হচ্ছে জুমু'আহ্ গ্রামে ও জঙ্গলগুলোর মধ্যে না হওয়া, শুধু শহরের মধ্যে হওয়া! কেননা, হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বিদায় হজ্জ জুমু'আর দিনে হয়েছে । অর্থাৎ ৯ই যিলহজ্জ আরফা দিবসে জুমা ছিলো, যাতে এক লক্ষ অপেক্ষা বেশী সাহাবীর সমাবেশ ছিলো । কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম না নিজে আরাফাতের ময়দানে জুমু'আহ্ পড়েছেন, না মক্কার হাজীদেরকে তা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন ।

তাছাড়া, সাহাবা কেরাম অনেক দেশ জয় করেছেন, কিন্তু কোথাও এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, এসব হযরত গ্রামে জুমু'আহ্ কায়েম করেছেন। সুতরাং 'ফাত্হুল ক্বাদীর: জুমু'আহ্ অধ্যায়'-এ আছে-

وَلِهَذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ حِيْنَ فَتَحُوْا الْبِلَادَ وَاشْتَغَلُوْا بِنَصْبِ الْمَنَابِرِ وَالْجُمُعِ اِلاَّ فِى الْاَمْصَارِ

অর্থ: সাহাবা-ই কেরাম থেকে কোথাও উদ্ধৃত হয়নি যে, যখন তাঁরা বিভিন্ন এলাকা জয় করেছেন, তখন তারা শহরগুলো ছাড়া কোথাও ঈদ ও জুমু'আহ্ কায়েম করেছেন।

যদি জুমু'আহ্ যোহরের মতো প্রত্যেক জায়গায় হতো, তাহলে এসব হযরত প্রত্যেক স্থানেই জুমু'আহ্ কায়েম করতেন। যেমন জুমু'আহর জন্য খোৎবাহ্ ও জমা'আত ইত্যাদি পূর্বশর্ত, যা যোহরের নামাযের জন্য পূর্বশর্ত নয়। তাছাড়া, জুমু'আহ্ মুসাফির, নারী ও রোগাক্রান্তের উপর ফরয নয়। যোহর সবার উপর ফরয, তেমনি যদি জুমু'আর জন্য শহর হওয়া পূর্বশর্ত হয়, তাহলে ক্ষতি কি? মোটকথা, জুমু'আহ্ সব বিধানে যোহরের মতো নয়।

---o---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[এ মাসআলার বিপক্ষে আনীত আপত্তিগুলো ও ওইগুলোর খন্ডন]

আপত্তি নং-১.

ক্বোরআন করীম থেকে জুমু'আর নামায ফরয হওয়া শর্তহীনভাবে (بطريق اطلاق) প্রমাণিত। ওখানে শহরের শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং আপনারা উপরোক্ত হাদীসগুলোর কারণে ক্বোরআনের উপর শর্তারোপ কীভাবে করতে পারেন? ক্বোরআনের 'শর্তহীন' বিধানকে 'খবর-ই ওয়াহিদ' পর্যায়ের হাদীস দ্বারা শর্তযুক্ত করা যায় না।

খন্ডন

এর একাধিক জবাব রয়েছে- একটি ইলযামী (আপত্তির উপর ভিত্তি করে), অন্যগুলো তাহক্বীক্বী (গবেষণালব্ধ)।

এক. 'ইলযামী' জবাব হচ্ছে- 'ক্বোরআন শরীফে জুমু'আর নামাযের জন্য কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি; না সময়ের, না খোৎবার, না জমা'আতের, না জায়গার। সুতরাং উচিৎ হবে জুমু'আর নামায দিনে, রাতে, ফজর, মাগরিব যে কোন সময়ে পড়ে নাও। অনুরূপ, খোৎবারও অপরিহার্যতা থাকবে না। জঙ্গলে ও ঘরে, একাকী ব্যক্তিও জুমা'আহ্ পড়তে পারবে। অথচ আপনারাও একথা স্বীকার করেন না; মানতে পারেন না।

দুই. জুমু'আহর আয়াত শর্তহীন (مطلق) নয়; বরং 'মুজমাল' (অবিস্তারিত)। আর 'মুজমাল'-এর তাফসীল 'খবর-ই ওয়াহিদ' পর্যায়ের হাদীস দ্বারাও হতে পারে।

তিন. এগুলো 'খবর-ই ওয়াহিদ' পর্যায়ের হাদীস নয়। আরাফাতের ময়দানে হুযূর-ই আক্রাম জুমু'আহ্ না পড়া, ওইসব হাজী সাহেব দেখেছেন, যাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ছিলো। যে কর্ম শরীফকে এত সংখ্যক সাহাবী দেখেছেন, তা 'খবর-ই ওয়াহিদ' কিভাবে হতে পারে?

চার. খোদ্ ক্বোরআন-ই করীম-এ শহরের শর্ত আরোপিত হবার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন- মহান রব জুমু'আর হুকুমের সাথে এরশাদ করেছেন- وَذَرُوا

الْبَيْعَ (এবং তোমরা বেচা-কেনা ছেড়ে দাও)। একথা আমি প্রথম পরিচ্ছেদে আরয করেছি।

আপত্তি নং-২.

বোখারী ইত্যাদিতে সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মসজিদে নবভী শরীফের পর সর্বপ্রথম জুমু'আহ্ 'মসজিদে আবদুল ক্বায়স'-এ হয়েছে, যা বাহরাঈনের একটি গ্রাম 'জুয়াসা'য় অবস্থিত। বুঝা গেলো যে, 'ক্বারইয়াহ্' অর্থাৎ গ্রামে জুমু'আহ্ হতে পারে।

খন্ডন.

এ আপত্তির কতিপয় জবাব রয়েছে-

প্রথমতঃ আরবীতে 'ক্বারইয়াহ্ (قرية) শুধু গ্রামকে বলা হয় না, নিঃশর্তভাবে বস্তিকে বলা হয়। তা গ্রাম হোক, কিংবা শহর হোক। ক্বোরআনে করীমে অনেক জায়গায় শহরকে 'ক্বারইয়াহ্' (قرية) বলা হয়েছে। সুতরাং এরশাদ হচ্ছে- وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ কাফিরগণ বললো, এ ক্বোরআন ওই দু' শহর (মক্কা ও তায়েফ)-এর কোন বড়লোকের উপর কেন অবতীর্ণ হলোনা?

দেখুন, এ আয়াতে মক্কা মু'আযযামাহ্ ও তায়েফকে 'ক্বারইয়াহ' বলা হয়েছে অথচ এ দু'টি বড় বড় শহর। মক্কা মু'আয্যামার প্রসিদ্ধি তো ক্বোরআন থেকে প্রমাণিত- وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ (এ নিরাপদ শহরের শপথ। ৯৫:৩)

আরো এরশাদ হয়েছে- وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِىْ كُنَّا فِيْهَا (আপনি জিজ্ঞাসা করুন ওই শরহকে, যাতে আমরা ছিলাম।) দেখুন, এ আয়াতে মিশরকে قرية বলা হয়েছে, যা বিশাল শহর। আরো এরশাদ হয়েছে-

حَتّٰى اِذَاتَيَا اَهْلَ قَرْيَةِ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا

অর্থঃ এ দু'জন (হযরত মূসা ও হযরত খাদ্বির আলায়হিমাস্ সালাম) এক বস্তিতে পৌঁছান এবং ওখানকার বাসিন্দাদের থেকে খাবার তলব করলেন। [১৮:৭৭]

এ আয়াতে ইনত্বাকিয়াহ্ (সিরিয়ার একটি বড় শহর)-কে 'ক্বারইয়াহ' (قرية) বলা হয়েছে; অথচ এটা একটা বিরাট শহর। মোটকথা, 'ক্বারইয়াহ্' (قرية) শহরকেও বলা হয়। 'জুয়াসা' (جواثى) গ্রাম ছিলোনা, বরং শহর ছিলো। সুতরাং 'সিহাহ'র মধ্যে আছে- اَنَّ جُوَاثٰى حِصْنٌ بِالْبَحْرَيْنِ (অর্থাৎ জুয়াসা বাহরাইনের এক কিল্লারূপী শহর)।

আর প্রকাশ থাকে যে, কিল্লা শহরগুলোতে থাকে। (ফাত্হুল ক্বদীর)। 'মাবসূত্ব'-এ রয়েছে- اِنَّهَا مَدِيْنَةٌ بِالْبَحْرَيْنِ নিশ্চয় সেটা বাহরাইনের একটি শহর।

মোটকথা, যেসব লোক বলেছে- 'জুয়াসা' 'ক্বারইয়াহ্', তাঁদের উদ্দেশ্য- 'ক্বারইয়াহ্' দ্বারা শহর বুঝানো। **দ্বিতীয়ত,** যদি এখানে 'ক্বারইয়াহ্' মানে গ্রাম হয়, তাহলে সেটার প্রথমবাস্থা বুঝানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় সেটা গ্রাম ছিলো। তারপর 'জুমু'আহ্ কায়েম হবার সময়ে সেটা শহর হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং শহর বিশিষ্ট বর্ণনাগুলোও বিশুদ্ধ; গ্রাম বিশিষ্ট বর্ণনাগুলোও। **তৃতীয়ত,** যদি জুমু'আহ্ কায়েম হওয়ার সময়েও গ্রাম থাকতো, তবে ওখানে জুমু'আহ্ পড়া সাহাবা-ই কেরামের ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিলো; হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হুকুমের ভিত্তিতে ছিলোনা। ওইসব বুযুর্গের এ মাসআলা জানা ছিলোনা। [ফাত্হুল ক্বাদীর ইত্যাদি]

আপত্তি নং-৩.

বায়হাক্বী শরীফে হযরত আবদুর রহমান ইবনে কা'বের বর্ণনা সূত্রে হযরত কা'ব ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমাদেরকে জুমু'আহ্ হযরত সা'দ ইবনে যারারাহ্ বিয়াদ্বাহ্ গোত্রের হাররাহ্ নামক স্থানে পড়িয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো- সেখানে কতজন লোকের বসবাস ছিলো? তিনি বলেন, 'শুধু চল্লিশজন লোক ছিলো।

হযরত কা'ব যখনই আযানের ধ্বনি শুনতেন, তখন হযরত সা'দের জন্য দো'আ করতেন। দেখুন, হযরত সা'দ ইবনে যারারাহ্ও সাহাবী, হযরত কা'ব ইবনে মালিকও। এ বুযুর্গদ্বয় অন্য সাহাবা-ই কেরামের সাথে এমন জায়গায় জুমু'আহ্ পড়িয়েছেন, যেখানে শুধু চল্লিশজন লোকের বস্তি ছিলো। বুঝা গেলো যে, গ্রামে জুমু'আহ্ জায়েয।

খন্ডন

এ ঘটনা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হিজরতের পূর্বেকার, যখন জুমু'আহ্ ফরয-ই হয়নি। 'বায়'আত-ই আক্বাবাহ্'র পর যখন মদীনা-ই মুনাওয়ারায় ইসলামের প্রসার লাভ করেছিলো এবং কিছু লোক মুসলমান হয়ে গেলেন, তখন ওইসব মুসলমান পরস্পর পরামর্শ করলেন। আর বললেন, ''ইহুদীরা যেমন শনিবারে এবং খ্রিস্টানরা রবিবারে তাদের নিজ নিজ এবাদতখানায় একত্রিত হয়ে ইবাদত করে, আমরাও তেমনি 'আরূবাহ্' জুমু'আহ্ দিবসে একত্রিত হয়ে ইবাদত করবো।'' সুতরাং হযরত সা'দ ইবনে যারারাহ্ রিয়াদ্বাহ্ গোত্রের হাররাহ্ নামক স্থানে এক বিশেষ জায়গায় মসজিদের আকারে

ঘর নির্মাণ করলেন। আর সেখানে 'আরূবাহ'র দিনে একত্রিত হতে এবং নামায ও ওয়ায করতে আরম্ভ করে দিলেন। আর ওই দিনের নাম 'জুমু'আহর দিন' রাখলেন। অর্থাৎ মুসলমানদের সমবেত হবার দিন। এ নামায ওইসব বুযুর্গের ইজতিহাদের ফসল (ইজতিহাদী নামায) ছিলো, বর্তমানকার ইসলামী জুমু'আহ্ ছিলোনা। তারপর মহান রব ওই দিনে জুমু'আর নামায ফরয করেছেন। এর গবেষণাধর্মী বিস্তারিত বর্ণনা 'বায়হাক্বী শরীফে'-এ এ স্থানে আর 'ফাত্হুল ক্বাদীর'-এ জুমু'আহর আলোচনায় দেখুন।

যদি কিছুক্ষণের জন্য একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, ওই নামায প্রচলিত জুমু'আর নামাযই ছিলো, তাহলে বনী বিয়াদ্বার হাররাহ্ স্বাধীন গ্রাম ছিলোনা; বরং মদীনা মুনাওয়ারার পার্শ্ববর্তী এক এলাকা ছিলো। অর্থাৎ শহর সংলগ্ন এলাকা। আর আমরা ইতোপূর্বে আরয করেছি যে, শহর সংলগ্ন (ফানা-ই শহর)-এর জঙ্গলগুলোতেও জুমু'আহ্ এবং দু' ঈদের নামায জায়েয।

আপত্তি নং ৪.

বোখারী শরীফে হযরত ইয়ূনুস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, জনাব রুযায়ক্ব ইবনে হাকীম ইবনে শিহাবকে চিঠি লিখেছেন, আমি কি আমার আয়লাভূমিতে জুমা পড়ে নেবো, যেখানে কয়েকজন সুদানী প্রমুখ মুসলমান থাকে? তিনি জবাব দিলেন- অবশ্যই পড়বে। দেখুন, মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুরায়ক্বকে এক অতি ছোট্ট গ্রাম আয়লায় জুমু'আহ্ পড়ার হুকুম দিয়েছেন। বুঝা গেলো যে, জুমু'আহ্ গ্রামেও জায়েয।

খন্ডন.

এর জবাব বোখারী শরীফের এখান থেকে বুঝা যায় যে, মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে শিহাব যুহরী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এ ফাত্ওয়া নিজের 'ইজতিহাদ' দ্বারা দিয়েছেন; কোন হাদীসের ভিত্তিতে দেননি। মাসআলা তাঁর জানা ছিলোনা। তিনি মনে করেছেন যে, যোহরের মতো জুমু'আহ্ও হয়তো সব জায়গায় শুদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তিনি এ সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন। বোখারী শরীফে এ স্থানে ইবনে শিহাবের পূর্ণ চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে; যাতে ওই ফাত্ওয়ার এ দলীল উল্লেখ করেছেন যে, 'আমাকে সালিম, তাঁকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর বর্ণনা করেছেন, তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি দায়িত্বশীল। তাকে ক্বিয়ামতে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে...।'' এ থেকে বুঝা গেলো যে,

ইবনে শিহাব গ্রামে জুমু'আহ্ জায়েয হবার পক্ষে কোন হাদীস পাননি; শুধু এ হাদীস থেকে মাসআলা অনুমান করেছেন।

আপত্তি নং ৫

আপনাদের উপস্থাপিত সব হাদীস হযরত আলীর বাণী, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী নয়। একজন মাত্র সাহাবীর বাণী দ্বারা ক্বোরআনের আয়াতের বিপরীত ফাত্ওয়া কীভাবে দেওয়া যেতে পারে?

খন্ডন.

সাহাবা-ই কেরামের বাণীসমূহও হাদীস, যেগুলোকে 'হাদীস-ই মাওক্বুফ' বলা হয়। আর এ হাদীসগুলো যদি ক্বিয়াসগুলোর পর্যায়ের না হয়, তবে সেগুলো 'হাদীস-ই মারফূ'র পর্যায়ে পড়ে। হযরত আলী মুর্তাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জানতেন যে, ক্বোরআন শরীফে জুমু'আহর নামাযের জন্য শহর হতে হবে মর্মে সুস্পষ্ট শর্তারোপ করা হয়নি। অতঃপর তিনি বলেছেন, গ্রামে জুমু'আহ্ জায়েয (বৈধ) নয়। বুঝা গেলো যে, তিনি নিজের রায় থেকে একথা বলেন নি; বরং হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনে এটা বলেছেন। এ কারণেই 'হিদায়া' প্রণেতা মহোদয় এ হাদীস 'মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কেননা, এমন হাদীসগুলো 'মারফূ হাদীস' হিসেবে বিবেচিত হয়।

আপত্তি নং ৬.

জুমু'আর নামায যোহরের নামাযের স্থলাভিষিক্ত। এ কারণে জুমু'আর দিনে যোহরের নামায পড়া হয় না, শুধু জুমু'আহ্র নামাযই পড়া হয়। যখন যোহর গ্রাম ও শহর উভয় জায়গায় শুদ্ধ হয়, তখন জুমু'আহ্ও প্রত্যেক জায়গায় শুদ্ধ হয়ে যাওয়া চাই।

খন্ডন

এ আপত্তি, হে লা-মাযহাবীরা, আপনাদের বিপক্ষেও করা যায়। কেননা, এতে একথা অপরিহার্য হয়ে যায় যে, যোহরের মতো জুমু'আহ্ একাকী, জমা'আত সহকারে, জঙ্গলে, ঘরে, মসজিদে, সর্বত্র শুদ্ধ হয়ে যাওয়া চাই। ওহে আল্লাহর বান্দারা, যখন জুমু'আহ্ ও যোহরের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, যেমন যোহরের রাক্'আত সংখ্যা চার, কিন্তু জুমু'আহ্ দু' রাক্'আত। যোহরে 'সুন্নাতে মুআক্কাদাহ' ছয় রাক্'আত-চার রাক'আত ফয়যগুলোর পূর্বে আর 'দু' রাক্'আত পরে, কিন্তু জুমু'আহ্য় আট রাক্'আত-চার রাক্'আত ফরযের পূর্বে আর চার রাক্'আত জুমু'আহর ফরযের পর। যোহরের জন্য জমা'আত পূর্বশর্ত নয় আর

জুমু'আর জন্য পূর্বশর্ত। যোহরের জন্য খোৎবা পড়া পূর্বশর্ত নয়। জুমু'আহয় পূর্বশত, যোহরের একটি আযান, জুমু'আয় দু'টি; যোহর ঘরে পড়াও জায়েয, কিন্তু জুমু'আহ্‌র জন্য সাধারণভাবে অনুমতি বিশিষ্ট স্থান হওয়া জরুরী। যোহর সব মুসলমানের উপর ফরয; কিন্তু জুমু'আহ্ নারী ও মুসাফিরের উপর ফরয নয়। যখন জুমু'আহ্ ও যোহরের মধ্যে এত পার্থক্য রয়েছে, তখন যদি এ পার্থক্যও হয়ে যায় যে, যদি জুমু'আহ্‌র জন্য শহর হওয়া পূর্বশর্ত হয়, তবে ক্ষতি কি? গবেষণালবদ্ধ সিদ্ধান্ত এ যে, জুমু'আহ্ হিজরতের পূর্বে ফরয হয়ছিলো; কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পূর্বে না মক্কায় জুমু'আহ্ পড়েছেন, না হিজরতের পর ক্বোবায় অবস্থানের সময়সীমায় পড়েছেন। কেননা, ওই সময় মক্কা মু'আয্‌যামাহ্ 'দারুল ইসলাম' (ইসলামী রাষ্ট্র) ছিলোনা। আর ক্বোবা শরীফও শহর ছিলোনা। জুমু'আর জন্য এ উভয়টি পূর্বশর্ত।

আপত্তি নং ৭

হানাফীগণ বলেন যে, হজ্জের মৌসূমে মিনায় জুমু'আহর নামায পড়া যাবে। মিনা তো গ্রামও নয়; নিছক জঙ্গলই। যদি জুমু'আর জন্য শহর হওয়া পূর্বশর্ত হতো, তাহলে মিনায় জুমু'আহ্ জায়েয হয়ে গেলো কেন?

খন্ডন.

হজ্জের মৌসুমে মিনা শহর হয়ে যায়। কেননা, তখন সেখানে সব ধরনের ইমারত, অলি-গলি ও বাজার তো পূর্বেই নির্মিত ও স্থাপিত হয়ে আছে। হজ্বের মৌসুমে ওইগুলো আবাদ হয়ে যায়। আর সেখানে হাকিম (শাসক) ও মওজূদ থাকেন। এ জন্য সেখানে জুমু'আহ্ জায়েয, এ যুগে দিল্লী ও কানপুরের মতো শহর হয়ে যায়। আরাফাত নিছক ময়দান। উচিৎ তো ছিলো ওখানে ঈদের নামাযও পড়ানোর ব্যবস্থা করা। কিন্তু যেহেতু ওই দিনে হজ্জের ব্যস্ততা খুব বেশি হয়ে যায়, এ জন্য হাজীদের জন্য ঈদ মাফ। রামী, ক্বোরবানী, মাথা মুন্ডানো বা ছাঁটানো (হিজামত) এবং তাওয়াফ-ই যিয়ারত এসব ক'টি ১০ যিলহজ্ব তারিখে সম্পন্ন করা হয়। এগুলো সম্পন্ন করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। স্মর্তব্য যে, মুসাফিরের উপর না জুমু'আহ্ ফরয, না ঈদ ওয়াজিব। আর বেশীরভাগ হাজী মুসাফিরই হয়ে থাকেন।

জরুরী নোট

যেখানে মুসলমানগণ গ্রামে জুমু'আহ্ পড়ে নিচেছ, সেখানে যেন তাদেরকে সতর্কতামূলকভাবে যোহরের নামায পড়ে নেয়ার হুকুম তাকীদ সহকারে দেওয়া হয়; অন্যথায় তাদের ফরয আদায় হবে না, যোহরের নামায অনাদায়ী থেকে যাবে।

---o---

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়

[জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা যাবে না]

জানাযার নামাযে ‘সূরা ফাতিহা শরীফ’ তিলাওয়াত করা যাবে না

হানাফী মাযহাবের ইমামদের মতে জানাযার নামাযে ক্বোরআন তিলাওয়াত নিঃশর্তভাবে (যে কোনভাবে) সুন্নাতের পরিপন্থী। এ’তে না তো সূরা ফাতিহা পড়া যাবে, না অন্য কোন সূরা। এ নামাযে শুধু হামদে ইলাহী, দুরূদ শরীফ ও দো‘আ পড়া হয়। অবশ্য যদি ‘আল-হামদু শরীফ’ অথবা অন্য কোন সূরা আল্লাহর সানা (প্রশংসা) কিংবা দো‘আর নিয়্যতে পড়া হয়, তবে জায়েয; তিলাওয়াতের নিয়্যতে জায়েয নয়। তিলাওয়াত ও দো‘আর নিয়্যতগুলোর বিধানাবালী ভিন্ন ভিন্ন। দেখুন- নাপাকী (জানাবৎ)-এর অবস্থায় ক্বোরআনের আয়াত তিলাওয়াতের নিয়্যতে পাঠ করা হারাম; দো‘আর নিয়্যতে পড়া দুরস্ত (জায়েয)। কেউ জিজ্ঞাসা করলো- ‘আপনি কেমন আছেন।’’ আমি বললাম, ‘‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল ‘আলামীন।’’ যদি আমরা নাপাকীর অবস্থায় থাকি, তবুও এটা বলে ফেলা জায়েয; কিন্তু যদি ক্বোরআন তিলাওয়াতের নিয়্যতে এ আয়াত পড়ে, তাহলে জঘন্য অপরাধ (শক্ত গুনাহ্)। কিন্তু গায়র মুক্বাল্লিদ ওয়াহাবীরা বলে, জানাযার নামাযে তিলাওয়াতে ক্বোরআনের নিয়্যতে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। এ কারণে, আমি এ অধ্যায়কেও দু’ পরিচ্ছেদে ভাগ করেছি, প্রথম পরিচ্ছেদে আমাদের দলীলাদি, আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এর বিপক্ষে কৃত প্রশ্নাবলী (আপত্তিসমূহ) উল্লেখ করে সেগুলোর খন্ডন করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ মাসআলার পক্ষে দলীলাদি-

দলীল নং-১.

ক্বোরআন-ই করীম এরশাদ করছে-

وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ

তরজমা: মুনাফিক্বদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে আপনি তার উপর জানাযার নামায পড়বেন না।

এ আয়াত শরীফে জানাযার নামাযকে ‘সালাত’ বলা হয়েছে; কিন্তু عَلٰى সহকারে এরশাদ করেছেন; যা থেকে বুঝা গেলো যে, এ নামায বাস্তবিকপক্ষে দো‘আ,

পারিভাষিক নামায নয়। যেমন মহান রব এরশাদ ফরমায়েছেন- طُوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا অর্থাৎ: হে মুসলমানগণ! তোমরা নবীর উপর দুরূদ ও সালাম পড়ো। এখানে صَلُّوْا عَلَيْهِ-এর মধ্যে নামায বুঝানো হয়নি; বরং দুরূদ ও দো‘আ বুঝানো হয়েছে। কেননা, এরপর عَلٰى এরশাদ হয়েছে। যখন صلوٰة - এর পর عَلٰى আসে, তখন সেটা দো‘আ ও রহমত অর্থে ব্যবহৃত হয়; পারিভাষিক নামায অর্থে হয় না।

আর প্রকাশ থাকে যে, সূরা-ই ফাতিহা ও তিলাওয়াত-ই ক্বোরআন পারিভাষিক নামাযের রুকন; দো‘আর নয়। দো‘আর জন্য তো আল্লাহর হামদ ও দুরূদ শরীফ থাকা চাই। যেহেতু ‘জানাযা’র নামায বাস্তবাকিপক্ষে দো‘আই, পারিভাষিক নামায নয়, সেহেতু তাতে ক্বোরআন তিলাওয়াত কীভাবে? এ কারণে তা’তে রুকূ’-সাজদাহও নেই। আর তা’তে মৃতকে সামনে রাখা হয়।

দলীল নং-২.

হাদীস-১. ‘মুআত্তা-ই ইমাম মালিক’-এ ইমাম নাফি’-এর সূত্রে বর্ণিত, তিনি হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন-

اِنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ لَايَقْرَأُ فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

অর্থ: সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর জানাযার নামাযে ক্বোরআন তিলাওয়াত করতেন না। [ফাত্হুল ক্বাদীর]

হাদীস নং-২.

এ-ই ‘মুআত্তা-ই ইমাম মালিক’-এ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত-

عَمَّنْ سَأَلَ اَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ يُصَلِّىْ عَلَى الْجَنَازَةِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَنَا لَعَمْرُكَ اُخْبِرُكَ اَتْبَعُهَا مِنْ عِنْدِ اَهْلِهَا فَاِذَا وُضِعَتْ كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهٖ ثُمَّ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ اَمَتِكَ كَانَ يَشْهَدُ الْخ (فتح)

অর্থ: তাঁরই নিকট থেকে বর্ণিত, যিনি হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তিনি জানাযার নামায কিভাবে পড়েন? তদুত্তরে তিনি বলেন, তোমার জীবনের শপথ! আমি তোমাকে বলছি- আমি মৃতের ঘর থেকে তার সাথে যাই। যখন মৃতকে রাখা হয়, তখন আমি তাকবীর বলি। আর আল্লাহর হামদ, তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দুরূদ শরীফ আরয করি, তারপর এ দো‘আ পড়ি, ‘হে আল্লাহ! এটা তোমার

বান্দা, তোমার অমুক বান্দা ও বান্দেনীর পুত্র, তাওহীদ ও রিসালতের সাক্ষ্য দিতো।...[ফাত্হুল ক্বাদীর]

গভীরভাবে চিন্তা করুন, হযরত আবূ হোরায়রার বর্ণিত নামাযে জানাযায় হাম্দ; দুরূদ ও দো'আর উল্লেখ তো রয়েছে; কিন্তু তিলাওয়াতে ক্বোরআনের উল্লেখ একেবারে নেই। বুঝা গেলো যে, সম্মানিত সাহাবা-ই কেরাম জানাযার নামাযে ক্বোরআন থেকে তিলাওয়াত করতেন না।

হাদীস নং- ৩ ও ৪

ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে বর্ণনা করেছেন-

قَلَ قَالَ رَسُوْلُاللهِ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ اِذَاصَلَّيْتُمْ عَلَىالْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُالدُّعَاءَ

অর্থ: রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির উপর জানাযার নামায পড়ো, তখন তার জন্য বিশেষ দো'আ করো।

আমরা এ হাদীসের অর্থ এটা করি যে, 'যখন তোমরা মৃতের উপর নামায পড়ে নাও, তখন অন্তরের নিষ্ঠার সাথে তার জন্য দো'আ প্রার্থনা করো!' এ থেকে জানাযার নামাযের পর দো'আ করার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়; কিন্তু ওহাবীগণ এর অর্থ করে- 'যখন তোমরা মৃতের উপর নামায পড়ো, তখন নামাযে খাঁটি দো'আ করো।'

তাদের এ অর্থ থেকে বুঝা যায় যে, জানাযার নামাযে তিলাওয়াতে ক্বোরআন নেই; শুধু দো'আ আছে। 'খালিস' বা খাঁটিও তাকেই বলা হয়, যাতে অন্য কোন জিনিস মিশ্রিত হয় না। সুতরাং তাদের মতে অর্থ দাঁড়ায়, যেমন নামাযগুলোতে তিলাওয়াত, রুকূ', সাজ্দাহ্, আত্তাহিয়্যাত এবং দো'আ ইত্যাদি সব কিছু হয়, কিন্তু এ জানাযার নামাযে দো'আ ব্যতীত কিছুই রইলোনা। হামদ ও দুরূদ এ দো'আর অনুগামী। এটা দো'আর নিয়মাবলীতে রয়েছে। মোটকথা, এ হাদীস শরীফ তাদের কৃত অর্থের ভিত্তিতে তাদের বিপরীত এবং হানাফীদের সমর্থন করে।

হাদীস নং- ৫-১৬.

'আয়নী শরহে বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫৮, 'বা-বু ক্বিরাআতিল ফাতিহাতি 'আলাল জানাযা'য় নিম্নে বর্ণিত হাদীসগুলো রয়েছে-

وَمِمَّنْ كَانَ لاَيَقْرَأُ فِى الصَّلٰوةِ عَلَى الْجَنَازَةِ وَيُنْكِرُ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ وَعَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ وَمِنَ التَّابِعِيْنَ عَطَاءٌ وَطَاؤُسٌ وَسَعِيْدٌ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِىُّ وَالْحَكَمُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَبِهٖ قَالَ مُجَاهِدٌ وَحَمَّادٌ وَالثَّوْرِىُّ وَقَالَ مَالِكٌ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ لَيْسَتْ مَعْمُوْلاً بِهَا فِىْ بَلَدِنَا فِىْ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ

অর্থ: এবং যেসব হযরত জানাযার নামাযে ক্বোরআন তিলাওয়াত করতেন না এবং সেটা করতে যাঁরা অস্বীকৃতি জানাতেন, তাঁদের মধ্যে সর্ব হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আলী ইবনে আবূ তালেব, ইবনে ওমর ও হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রয়েছেন। আর তাবে'ঈদের মধ্যে রয়েছেন- হযরত আত্বা, ত্বাঊস, সা'ঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, সা'ঈদ ইবনে জুবায়র, ইমাম শা'বী এবং হাকাম। ইবনুল মুনযির বলেন, এ অভিমত মুজাহিদ, হাম্মাদ ও সওরীর। ইমাম মালিক বলেন, আমাদের শহর (মদীনা মুনাওয়ারা)'য় জানাযার নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার প্রয়োজন নেই।

যুক্তির দাবীও হচ্ছে এযে, জানাযার নামাযে তিলাওয়াত-ই ক্বোরআন না করা হোক। কেননা, আম নামাযগুলোতে যেমন ক্বোরআনের তিলাওয়াত রুক্ন, তেমনি সেগুলোতে রুকূ', সাজদাহ্ ও আত্তাহিয়্যাতে বসাও রুক্ন। আর এ নামাযগুলোতে কবর, মৃত ব্যক্তি অথবা কোন জীবিত মানুষের মুখ (চেহারা) মুসল্লীর সামনে থাকা হারাম। জানাযার নামাযে রুকূ', সাজদাহ্ ও আত্তাহিয়্যাত তো নেই, তদুপরি এ নামায 'মৃত'কে সামনে রেখে সম্পন্ন করা হয়। সুতরাং বুঝা গেলো যে, এ নামায বাস্তবিকপক্ষে দো'আ। আর দো'আর মধ্যে হামদ ও দুরূদ শরীফতো আছে; কিন্তু ক্বোরআনের তিলাওয়াত নেই। সুতরাং জানাযার নামাযে তিলাওয়াতও নেই। ওহাবী লা-মাযহাবীদের উচিৎ যখন তারা জানাযার নামাযে তিলাওয়াত করে, তখন রুকূ'-সাজদাও করা। পাঞ্জাবে জানাযার নামায আরম্ভ হবার সময় এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে নিয়্যত স্মরণ করিয়ে দেয়।

জানাযার নামায হচ্ছে ফরয-ই কেফায়া, আল্লাহ তা'আলার জন্য সানা (প্রশংসা), নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য দুরূদ এবং উপস্থিত মৃতের জন্য দো'আ, কা'বা শরীফের দিকে মুখ করা ইমামের পেছনে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, আম মুসলমান জানাযার নামাযকে হামদ, দুরূদ ও দো'আর সমষ্টিকেই মনে করে; সেটাকে প্রচলিত পঞ্জেগানা নামায মনে করে না। মোটকথা, জানাযার নামাযে ক্বোরআন তেলাওয়াত নিষিদ্ধ।

---০---

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

[এ মাসআলার বিপক্ষে আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন]

এ পর্যন্ত আমাদের নিকট যে পরিমাণ আপত্তি এসেছে, সেগুলোর খন্ডন আরয করছি। পরবর্তীতে যদি আরো আপত্তি আসে, তবে সেগুলোর জবাবও ইনশা-আল্লাহ, পরবর্তী সংস্করণে দেওয়া হবে।

আপত্তি নং -১.

'মিশ্কাত শরীফ: বাবে নামাযে জানাযা'য় বোখারী শরীফের বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে-

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ لِتَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ

অর্থ: হযরত ত্বালহা ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে 'আওফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের পেছনে এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়েছি। তখন তিনি সূরা ফাতিহা পড়েছেন। আর বলেছেন, আমি এটা এ জন্য পড়েছি যে, তোমরা জানতে পারো যে, এটা সুন্নাত।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত-ই রসূলুল্লাহ্ এবং সাহাবীদের আমল।

খন্ডন.

এ হাদীস শরীফ থেকে একথা মোটেই প্রমাণিত হয় না যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। এটাও কয়েকটা কারণে:

এক. এ রেওয়ায়তে একথা আসেনি যে, হযরত ইবনে আব্বাস জানাযার নামাযের অভ্যন্তরে সূরা ফাতিহা পড়েছেন; বরং প্রকাশ থাকে যে, তিনি হয়তো নামাযের পর এটা মৃতের জন্য ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে পড়েছেন; যেমনটি فَقَرَأَ-এর ف থেকে বুঝা যায়; কেননা, ف - تعقيب -এরই [যা 'তারপর' বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়]।

দুই. যদি একথা মেনেও নেওয়া হয় যে, নামাযের ভিতরেই পড়েছেন, তখন একথা বুঝা যায় না যে, কোন তাকবীরের পর পড়েছেন।

তিন. যদি নিজ তরফ থেকে কোন তাকবীরও সাব্যস্ত করে নাও, তবুও একথা বুঝা যায় না যে, সে তা হামদের নিয়্যতে পড়েছেন, না তিলাওয়াতের নিয়্যতে পড়েছেন। দো'আর নিয়্যতে তিলাওয়াত করাকে আমরাও জায়েয বলি।

চার. তিনি সূরা ফাতিহা পড়লে উপস্থিত সমস্ত সাহাবী ও তাবে'ঈ খুব আশ্চর্যবোধ করলেন। এ কারণেই তো তিনি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলেছেন, 'আমি এ আমল এ জন্য করেছি যেন তোমরা জেনে নাও যে, এটা সুন্নাত। বুঝা গেলো যে, সাহাবা-ই কেরাম না তা পড়তেন, না সেটাকে সুন্নাত বলে জানতেন। এ জন্য তাঁকে এটা ওযর হিসেবে বলতে হয়েছে।

পাঁচ. তিনি একথা বলেন নি যে, এটা সুন্নাত-ই রসূল; বরং আভিধানিক অর্থে সুন্নাত বলেছেন। অর্থাৎ এটাও একটা নিয়ম বা পদ্ধতি। অর্থাৎ দ্বিতীয় সানা ও দো'আর পরিবর্তে সূরা ফাতিহা পড়ে নেওয়া হবে। আমরাও এটাই বলে থাকি।

ছয়. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা কোথাও প্রমাণিত হয়নি যে, তিনি জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়েছেন।

সাত. সাইয়্যেদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ব্যতীত কোন সাহাবী থেকে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া প্রমাণিত নয়; বরং না পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়; যেমনটি আমি প্রথম পরিচ্ছেদে আরয করছি। সুতরাং 'ফাত্হুল ক্বাদীর'-এ আছে-

وَلَمْ تَثْبُتْ لِلْقِرَاءَةُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে জানাযায় ক্বিরআত প্রমাণিত নয়।

মোটকথা, এ হাদীস থেকে জানাযায় 'সূরা ফাতিহা' পড়া মোটেই প্রমাণিত হতে পারে না, কেননা এটা একেবারে 'মুজমাল' (অবিস্তারিত), যা'তে অনেক তাফসীরের সম্ভাবনা রয়েছে।

আপত্তি নং-২.

মিশকাত শরীফ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহয় হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণিত-

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থ: নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানাযার উপর সূরা ফাতিহা পড়েছেন।

বুঝা গেলো যে, জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাত।

খন্ডন

এর কয়েকটা জবাব দেওয়া যায়-

এক. এ হাদীস সহীহ্ নয়। কেননা, এর সনদে ইব্রাহীম ইবনে ওসমান ওয়াসেত্বী রয়েছেন, যিনি মুহাদ্দিসদের মতে 'মুনকারুল হাদীস' পর্যায়ের বর্ণনাকারী। সুতরাং তিরমিযী শরীফে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখা হয়েছে-

قَالَ اَبُوْ عِيْسى حَدِيْثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ حَدِيْثٌ لَيْسَ اِسْنَادُهٗ ذٰلِكَ الْقَوِىِّ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عُثْمَانَ هُوَ اَبُوْشَيْبَةَ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ

অর্থ: ইমাম আবূ ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এ হাদীস সনদ অনুসারে শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য) নয়। ইব্রাহীম ইবনে ওসমান 'মুন্কারুল হাদীস'। [হাদীস শাস্ত্রে অনির্ভরযোগ্য]

দুই. ইমাম আবূ দাঊদ এ হাদীস বর্ণনা করেননি; বরং তিনি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদীসকে 'মাওক্বুফ' (সাহাবীর) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। মিশকাত প্রণেতা ভুল বশত: ইমাম আবূ দাঊদের নাম নিয়েছেন। [মিরক্বাত]

তিন. যদি এ হাদীস শরীফকে সহীহ্ বলে মেনেও নিই, তবুও তা দ্বারা জানাযার নামাযের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া প্রমাণিত হয় না। হতে পারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নামাযের আগে কিংবা পরে মৃতের রূহে ঈসালে সাওয়াবের জন্য সূরা ফাতিহা পড়েছেন। এখানে সেটার বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এ হাদীসের ব্যাখ্যায় 'আশি'আতুল লুম'আত'-এ আছে-

واحتمال دارد كه برجنازه بعد از نماز يا پيش ازان بقصد تبرك خوانده باشد - چنانكه الان متعارف است

অর্থ: এটারও সম্ভাবনা আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জানাযার নামাযের পূর্বে কিংবা পরে, জানাযার উপর বরকতের জন্য পড়েছেন; যেমনটি বর্তমানেও সেটার প্রচলন রয়েছে।

মোটকথা, এ হাদীসে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করার প্রমাণ মোটেই নেই। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে- আহলে হাদীস সম্প্রদায় আমাদের থেকে বৈধ হওয়া ও মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণ করার জন্য অতিমাত্রায় খাঁটি ও বিশুদ্ধ টাকশালী হাদীস দাবী করে, আর নিজেরা 'ওয়াজিব হওয়া' প্রমাণ করার জন্য এমন 'মুজমাল', 'মুনকার' ও 'দুর্বল (দ্ব'ঈফ) হাদীসগুলো পেশ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা ইন্সাফের সামর্থ্য দান করুন!

আপত্তি নং-৩.

যখন আপনারা (হানাফীগণ) জানাযার নামাযকে 'নামায' বলেন, তখন আপনারা তাতে সূরা ফাতিহা পড়াকেও ওয়াজিব বলে মেনে নিন। হাদীস শরীফে আছে-

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (সূরা ফাতিহা ব্যতীত কোন নামায নেই)। জানাযার নামাযও নামায। সুতরাং এটাও সূরা ফাতিহা ব্যতীত শুদ্ধ না হওয়া চাই।

খন্ডন

এর দু'টি জবাব রয়েছে- একটি 'ইলযামী' অপরটি তাহক্বীক্বী। (যথাক্রমে প্রশ্নের ভিত্তিতে পাল্টা প্রশ্নস্বরূপ এবং বিশ্লেষণধর্মী)। প্রথমোক্ত জবাব হচ্ছে-তাহলে হে লা-মাযহাবীরা! আপনারা জানাযার নামাযে রুকূ', সাজদাও করুন; কেননা, নামাযগুলোতে এগুলোও ফরয। আর শেষোক্ত জবাব হচ্ছে- জানাযার নামায নামায নয়; বরং দো'আ। সেটাকে নামায শুধু এজন্য বলা হয় যে, তাতে নামাযের কিছু পূর্বশর্ত পালিত হয়। যেমন- ওযূ, ক্বেবলামুখী হওয়া। যদি এটা নামায হতো, তবে তাতে মৃত ব্যক্তিকে কখনো সম্মুখে রাখা হতো না।

---o---

পরিশিষ্ট

।। এক ।।

ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সংক্ষিপ্ত জীবনী

গায়র-মুক্বাল্লিদ ওহাবী সম্প্রদায়টি হযরত ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঘোর শত্রু। তারা তাঁর মাসআলাগুলো থেকে খুঁত বের করার অপপ্রয়াস চালায় এবং সেগুলো নিয়ে ঠাট্টা-মজাক করার ধৃষ্টতা দেখায়। তাদের ধৃষ্টতা এতটুকুতে গিয়ে দাঁড়ায় যে, তাদের কোন কোন হতভাগা লোক ইমাম-ই আ'যমের জন্ম তারিখ (৮০ হি.) থেকে আবজাদের হিসাবানুসারে سگ (কুকুর) এবং ওফাতের তারিখ (১৫০হি.) থেকে بوكم جهن پاك (বূ-কমে জাহানে পাক) লিখেছে। না'ঊযুবিল্লাহ্। অবশ্য, হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণও এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। তাঁদের কেউ বলেছেন, وهابى (ওহাবী) ও گ বা (শকুন)-এর সংখ্যা এক ও অভিন্ন। যেমন وهابى শব্দের সংখ্যা হয় ২৪ আর گد (বা শকুন) শব্দের সংখ্যাও দাঁড়ায় ২৪। 'শকুন'ও মৃত খায় আর এসব লা-মাযহাবী ওহাবীও (ইমাম-ই আ'যমসহ) বুযুর্গদের বদনাম ও গীবৎ করে। এমন লোকদের এ অপকর্মকে ক্বোরআন-ই পাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার নামান্তর সাব্যস্ত করা হয়েছে।

তাছাড়া স্মর্তব্য যে, وهابى (ওহাবী)'র সংখ্যাও ২৪, چوهے (ইদুঁর)-এর সংখ্যাও ২৪। ওহাবীরা ইঁদুরের মতো দ্বীনে কাটছাঁট করার সবসময় অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে। গীবৎ করে শকুনের মত মৃতের মাংস খায়। লা-মাযহাবী ওহাবীদের এ অশালীন মন্তব্য ও অপপ্রচারের ফলে আমিসহ প্রত্যেক হানাফী তথা সত্যিকারের মুসলমানের অন্তরে দুঃখ পায়।

সুতরাং ইমাম-ই আ'যম-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর গুণাবলী মুসলমানদের শুনাতে ও জানাতে মন চাচ্ছে। হয় তো মহান রব ওইসব বুযুর্গের প্রশংসাকে আমার গুনাহ্গুলোর কাফ্ফারা করে দেবেন আর আমাকে ওইসব বুযুর্গের গোলামদের মধ্যে হাশর নসীব করবেন। ওহে মুসলমান, নিজের ইমামের গুণাবলী দেখুন এবং ঈমান তাজা করুন!

নাম ও বংশ পরিচয়

হযরত ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফার নাম শরীফ নো'মান ইবনে সাবিত ইবনে যাওত্বী। হযরত যাওত্বী অর্থাৎ ইমাম-ই আ'যমের দাদা পারস্যে এক অভিজাত বংশের লোক। তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অকৃত্রিম আশেক্ব ছিলেন এবং তাঁর দরবারের খাস ও নৈকট্যধন্য ছিলেন। তাঁরই ভালবাসার কারণে তিনি কূফায় বসবাস করতে থাকেন, যা হযরত আলী মুরতাদ্বার রাজধানী ছিলো। হযরত যাওত্বী তাঁর সন্তান হযরত সাবিতকে, তাঁর শৈশবে হযরত আলী মুরতাদ্বার নিকট দো'আর জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আলী মুরতাদ্বা সাবিতের জন্য দো'আ করলেন এবং অনেক বরকত বা কল্যাণের সুসংবাদ দিলেন। হযরত ইমাম-ই আ'যম হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুরই কারামত ও সুসংবাদের বাস্তবরূপ। (আলহামদু লিল্লাহ্!)

হযরত ইমাম আবূ হানীফা ৮০ (আশি) হিজরীতে কূফায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে বাগদাদে ওফাত পান। আর এখানে 'খায়যুরান' কবরস্থানে দাফন হন। তাঁর মাযার শরীফ অগণিত আম ও খাস লোকের যিয়ারতস্থল। তিনি সত্তর বছর হায়াত পান।

হযরত ইমাম-ই আ'যম অনেক সাহাবী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-এর যমানা পেয়ে ধন্য হন। তন্মধ্যে তিনি চারজন সাহাবীর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করেছেন। তাঁরা হলেনঃ **এক.** হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু), যিনি বসরায় ছিলেন, **দুই.** হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী আওফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, যিনি কূফায় বসবাস করতেন, **তিন.** হযরত সুহায়ল ইবনে সা'দ সা-'ইদী, যিনি মদীনা মুনাওয়ারায় থাকতেন এবং **চার.** হযরত আবূ ত্বোফাইল 'আমির ইবনে ওয়া-সিলাহ্, যিনি মক্কা-ই মুকার্‌রমায় থাকতেন। এ প্রসঙ্গে আরো বহু বর্ণনা রয়েছে; কিন্তু এটাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও প্রণিধানযোগ্য বর্ণনা।

ইমাম-ই আ'যম হযরত হাম্মাদের যোগ্যতম ছাত্র এবং হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খাস শাগরিদ ও খাস সঙ্গধন্য ছিলেন। দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ তিনি হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর একান্ত সান্নিধ্যে র'য়ে ধন্য হন। হযরত ইমাম-ই আ'যমকে বাদশাহ্ মানসূর কূফা থেকে বাগদাদে নিয়ে আসেন। অতঃপর তাঁকে প্রধান বিচারপতি (ক্বা-দ্বিউল ক্বুদ্বাত)-এর পদ অলংকৃত করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এজন্য বাদশাহ্ তাঁকে বন্দি করে জেলে পাঠিয়েছিলেন। এ বন্দিদশায়ই এ মহান ইমাম শাহাদত বরণ করেন। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

ইমাম-ই আ'যমের গুণাবলী

বাস্তবিক পক্ষে ইমামে আ'যমের ফযীলত বা গুণাবলী গণনা করে লিপিবদ্ধ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে। হযরত ইমাম-ই আ'যম হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জীবন্ত মু'জিযা এবং আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অম্লাণ কারামত। তিনি হলেন উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর চেরাগ (প্রদীপ) ও দ্বীনী সমস্যাবলীর সমাধানদাতা। আল্লাহরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। সুন্নী হানাফীরা অতিমাত্রায় সৌভাগ্যবান। আমাদের রসূল হলেন 'রসূল-ই আ'যম'। (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম), আমাদের পীর-মুর্শিদ হলেন গাউস-ই আ'যম, (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) আর আমাদের ইমাম হলেন 'ইমাম-ই আ'যম' (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)। 'আযমত ও ইয্যাত' (মহত্ব ও সম্মান) আমাদের ভাগ্যেই রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে বরকত হাসিলের জন্য আমি ইমাম-ই আ'যমের কয়েকটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার প্রয়াস পাচ্ছি। হানাফীরা পড়ুন, দেখুন, আর খুশী ও আনন্দে পুলকিত হোন!

এক. আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম-ই আ'যম সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং তাঁর গুণাবলী অতি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে, ইমাম ত্বাবরানী হযরত ইবনে মাস'ঊদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে আর আবূ নু'আয়ম, শীরাযী ও ত্বাবরানী হযরত ক্বায়স ইবনে সাবিত ইবনে ওবাদাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

لَوْكَانَ الْاِيْمَانُ عِنْدَالثُّرَيَّالَتَنَاوَلَه رِجَالٌ مِّنْ اَبْنَاءِ فَارِسَ وَفِىْ رِوَايَةِ الْبُخَارِىِّ وَمُسْلِمٍ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه لَوْكَانَ الدِّيْنُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّالَتَنَاوَلَه رَجُلٌ مِّنْ فَارِس

অর্থাৎ "যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের নিকটও থাকতো, তবে পারস্যের সন্তানদের কিছুলোক তা সেখান থেকে নিয়ে আসতো।" বোখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, "ওই মহান সত্ত্বার শপথ, যাঁর ক্বুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যদি দ্বীন-ই ইসলাম সুরাইয়া নক্ষত্রের সাথে ঝুলন্ত থাকে, তাহলে পারস্যের এক ব্যক্তি তা নিয়ে আসবে।"

বলুন, পারস্য-বংশোদ্ভূতদের মধ্যে ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা নো'মান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর এ শান বা মর্যাদার আর কে আছে? গোটা

পারস্যে তাঁর মতো আর কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। সুতরাং এ ভবিষদ্বাণী তাঁরই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দুই. আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি হযরত ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রশংসায় একটি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখেছেন। সেটার নাম 'খায়রাতুল হিসান ফী তরজমাতি আবী হানীফাতান্ নো'মান।' তাতে তিনি একটি হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেছেন। ওই হাদীস শরীফে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

تُرْفَعُ زِيْنَةُ الدُّنْيَا سَنَةَ خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ

অর্থাৎ "দেড়শ' হিজরীতে দুনিয়ার সৌন্দর্য তুলে ফেলা হবে।" ১৫০ হিজরীতে ইমাম-ই আ'যমের ওফাত শরীফ।

বুঝা গেলো যে, ইমাম-ই আ'যম হলেন শরীয়তের দুনিয়ার শোভা, শরীয়তের আলো এবং ইল্ম ও আমলের সৌন্দর্য (সাজসজ্জা) ছিলেন। ইমাম কারদারী বলেছেন, "এ হাদীস শরীফ দ্বারা ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।"

তিন. হযরত ইমাম-ই আ'যম ইসলামী দুনিয়ার ওই প্রথম আলিম-ই দ্বীন, যিনি ফিক্বহ্ ও ইজতিহাদের বুনিয়াদ রেখেছেন এবং এর মাধ্যমে রসূলে পাকের উম্মতের উপর বড় ইহসান করেছেন। অন্য সব ইমাম, যেমন- ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল প্রমুখ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম এ ভিতের উপর ইমারত প্রতিষ্ঠা করেছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ইসলামে যে ব্যক্তি উত্তম পন্থা আবিস্কার করবে সে নিজেরও সাওয়াব পাবে এবং তদনুযায়ী সব আমলকারীর সাওয়াবও পাবে।"

চার. হযরত ইমাম-ই আ'যম সমস্ত ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিসের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ওস্তাদ। এসব হযরত ইমাম-ই আ'যমের শাগরিদ (শীষ্য)। সুতরাং ইমাম শাফে'ঈ হলেন ইমাম মুহাম্মদ (আলায়হিমার রাহমাহ)'র সৎপুত্র ও তাঁর ছাত্র। অনুরূপ, ইমাম মালিক ইমাম-ই আ'যমের লিখিত কিতাবাদি পাঠ-পর্যালোচনা করে উপকৃত হয়েছেন। অনুরূপ ইমাম বোখারী মুহাদ্দিসগণের ওস্তাদ একথা সত্য; কিন্তু ইমাম বোখারীর বহু ওস্তাদ ও শায়খ হলেন হানাফী। জ্ঞানাকাশের সূর্য যেন ইমাম-ই আ'যম, আর অবশিষ্ট ইমাম ও আলিমগণ হলেন তারকারাজি।

পাঁচ. ইমাম-ই আ'যমের প্রত্যক্ষ শাগরিদ এক লক্ষেরও বেশী। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ হলেন মুজতাহিদ। যেমন-ইমাম আবূ ইয়ূসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যোফর, ইমাম

ইবনে মুবারক, যাঁরা হলেন জ্ঞান-জগতের উজ্জ্বল তারকারাজি। হযরত ইমাম মুহাম্মদ নয়শ' নব্বইটি দ্বীনী শানদার কিতাব প্রণয়ন করেছেন; ওইগুলোর মধ্যে ছয়টি কিতাব অতি উঁচু মানের। ওইগুলোকে 'যা-হিরুর রেওয়াত কিতাবাদি' বলা হয়। আর এগুলোকে ফিক্বহ শাস্ত্রের মূল কিতাব হিসেবে মানা হয়।

ছয়. সমস্ত নবীর সরদার হলেন চারজন নবী, আসমানী কিতাবগুলোর সরদার হচ্ছে চারটি কিতাব, ফেরেশতাদের সরদার হলেন চারজন ফেরেশতা, সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে উত্তম ও উচুঁতম পর্যায়ের হলেন চার ইয়ার, মুজতাহিদ আলিমদের মধ্যে উত্তম হলেন চার ইমাম। বস্তুতঃ ওই চারজন নবীর মধ্যে হুযূর-ই আক্রাম হলেন সর্বাধিক মর্যাদাবান, চারটি কিতাবের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে ক্বোরআন-ই মজীদ, চার ফেরেশতার মধ্যে হযরত জিব্রাঈল উত্তম, চার ইয়ারের মধ্যে হযরত আবূ বকর উত্তম আর চারজন ইমামের মধ্যে সর্বোত্তম হলেন ইমাম-ই আ'যম। এ কারণে ইমাম শাফে'ঈ বলেছেন, 'ফক্বীহগণ হলেন ইমাম আ'যম-এর বংশধর'। আর তিনি হলেন সবার পিতা।

সাত. ইমাম-ই আ'যম যেমন ইল্ম বা জ্ঞানাকাশের সূর্য, তেমনি আমলের ময়দানের প্রধান ঘোড়-সাওয়ারও। তা হবেনও না কেন? তিনি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ এশার ওযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর এমন গোপনভাবে রোযা রেখেছেন যে, সে সম্পর্কে কেউ জানতো না। ঘর থেকে খাবার আনতেন। বের হয়ে ছাত্রদেরকে খাইয়ে দিতেন। ঘরের লোকেরা মনে করতেন তিনি বাইরে কোথাও খেয়েছেন। আর বাইরের লোকেরা মনে করতেন যে, তিনি ঘর থেকে খেয়ে এসেছেন। নিয়মিতভাবে রমযান মাসে একষট্টি খতম ক্বোরআন পড়তেন- এক খতম দিনে, এক খতম রাতে আর এক খতম পূর্ণ মাসে তারাবীহর নামাযে, মুক্বতাদীদের সাথে নিয়ে। তিনি পঞ্চান্ন বার হজ্ব করেছেন।

আট. ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাযার শরীফ দো'আ কবূল হবার জন্য কষ্টি পাথরতুল্য। সুতরাং ইমাম শাফে'ঈ ক্বুদ্দিসা সির্‌রুহু বলেন, ''যখনই আমার সামনে কোন সমস্যা আসতো, তখন আমি ইরাক শরীফে ইমাম-ই আ'যমের মাযার শরীফে হাযির হতাম। সেখানে দু' রাক'আত নফল নামায পড়ে ইমাম-ই আ'যমের মাযার শরীফের বরকতকে ওসীলা করে দো'আ করতাম। ফলে অতি শীঘ্রই দো'আ কবূল হতো, সমস্যার সমাধান হয়ে যেতো, চাহিদা পূরণ হতো।'' ইমাম শাফে'ঈ যখন ইমাম-ই আ'যমের কবর-ই আন্‌ওয়ারে হাযির হতেন, তখন হানাফী মাযহাবানুসারে নামায পড়তেন, ক্বুনূত-

ই নাযিলাহ্ পড়তেন না। কেউ জিজ্ঞাসা করলেন- এর কারণ কি? তদুত্তরে তিনি বলেন, ''আমি এ মাযার শরীফে যিনি তাশরীফ রাখছেন তাঁর প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন করছি।'' [ফাতাওয়া-ই শামী]

স্মর্তব্য যে, এর অর্থ এ নয় যে, ইমাম শাফে'ঈ ইরাকে এসে ইমাম-ই আ'যমের প্রতি আদব প্রদর্শন করতে গিয়ে সুন্নাত বর্জন করতেন; বরং অর্থ এ যে, কোন ইমাম কিংবা তাঁর অনুসারী নিশ্চয়তার সাথে এ দাবী করেন না যে, আমরাই একমাত্র সত্য ও সঠিক, অন্য ইমাম ও তাঁর মুক্বতাদীগণ ভুলের উপর আছেন; বরং প্রত্যেকের এ ধারণা রয়েছে যে, অন্য ইমামগণও সঠিক পথে আছেন। আক্বাইদের ব্যাপারে প্রত্যেকের ধারণা নিশ্চিত, আর ফিক্বহী মাসআলায় প্রত্যেকের ধারণার বেশীর ভাগ সঠিক হবার পক্ষে। সুতরাং ইমাম শাফে'ঈও এখানে হাযির হয়ে এ ধারণা মতে আমল করেছেন। অর্থাৎ তিনি যেন একথা অবশ্যই মনে করেছেন যে, তাঁর ইজতিহাদ অনুসারে কোন সুন্নাত বর্জন করলেও ইমাম-ই আ'যমের ইজতিহাদ অনুযায়ী যা সুন্নাত, তা অনুসারে তো আমল হচ্ছে। সুতরাং এখানে আপত্তির অবকাশ নেই।

নয়. ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একশ' বার মহামহিম রবকে স্বপ্নে দেখেছেন। সর্বশেষ বারে তিনি যে দো'আটা মহান রবের দরবারে করেছিলেন, আর মহান রবও যে জবাব দিয়েছিলেন তা 'রাদ্দুল মুহতার' (শামী) কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

দশ. উম্মতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)-এর বড় বড় ওলী, গাউস, ক্বুতব, আবদাল, আওতাদ হযরত ইমাম-ই আ'যম (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র দামনের সাথে সম্পৃক্ত, তাঁর মুক্বাল্লিদ। আল্লাহর যত সংখ্যক ওলী হানাফী মাযহাবে রয়েছেন, ততজন অন্য কোন মাযহাবে নেই। সুতরাং হযরত ইব্‌রাহীম ইবনে আদহাম, শাক্বীক্ব বলখী, মা'রূফ করখী, হযরত বায়েযীদ বোস্তামী, ফুদ্বায়ল ইবনে আয়াদ্ব খোরাসানী, দাউদ ইবনে নাসর, ইবনে নাসীর ইবনে সুলায়মান তাঈ, আবূ 'আমিদ লাফ্‌ফাফ খাযরাদী বলখী, খালাফ ইবনে আইয়্যুব, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক ওলী, ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিস, হযরত ওয়াকী' ইবনে জাররাহ্ এবং শায়খুল ইসলাম আবূ বকর ইবনে ওয়াররাক্ব তিরমিযীর মতো ওলীকুলের সরদারগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী; হযরত ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আঁচলের সাথে সম্পৃক্ত। মোটকথা, হানাফী মাযহাব তো ওলীগণের মাযহাব। আজও প্রায় সব ওলীয়ুল্লাহ্ হানাফী। পাক-ভারত উপমহাদেশের গর্ব হযরত দাতা গঞ্জে বখশ্ হাজভীরী, যাঁর আস্তানা শরীফ সৃষ্টির মিলনকেন্দ্র, হানাফী ছিলেন। তিনি আপন কিতাব 'কাশ্‌ফুল

মাহ্জূব'-এ ইমাম-ই আ'যমের বহু ফযীলত (গুণাবলী) কাশ্ফের মাধ্যমে উদ্ঘাটন করে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ, সমস্ত চিশতী, ক্বাদেরী, নক্শ্বন্দী সোহ্রাওয়ার্দী মাশাইখ হানাফী।

এগার. হযরত ইমাম-ই আ'যমের মাযহাব-ই হানাফী বিশ্বে এত বেশী প্রসার লাভ করেছে যে, যেখানে ইসলাম আছে সেখানে হানাফী মাযহাব রয়েছে। হেরমাঈন শরীফাঈনসহ বিশ্বের বেশীরভাগ মুসলমান হানাফী মাযহাবেরই অনুসারী, বরং ইসলামী দুনিয়ার কিছু অঞ্চল এমনও আছে, যেখানে শুধু হানাফী আছে, অন্য মাযহাবগুলো সম্পর্কে অনেক দেশের সাধারণ লোকেরা জানে না বললেও অত্যুক্তি হবে না। যেমন- বলখ, বোখারা, কাবুল, কান্দাহার, প্রায় গোটা ভারত ও পাকিস্তান এবং আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশ- এসব দেশে ও শহরে শাফে'ঈ, হাম্বলী ও মালেকী মাযহাবের অনুসারী দেখাই যায়না। কিছু সংখ্যক গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবী, যারা কোন দিকেরই নয়; 'না ঘর কা, না ঘাট কা', হয়তো কোথাও কোথাও দেখা যায়। তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, তাদের থাকা না থাকার মতোই। ইমাম-ই আ'যমের এমন গ্রহণযোগ্যতা থেকে বুঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারেও মাক্ববূল এবং তাঁর প্রবর্বিত হানাফী মাযহাবও আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত প্রিয়।

বার. ইমাম-ই আ'যমের মাযহাবের অনুসারী নয় এমন অনেকেও ইমাম-ই আ'যমের প্রশংসায় অনেক বড় বড় কিতাব লিখেছেন। সুতরাং আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী 'খায়রাতুল হিসান ফী তারজামাতি আবী হানীফাতান্ নু'মান' লিখেছেন, সিব্ত্ব-ই ইবনে জাওযী 'কিতাবুল ইন্তিসার লি ইমামি আইম্যাতিল আমসার' দু' খণ্ডে লিখেছেন, ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ূত্বী শাফে'ঈ 'তাব্য়ীদ্বুস্ সহীফাহ্ ফী মানাক্বিবি আবী হানীফাহ্' লিখেছেন, আল্লামা ইয়ূসুফ ইবনে আবদিল হাদী হাম্বলী, 'তানভীরুস্ সহীফাহ্ ফী তারজামাতি আবী হানীফাহ্' লিখেছেন, যাতে তিনি ইবনে আবদুল্লাহ্র অভিমতও উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফার মতো আলিম, ফক্বীহ্, মুত্তাক্বী আর দেখিনি। মোটকথা, আল্লাহর দয়াপ্রাপ্ত উম্মত হযরত ইমাম আবূ হানীফা ক্বুদ্দিসা সিররুহুর ফযীলত ও কামাল (গুণ ও পূর্ণতা)'র পক্ষে সাক্ষী রয়েছেন। সুতরাং যদি মুষ্ঠি পরিমাণ লা-মাযহাবী ওহাবী তাঁর শানে প্রলাপ বকে, তাহলে তার কী গুরুত্ব থাকতে পারে? মোটেই না। যদি পেঁচক-বাদুড় সূর্যকে মন্দ বলে, তাহলে সূর্য কালো-অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যাবে না। যেমন আজকাল রাফেযী (শিয়াগণ) সাহাবা-ই কেরামের বিরুদ্ধে তিরস্কার-বিষোদ্গার করে থাকে, তেমনিভাবে গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরা ইমাম-ই আ'যমের প্রতি বিষোদ্গার করার ধৃষ্ঠতা দেখায় বৈ-কি।

তের. সমস্ত মুজতাহিদ ইমামের মধ্যে হযরত ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যুগ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকতর নিকটবর্তী। যেমন- তাঁর জন্ম হয় ৮০ হিজরীতে। তিনি 'তাবে'ঈ'। চারজন সাহাবী-ই রসূলের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে ও তাঁদের থেকে রেওয়ায়ত নিয়েছেন (হাদীস বর্ণনা করেছেন)। সুতরাং যাঁরা তাঁর তাবে'ঈ হবার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে, তারা নিছক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই করেছে। এটা কিভাবে হতে পারে যে, সাইয়্যেদুনা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ আওফার মতো সাহাবী ইমাম-ই আ'যমের যুগে কূফায় তাশরীফ রেখেছেন, আর হযরত ইমাম-ই আ'যম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেননি? আজকাল তো বুযুর্গদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সাধারণ মুসলমানগণ পর্যন্ত দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে পৌঁছে যায়, সাহাবী-ই রসূলের শান যে আরো অনেক উচুঁ, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মোটকথা, তিনি তাবে'ঈই। তিনি সহীহ্ হাদীসসমূহ হুযূর-ই আক্রাম থেকে সাহাবীর মাধ্যমেও পেয়েছেন। তিনি ইসলামের প্রথম তিন উত্তম যুগেরই।

প্রসঙ্গত, চার ইমামের জন্ম ও ওফাতের তারিখ ও বয়স নিম্নরূপঃ

ইমামের নাম	জন্ম সাল	ওফাতের সাল	বয়স	মাযার শরীফ
ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাহিমাতুল্লাহি আলায়হি	৮০ হি.	১৫০ হি.	৭০ বছর	বাগদাদ শরীফ
ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি	৯০ হি.	১৭৯হি.	৮৯ বছর	মদীনা শরীফ
ইমাম শাফে'ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি	১৫০হি. ইমামে আযমের ওফাত দিবসে	২০৪হি.	৫৪ বছর	মিশর
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলায়হি	১৬৪ হি.	২৪১হি.	৭৭ বছর	বাগদাদ শরীফ

চৌদ্দ. হযরত ইমাম-ই আ'যম আলায়হির রাহমাহ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আহলে বায়ত থেকে খাস ফুয়ূয ও বরকাত হাসিল করেন, যা অন্য কোন ইমাম অর্জন করতে পারেন নি। কেননা, ইমাম-ই আ'যম হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মজলিস শরীফে দীর্ঘ দু'বছর যাবৎ

হাযির থাকেন। তিনি নিজেই বলেন, لَوْلَا النُّعْمَانُ لَهَلَكَ অর্থাৎ "যদি ওই দু'টি বছর পাওয়া না যেতো, তাহলে নু'মান অর্থাৎ আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।"

পনর. হযরত ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পূর্ণ প্রকাশস্থল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রথম খলীফা, আর ইমাম-ই আ'যম হুযূর-ই আক্রামের উম্মতের প্রথম মুজতাহিদ। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আক্বার ক্বোরআনের জামি' বা সংকলনকারী, আর ইমাম-ই আ'যম হলেন 'জামি'ই মাসাইল-ই ফিক্বহ্ ও ক্বাওয়া'ইদ-ই দ্বীনিয়্যাহ্' (ফিক্বহ্ শাস্ত্রের মাসআলাদি ও দ্বীনের মৌলিক নিয়মাবলীর একত্রকারী)। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবার হুযূর-ই আক্রামের পর সর্বপ্রথম ন্যায় বিচারের নিয়মাবলী ও খিলাফতের বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন, আর ইমাম-ই আ'যম ইজতিহাদ ও ফিক্বহর বুনিয়াদ স্থাপন করেছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব হুযূর-ই আক্রামের উম্মতকে যথাসময়ে সাহায্য করেছেন, তাদেরকে মতভেদ ও বিক্ষিপ্ততার হাত থেকে রক্ষা করেছেন, আর ইমাম-ই আ'যম মুসলমানদের এত বড় সাহায্য করেছেন যে, তাদেরকে কুফর, ইলহাদ ও যান্দাক্বাহ্ (যথাক্রমে, কুফরী, ইসলামের মুখোশ পরে ইসলামের বিরোধিতা ও মুনাফিক্বী)-এর ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করেছেন। আজ তাঁরই জ্ঞানগত ইজতিহাদের বরকতে মুসলিম উম্মাহ্ কাফির ও মুরতাদ্দদের ফিৎনাদি থেকে রক্ষা পেয়েছে।

ষোল. হুযূর গাউসে আ'যম হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যেমন আল্লাহর সমস্ত ওলীর সরদার, সবার গর্দানের উপর তাঁর কদম শরীফ রয়েছে, সুতরাং তিনি ত্বরীক্বতের প্রধান ইমাম, তেমনি ইমাম-ই আ'যম সমস্ত আলিমের সরদার। ইসলামের সমস্ত আলিম তাঁর ছায়াতলে আছেন। এজন্য তরীক্বতের 'প্রধান ইমাম'-এর উপাধি যেমন 'গাউসে আ'যম' তেমনি শরীয়তের প্রধান ইমামের উপাধি 'ইমাম-ই আ'যম'। সুবহা-নাল্লাহ্।

এক কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

غوث اعظم درميان اولياء : چوں جناب مصفطى درانبياء

অর্থ: গাউসে আ'যম ওলীগণের মধ্যে তেমনি যেমন হুযূর মোস্তফা নবীগণের মধ্যে। বাগদাদ শরীফ মাজমা'উল বাহরাঈন (দু' সমুদ্রের মিলনস্থল)। উভয় ইমামও এখানে আরাম ফরমাচ্ছেন। *

।। দুই ।।

তাক্বলীদের গুরুত্ব

আমি মহান রবের দয়া ও অনুগ্রহক্রমে 'জা-আল হক্ব'-এর প্রথম খন্ডে তাক্বলীদের মাসআলা অতি তাফসীল সহকারে লিখে দিয়েছি, যার খন্ডন আজ পর্যন্ত গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীগণ করতে পারেনি। যদি আগ্রহ থাকে, তবে ওখানে পাঠ-পর্যালোচনা করতে পারেন। এখানে কিতাবের পরিপূর্ণতার জন্য অতি সংক্ষেপে 'তাক্বলীদ'-এর প্রয়োজনীয়তা, তাক্বলীদের উপকারিতা, তাক্বলীদ না করলে কি কি ক্ষতি হতে পারে, এসব বিষয় আরয করা হচ্ছে। মহান রব আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন: আ-মী-ন।

স্মরণযোগ্য যে, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা আলায়হি আফযালুস্ সালাওয়াতি ওয়া আকমালতু তাহিয়্যা-ত'র উম্মতের মধ্যে ওইসব সৌভাগ্যবান বান্দাও রয়েছেন,

---

* অতএব, এসব বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র গুণাবলীর কারণে হযরত আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত হয়। ইমাম-ই আ'যম যেমন শ্রেষ্ঠ, তাঁর মাযহাব (হানাফী মাযহাব)ও শ্রেষ্ঠতম। এর বহুবিধ কারণও রয়েছে। বস্তুতঃ আমাদের হানাফী মাযহাবের একেকটি মাস্আলার উপর একেকটা স্বতন্ত্র বড় পরিসরের কিতাব লেখা যায়, যার পক্ষে দলীলাদিও প্রচুর। মাযহাবের প্রত্যেক ইমামের উদ্দেশ্যও হচ্ছে শরীয়তকে জীবন্ত রাখা; প্রত্যেক ইমাম নিজ নিজ ইল্ম, বুঝশক্তি ও গবেষণা অনুসারে মাসআলা-মাসাইল লিখেছেন। তবে বাস্তবিক পক্ষে ইমাম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দলীলাদি শীর্ষে পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিটি বিষয়ে তিনিই অগ্রগামী বলে প্রমাণিত। তাঁর জ্ঞান তাঁদের মধ্যে ব্যাপকতম বলে সাব্যস্ত হয়। তাঁর বর্ণিত মাসআলাগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। কারণ, দ্বীনী ইল্মকে যদি 'দেহ' কল্পনা করা হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা আলায়হির রাহমাহ্র ইল্মকে বলতে হয় পূর্ণাঙ্গ দেহ, আর অন্যান্য ইমামের ইল্ম হবে দেহের কোন না কোন অঙ্গ মাত্র। অন্য সব ইমামকে যদি চোখের সাথে তুলনা করা হয়, তবে ইমাম-ই আ'যমকে বলতে হবে ওই চোখের মণি। যদি শরীয়তের সমস্ত ইমামকে হাতের পাঞ্জার সাথে তুলনা করা হয়, তবে ইমাম-ই আ'যমকে বলতে হয় ওই পাঞ্জার বৃদ্ধাঙ্গুলী। তাঁরা যদি শরীয়তের জিহবা (রসনা) হন, তাহলে ইমাম-ই আ'যম হবেন ওই রসনার বাক্শক্তি। অন্য ইমামগণ যদি হৃদয় (ক্বলব) হন, তবে ইমাম-ই আ'যম হবেন ওই হৃদয়ের স্পন্দন। অন্য সব ইমাম যদি ফুলের মালা হন, তবে আমাদের ইমাম-ই আ'যম হবেন ওই মালার সুতা। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওয়া আনহুম।

এটাই নিয়ম যে, প্রত্যেক বিষয়ে একজন প্রধান হন। আর দ্বীনী ইলম তথা ফিক্বহ্ শাস্ত্রের 'প্রধান' হলেন ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা। তিনি হলেন সমস্ত ইলমে দ্বীনের মোহনা, ফিক্বহ শাস্ত্রের মূল ব্যক্তি। তা হবেনও না কেন? তিনি তো ইল্মের কোলে লালিত, ইলমের দোলনায় দোল খেয়েছেন, ইলমের দুধ পান করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত অসংখ্য নি'মাত পেয়ে ধন্য হয়েছেন, যুবক হয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের অসাধারণ জ্ঞানরূপ খাদ্য আহার করে। সমস্ত ইমাম ইমাম-ই আ'যম থেকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছেন। [সূত্র. মাক্বামাতে ইমাম-ই আ'যম, কৃত. ইমাম হাফেয উদ্দীন কারদারী আলায়হির রাহমাহ্]

যাঁদের হুযূর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গ (তথা সাহাবী হওয়া)'র সুযোগ হয়েছে। আর তাঁরা তাঁদের কপালের চোখে তাঁদের মহান ইয়ারের দীদার করেছেন। ওইসব হযরত নুবূয়ত-আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র, সমস্ত উম্মতের পথপ্রদর্শক ও ইমাম। তাঁদের সম্পর্কে খোদ্ হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন-

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

অর্থ: আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রগুলোর মতো। তোমরা তাঁদের মধ্য থেকে যার অনুসরণ করবে, হিদায়ত পেয়ে যাবে।

মহান রব তাঁদেরকে আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র সঙ্গের বরকতে পথভ্রষ্ঠতা মন্দ আক্বীদা, পাপাচারিতা, ফাসেক্বী ও গুনাহর কার্যাদি থেকে সংরক্ষিত ও নিরাপদে রেখেছেন। তিনি নিজেই এরশাদ ফরমান-

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا

তরজমা: এবং মহান রব ওই সাহাবীদের উপর খোদাভীরুতার কলেমা অপরিহার্য করেছেন এবং তারা এর উপযোগীও।

অন্যত্র সাহাবা-ই কেরামকে সম্বোধন করে এরশাদ ফরমান-

وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ

তরজমা: হে সাহাবীগণ, কুফর, ফাসেক্বী ও পাপগুলোর প্রতি তোমাদের অন্তরগুলোতে ঘৃণা ঢেলে দিয়েছেন।

আর সমস্ত সাহাবীর সাথে মহান রব জান্নাতী হবার ওয়াদা করেছেন এবং এরশাদ করেছেন - وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى

তরজমা: মহান রব সমস্ত সাহাবীর সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

বরং মহান রব সাহাবীদের জামা'আতকে সমগ্র জাহানের ঈমানের মানদন্ড বলেছেন। অর্থাৎ যাদের ঈমান তাঁদের মতো হবে, তারা মু'মিন (ঈমানদার)। পক্ষান্তরে, যাদের ঈমান তাদের বিপরীত হবে তারা বে-দ্বীন। অতএব, এরশাদ ফরমান- فَاِنْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا

তরজমা: যদি এসব লোক, তোমাদের ঈমানের মতো ঈমান আনে, তবে তারা হিদায়তের উপর থাকবে।

যদি সাহাবা-ই কেরামের ফযীলত ও উচ্চ মর্যাদাগুলো দেখতে চান, তবে আমার কিতাব 'আমীর মু'আভিয়ার পর এক নযর'* পাঠ-পর্যালোচনা করুন। মোটকথা,

* হযরত আমীর মু'আভিয়া সম্পর্কে একটি বিস্তারিত পুস্তিকা 'মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, মহাপরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, সরল বাংলায় লিখেছেন, যা আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট প্রকাশ করেছেন।

হুযূর-ই আক্রামের সুহবৎ (সঙ্গ) মুবারকের বরকতে সাহাবা-ই কেরামের হৃদয় আলোকিত ও বক্ষ শরীফ নূরানী ছিলো। ওইসব হযরত ফরশের উপর 'ক্বুদসী সিফাত' (ফেরেশতাসুলভ গুণাবলী)'-এর ধারক ছিলেন। না তাঁদের মধ্যে দ্বীনী ঝগড়া ছিলো, না একাধিক ফির্ক্বা, না মাযহাবী (আক্বীদাগত) মতবিরোধ, না ছিলো ফিৎনা-ফ্যাসাদ। সুতরাং ওই উত্তম যুগে নিয়ম মাফিক, তাক্বলীদের প্রয়োজনই ছিলো না। তারা সমগ্র জাহানের ইমাম ছিলেন। তাঁরা কার তাক্বলীদ করবেন?

পরবর্তীতে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় ও আক্বীদাগত বিরোধ, ধারণাদির বিক্ষিপ্ততা, বিভিন্ন সমস্যার ছড়াছড়ি, দর্শন ও যুক্তির সংযোগ সৃষ্টি হলো। তখন ওলামা-ই মিল্লাত ক্বোরআন মজীদ ও হাদীস শরীফ থেকে মাসআলাদি অনুমান করলেন। তাঁরা দ্বীন-ই মুহাম্মাদীর শাখা মাস'আলাগুলোকে আয়নার মতো পরিস্কার করে দিলেন। মুসলিম উম্মাহ্ অনুভব করলেন যে, এখন ইমামগণের তাক্বলীদ ব্যতীত উপায় নেই। মোটকথা, পরবর্তী মুসলমানগণ তিন ধরনের হলোঃ সাধারণ জনগণ, আলিম সমাজ ও মুজতাহিদগণ। সাধারণ মানুষ আলিমদের অনুসরণ এবং আলিমগণ মুজতাহিদ ইমামদের তাক্বলীদকে অপরিহার্য ও জরুরী মনে করলেন। এ তাক্বলীদ ও ইজতিহাদ যুগের চাহিদা হিসেবে বিবেচিত হয়ে অপরিহার্য হয়ে গেলো।

এর উদাহরণ এভাবে বুঝে নিন যে, প্রথমত, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োজনের সম্মুখীন হননি, ততক্ষণ পর্যন্ত সাহাবা-ই কেরাম ক্বোরআন মজীদকেও কিতাব (গ্রন্থ)-এর আকারে সংকলন করেননি। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যুগে যখন প্রয়োজন দেখা দিলো, তখন ক্বোরআন-ই মজীদ গ্রন্থাকারে সংকলিত হলো। তারপর, দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলে ক্বোরআনে যের-যবর-পেশ লাগানো হলো। এর আরো বহুদিন পর তাতে রুকূ', সিপারা বিন্যস্থ হলো। কোন সাহাবী হাদীস সংকলন এবং হাদীসের প্রকার ও বিধানগুলো তৈরী করার প্রয়োজন অনুভব করেননি। বোখারী, মুসলিম ইত্যাদি সাহাবা-ই কেরামের যুগের অনেককাল পরের কিতাব।

মোটকথা, দ্বীনের প্রয়োজন বাড়তে লাগলো। সুতরাং ক্রমশ ওইসব জিনিষ তৈরী হতে লাগেলা, এ-ই অবস্থা ইমামগণের তাক্বলীদেরও। যেমন আজকাল একথা বলা যাবে না যে, ক্বোরআনের সংকলন, যের-যবর-পেশ লাগানো ও সিপারা তৈরী করা, ইলমে হাদীস ও হাদীসের কিতাবাদি প্রণয়ন করা বিদ্'আত, এগুলো নবী করীম ও

সাহাবীগণের যুগে ছিলোনা।' তেমনি একথা বলাও বোকামী যে, 'ইমামগণের তাক্বলীদ' ও 'ইলমে ফিক্বহ্' বিদ্'আত, সাহাবীগণের যুগে এর প্রচলন ছিলোনা।' আজ যদি সংকলিত ক্বোরআন এবং বোখারী, মুসলিম জরুরী হয়, তবে ইমামগণের তাক্বলীদও অপরিহার্য। আমি এখানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাক্বলীদের গুরুত্ব-ক্বোরআন, হাদীস, উম্মতের আমল ও যুক্তিসম্মত (عقلی) দলীলাদি দ্বারা প্রমাণ করছি। পড়ুন ও ঈমানকে তাজা করুন! মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

এক.

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

তরজমা: সুতরাং তোমরা যদি না জানো, তাহলে ইল্মসম্পন্নদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

এ আয়াত শরীফ থেকে জানা গেলো যে, দ্বীনী বিষয়ে নিজের মনগড়া কথা সংযোজন করবে না। যে জানে না, তার জন্য জরুরী হচ্ছে, যিনি জানেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা। মুর্খ ব্যক্তি আলিমকে জিজ্ঞাসা করবে, মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তি মুজতাহিদ আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। এরই নাম হচ্ছে তাক্বলীদ।

দুই.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

তরজমা: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো, তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের থেকে নির্দেশদাতা ওলামার (আনুগত্য করো)।

ক্বোরআন করীম অনুসারে আমল করাই হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা, হাদীস শরীফ অনুসারে আমল করা হচ্ছে হুযূর-ই আক্রামের আনুগত্য করা আর ফিক্বহ্ অনুসারে আমল করা হচ্ছে উলিল আমরের আনুগত্য করা। এ তিনটি আনুগত্যই জরুরী। ইমাম রাযী তাফসীর-ই কবীরে বলেছেন, "এখানে 'উলিল আমর' মানে বিজ্ঞ ওলামা-ই দ্বীন; সুলতান বা বাদশাহ্গণ নন। কেননা, বাদশাহ্দের উপর আলিমদের আনুগত্য যে কোন অবস্থাতে জরুরী; কিন্তু আলিমদের উপর বাদশাহ্গণের আনুগত্য সর্বাবস্থায় ওয়াজিব নয়; শুধু ওইসব বিধানে ওয়াজিব, যেগুলো শরীয়তের অনুরূপ হয়। অনুরূপ, হাকিম ও সুলতানগণ বিজ্ঞ আলিমদের থেকে বিধানাবলীর জ্ঞান হাসিল করবেন।

তিন.

اَلسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ

তরজমা: প্রথম অগ্রগামী মুহাজিরগণ ও আনসার আর ওইসব লোক, যারা তাঁদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ্ তাদের উপর রাজি হয়েছেন, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমানদের তিনটি দলের উপর সন্তুষ্ট: মুহাজিরগণ, আনসার এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুসরণ ও তাক্বলীদকারী মুসলমানগণ। গায়র মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী) লোকেরা এ তিন দল থেকে খারিজ। কেননা, তারা না মুহাজির-সাহাবী, না আনসারী এবং না তাঁদের মুক্বাল্লিদ। তাদের মতে তো তাক্বলীদ করা শির্ক।

চার. وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ

তরজমা: তারই পথে চলো, যে আমার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপরিহার্য হলো-আল্লাহর দরবারে মাক্বূল বান্দাদের রাস্তা অবলম্বন করা। ইমাম চতুষ্ঠয় আল্লাহর মাকবূল বান্দা, আর সমস্ত ওলী, ওলামা, নেক্কার বান্দাগণ, মু'মিন-মুসলমানগণ তাঁদের মুক্বাল্লিদ। সুতরাং তাক্বলীদ হচ্ছে আল্লাহর মাক্ববূল বান্দাদের রাস্তা। পক্ষান্তরে, গায়র মুক্বাল্লিদ হওয়া ও ওহাবী হওয়া হলো মারদূদ (আল্লাহর দরবার থেকে ধিক্কৃত) লোকদের রাস্তা।

পাঁচ.

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

তরজমা: হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

বুঝা গেলো যে, শুধু আমাদের তাক্বওয়া-পরহেযগারী ক্ষমা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। পরহেযগারীর পথে নেক্কার লোকদের সঙ্গও অপরিহার্য; অন্যথায় পথিমধ্যে ডাকাতীর শিকার হবার আশংকা রয়েছে। চার ইমাম উত্তম ও নেক্কার। আর উম্মতের সব ভাল লোকেরা তাক্বলীদ করেছেন। সমস্ত ওলী, আলিম, মুহাদ্দিস, মুফাস্সির মুক্বাল্লিদ হিসেবে জীবন যাপন করে যান। গায়র-মুক্বাল্লিদ (লা-মাযহাবী)গণের মধ্যে যদি কোন ওলী থাকে। তাহলে দেখাও! গাছের যে শাখায় ফল, ফুল ও পাতা-পল্লব জন্মে না, তা চুলায় জ্বালানোর উপযোগী হয়। কেননা, সেটার সম্পর্ক শিখড়ের সাথে ছিন্ন হয়ে গেছে। অনুরূপ, যে দলের মধ্যে আল্লাহর ওলীগণ থাকেন না, ওই দল দোযখের উপযোগী। কেননা, সেটার সম্পর্ক হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে ছিন্ন হয়ে গেছে।

ছয়.

اِهْدِنَاالصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

তরজমা: আমাদেরকে চালাও সরল-সোজা পথে, তাঁদেরই পথে, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো ।

এ থেকে বুঝা গেলো যে, সোজা পথের পরিচয় হচ্ছে- সেটার উপর আল্লাহর ওলীগণ ও নেক্কার লোকেরা রয়েছেন । দেখুন সমস্ত ওলী ও নেক্কার লোক মুক্বাল্লিদ । হুযূর গাউসে পাক, খাজা আজমীরী, খাজা বাহাউদ্দীন নক্বশ্বন্দ, ইমাম তিরমিযী প্রমুখের মতো বুযুর্গগণ মুক্বাল্লিদ ছিলেন । সুতরাং তাক্বলীদ হচ্ছে সোজা জান্নাতের রাস্তা, পক্ষান্তরে, ওহাবিয়াত ও গায়র মুক্বাল্লিদিয়াত হচ্ছে বাঁকা রাস্তা, যা দোযখ পর্যন্ত পৌঁছাবে ।

সাত.

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ

তরজমা: যে কেউ হিদায়ত প্রকাশ পাওয়ার পর রসূলের বিরোধিতা করে আর মুসলমানদের রাস্তা ব্যতীত অন্য রাস্তা অবলম্বন করে, যেখানে সে ফিরে যাবে, আমি তাকে সেদিকে ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে দোযখে পৌঁছাবো ।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যে শাস্তি হুযূর-ই আক্বরামের বিরোধিতাকারী কাফিরদের জন্য অবধারিত, ওই শাস্তি এ কলেমাগো বে-দ্বীনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যারা মুসলমানদের রাস্তা ত্যাগ করে নিজের দেড় ইটের মসজিদ পৃথক করে নির্মাণ করে ।

তাক্বলীদ হচ্ছে আম মুসলমানদের রাস্তা, গায়র মুক্বাল্লিদ এসব থেকে পৃথক । তারা যেন নিজেদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে নেয় ।

আট.

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

তরজমা: অনুরূপ, আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মত করেছি, যাতে তোমরা লোকদের উপর সাক্ষী হও, আর রসূল হন তোমাদের সাক্ষী ।

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলমান মহান রবের, দুনিয়া ও আখিরাতে সাক্ষী । যে ব্যক্তি অথবা যে রাস্তা, অথবা যে মাসআলাকে আম মুসলমান ভাল বলবে, তা বাস্তবিপক্ষে ভাল; আর যাকে মন্দ বলে, তা বাস্তবিকপক্ষে মন্দ । দেখুন মুসলমানগণ তাক্বলীদকে ভালবাসে, তারা নিজেরা মুক্বাল্লিদ । আর গায়র মুক্বাল্লিদকে মন্দ বলে জানে, সুতরাং তাক্বলীদই উত্তম রাস্তা আর মুক্বাল্লিদগণ হলেন উত্তম দল ।

---o---

হাদীস শরীফের আলোকে তাক্বলীদ

এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অনেক । কিছু সংখ্যক হাদীস নিম্নে উদ্ধৃত হচ্ছে-

হাদীস নং-১

ইবনে মাজাহ্ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণনা করেন-

اِتَّبِعُوْا السَّوَادَ الْاَعْظَمَ فَاِنَّهٗ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ

অর্থ: বড় দলের অনুসরণ করো । কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে পৃথক হলো, সে দোযখে আলাদাই হয়ে যাবে ।

বুঝা গেলো যে, মু'মিনের উচিৎ মুসলমানদের বড় দলের সাথে থাকা । দল থেকে পৃথক হওয়া দোযখে যাবার পথই । আম মুসলমান মুক্বাল্লিদ । সুতরাং গায়র মুক্বাল্লিদগণ যেন তাদের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে নেয় ।

হাদীন নং- ২-৪.

সর্ব ইমাম মুসলিম, তিরমিযী ও আহমদ হযরত হারিসাহ্ আশ'আরীর বরাতে বর্ণনা করেন-

مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ (مشكوٰة : كتاب الامارة)

অর্থ: যে ব্যক্তি দল থেকে এক বিঘত পরিমাণ বের হয়ে গেছে । সে ইসলামের পাট্টা (ফিতা) আপন ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলেছে । [মিশকাত: কিতাবুল ইমারত]

হাদীস নং-৫.

ইমাম মুসলিম ও ইমাম বোখারী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বরাতে উদ্ধৃত করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَاْزِرُ اِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَاْزِرُ الْحَيَّةُ اِلٰى جُحْرِهَا (مشكوٰة باب الاعتصام)

অর্থ: রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঈমান মদীনা মুনাওয়ারার দিকে তেমনিভাবে গুটিয়ে আসবে, যেমন সাপ তার গর্তের দিকে আসে । [মিশকাত শরীফ: বাবুল ই'তিসাম]

বুঝা গেলো যে, মদীনা মুনাওয়ারা সব সময় ইসলামের কেন্দ্র ভূমি থাকছে ও থাকবে । ওখানে কখনো, ইনশা-আল্লাহ্, শির্ক হবে না । আলহামদুলিল্লাহ্, সমগ্র হিজাযভূমি, বিশেষ করে মক্কা-ই মু'আয্যাহ্ ও মদীনা মুনাওয়ারার সমস্ত

মুসলমান মুক্বাল্লিদ ছিলেন এবং মুক্বাল্লিদই রয়েছেন। ওখানে গায়র মুক্বাল্লিদ একজনও ছিলোনা। নযীর হোসাঈন দেহলভী শরীফ হোসাঈনের যুগে হেরমাঈন শরীফাঈনে গিয়েছিলেন। তাকে গায়র মুক্বাল্লিদ হবার কারণে সেখানে গ্রেফতার করে নেওয়া হয়েছে। ওখানে তিনি তাক্বিয়্যাহবাজি করে (বাহ্যিকভাবে তাল মিলিয়ে) মুক্বাল্লিদ বনে প্রাণে বেঁচে যান। তারপর ভারতে এসে আবার 'গায়র মুক্বাল্লিদ' হয়ে যান। 'নযীর হোসাঈন' গায়র মুক্বাল্লিদদের নেতা ছিলেন। এখন যদিও সেখানে নজদীদের বাদশাহী চলছে; কিন্তু নজদীরাও নিজেদেরকে গায়র মুক্বাল্লিদ বলতে ভয় পায়। নিজেদেরকে তারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী বলে। যদি তাক্বলীদ শির্ক হতো, তবে হেরমাঈন শরীফাঈন তা থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন থাকতো।

হাদীস নং- ৬.

ইমাম আহমদ হযরত মু'আয ইবনে জবল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ الْفَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ اِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ

অর্থঃ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, শয়তান হচ্ছে মানুষের নেকড়ে বাঘ। যেভাবে নেকড়ে বাঘ পাল থেকে পৃথক থাকে অথবা এক পাশে থাকে অথবা বিচ্ছিন্ন থাকে এমন ছাগলকে শিকার করে, তেমনি শয়তান মুসলমানদের জমা'আত থেকে পৃথক থাকে এমন লোককে শিকার করে, তোমরা ঘাঁটিগুলো (উপত্যকাগুলো) থেকে বিরত থাকো, জমা'আত (দল) এবং আম মুসলমানদের সাথে থাকো। [মিশকাত: বাবুল ই'তিসাম]

হাদীস নং-৭.

لَا تَجْتَمِعُ اُمَّتِىْ عَلَى الضَّلَالَةِ وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَاِنَّ مَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ

অর্থঃ আমার উম্মত গোমরাহী বা পথ ভ্রষ্টতার উপর কখনো একমত হবে না। জমা'আত (ঐক্যবদ্ধ জনগোষ্ঠী)'র উপর আল্লাহর রহমত রয়েছে। যে ব্যক্তি জমা'আত থেকে পৃথক হয়েছে। সে দোযখে পৃথক হয়ে প্রবেশ করবে।

এ হাদীস শরীফগুলো থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলমানের জন্য বাঁচার একটা পথ রয়েছে যে, নিজের আক্বাইদ আম মুসলমানদের মতো রাখবেন। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দল থেকে পৃথক হয়ে থাকবে, সে শয়তানের শিকার হয়ে যাবে। মুসলমানদের আম জমা'আত মুক্বাল্লিদ। সুতরাং 'গায়র মুক্বাল্লিদ' হয়ে থাকা মুসলমানদের দল থেকে পৃথক হওয়ার নামান্তর মাত্র।

মুসলমানদের আমল

সব সময় প্রত্যেক স্তরের মুসলমান মুক্বাল্লিদ থাকেন। যেমন- মুহাদ্দিসগণ, মুফাস্সিরগণ, ফক্বীহ্গণ, আল্লাহর ওলীগণ। তাঁদের মধ্যে কেউ গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবী নন। সুতরাং ইমাম ক্বাস্তলানী ও তাজুদ্দীন সুব্কী সুস্পষ্ট ভাষায় আর ইমাম নাওয়াভী ইঙ্গিতে বলেছেন যে, ইমাম বোখারী শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী। সর্ব ইমাম তিরমিযী, আবূ দা'ঊদ, নাসাঈ ও দারু ক্বুত্বনী প্রমুখ মুহাদ্দিস শাফে'ঈ। সর্ব ইমাম ত্বাহাভী, ইমাম যায়লা'ঈ, আয়নী-শারেহে বোখারী, ত্বীবী, আলী ক্বারী, আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী প্রমুখ মুহাহিদ্দস হানাফী।

তাফসীর-ই কবীর, তাফসীর-ই খাযিন, বায়দ্বাভী, জালালাঈন, তানভীরুল মিক্বইয়াস প্রণেতাগণ প্রমুখ মুফাস্সির শাফে'ঈ। তাফসীর-ই মাদারিক ও তাফসীর-ই সাভী প্রণেতাদ্বয় প্রমুখ হানাফী। ফক্বীহ্গণ ও ওলীগণ সবাই মুক্বাল্লিদ। আর আম ওলীগণ হানাফী। যেমনটি আমি ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি। 'হে গায়র-মুক্বাল্লিদ-ওহাবীরা চিন্তা করুন, আপনাদের মধ্যে কতজন মুহাদ্দিস আছে? কতজন মুফাস্সির আছে? কতজন ফক্বীহ্ আছে? কতজন ওলী আছে? তোমাদের শিখড় কোন্ ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত? আর তোমরা কোন গাছের শাখা? অথবা কোন্ কোন শাখায় ফল?

যুক্তির দাবীও এ'যে, তাক্বলীদ হচ্ছে অত্যন্ত জরুরী ফরয। পক্ষান্তরে 'গায়র মুক্বাল্লিদিয়াত' ও নজাদিয়াত প্রাণবিনাশী বিষ। তদুপরি, ঈমানের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাও কয়েকটা কারণে-

এক. ক্বোরআন ও হাদীস মাসআলা বের করার জন্য সহজ নয়। সেগুলো থেকে মাসআলা বের করা অতি কঠিন বিষয়। এ কারণেই মহান রব ক্বোরআন শিখানোর জন্য এত বড় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যদি সেটা বুঝার জন্য শুধু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি যথেষ্ট হতো, তবে সেটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য হুযূর সাইয়্যেদে আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করা হতো না।

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

তরজমাঃ ওই রসূল মুসলমানদেরকে ক্বোরআন ও হিকমত শিক্ষা দেন।

ক্বোরআন বুঝানোর জন্য যেমন হুযূর-ই আক্রামকে প্রেরণ করা হয়েছে, তেমনি হাদীস বুঝানোর জন্য মুজতাহিদ ইমামগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেসব লোক

আজকাল তাক্বলীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে বসেছে, তারা ক্বোরআন ও হাদীসের ক্ষেত্রে এমন হোঁচট খাচ্ছে যে, আল্লাহরই পানাহ্! আমি বড় বড় গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীকে অনেকবার প্রকাশ্যে বলেছি, "হাদীস বুঝা তো দূরের কথা, তোমরা শুধু একথা বলো যে, হাদীস ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য কি? হাদীস কাকে বলে আর সুন্নাহ্ কাকে বলে? তোমরা তো নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে থাকো, আর আমরা হলাম 'আহলে সুন্নাহ্'। বলোতো তোমাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি? কিন্তু এ পার্থক্য হাদীস শরীফ থেকে নির্ণয় করতে হবে।" আজ পর্যন্ত তারা বলতে পারেনি। আর ইন্শা-আল্লাহ্, ক্বিয়ামত পর্যন্ত বলতে পারবে না। আমাদের ঘোষণা আম! আজও যদি কোন ওহাবী সাহেব কষ্ট করে জবাবটুকু দিন! হাদীস বুঝা, তা থেকে মাসআলা বের করা তো ওই বেচারার ভাগ্যে জুটছে কোত্থেকে? শুধু 'রফ্'ঈ ইয়াদায়ন' (অতিরিক্ত তাকবীরের সময় হাত উঠানো) আর 'আ-মী-ন বিল জেহর'-এর চারটি হাদীস, তাও না বুঝে প্রচার করে বেড়ায়। আর আহলে হাদীস বনে গেছে। হাদীস বুঝা তো আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে মুক্বাল্লিদদের কাজ। যদি হাদীস বুঝার মজা পেতে চান, তাহলে আমার 'হাশিয়া-ই বোখারী' (আরবী), অর্থাৎ 'ন'ঈমুল বারী' পাঠ-পর্যালোচনা করুন। তা'তে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহক্রমে একেক হাদীস শরীফ থেকে আট আট দশ দশটি মাসআলা বের করা হয়েছে। সেগুলো পাঠ-পর্যালোচনা করলে ঈমান তাজা হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি আম, প্রসিদ্ধ ও সংক্ষিপ্ত হাদীস শরীফ পেশ করছি-اُحُدٌ جَبَلٌ يُّحِبُّنَا وَنُحِبُّه **অর্থঃ** উহুদ এমন একটা পাহাড়, যা আমাদেরকে ভালবাসে, আমরাও সেটাকে ভালবাসি।

এ থেকে আমি এটা শরীয়ত ও ত্বরীক্বতের নিম্নলিখিত মাসআলাগুলো অনুমান করেছি-

এক. হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুধু মানুষের মাহবূব নন, বিবেকহীন পশু, প্রাণহীন কাঠ এবং পাথরও হুযূর-ই আকরামের প্রেমিক ও আশিক্ব। হযরত ইয়ূসুফের সৌন্দর্য লাখো মানুষ দেখেছে; কিন্তু আশিক্ব হয়েছেন শুধু যুলায়খা। হুযূর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আসল সৌন্দর্য আজ পর্যন্ত কেউ দেখেনি, কিন্তু আশিক্ব রয়েছে লক্ষ-কোটি। হুযূর-ই আক্রাম সমস্ত সৃষ্টির মাহবূব। তা হবেও না কেন? তিনি তো স্বয়ং মহান স্রস্টার মাহবূব।

দুই. যে মানুষের মনে হুযূর-ই আক্রামের ভালবাসা নেই, সে পাথর অপেক্ষাও কঠিন এবং পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

তিন. যখন হুযূর-ই আক্রাম পাথরের হৃদয়ের অবস্থা জানেন আর বলেন, উহুদ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসেন, তখন মানুষের হৃদয়ের রহস্য কেন জানবেন না? তাঁর নিকট কোন গায়ব (অদৃশ্য বস্তু) গোপন নেই।

চার. হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র দরবারে ইশ্ক্ব ও মুহাব্বত এবং হৃদয়ের অবস্থা মুখে বলার প্রয়োজন নেই। তিনি হৃদয়ের গভীরের কথাগুলোও জানেন। উহুদ মুখে কিছুই বলেনি; কিন্তু সেটার হৃদয়ের অবস্থা হুযূর-ই আক্রামের সামনে স্পষ্ট ছিলো। যদি হুযূর-ই আক্রাম মানুষের অন্তরের অবস্থাদি না জানেন, তবে কাল ক্বিয়ামতে সুপারিশ কিভাবে করবেন? যে কেউ হুযূর-ই আক্রামের দরবারে সুপারিশের জন্য দরখাস্ত করবে। তখন কি হুযূর একথা বলবেন, "আমি জানিনা, তুমি কি মু'মিন ছিলে, না কাফির? সুপারিশ কিভাবে করবো?" কেননা, কিছু লোক এমনও ছিলো, যারা ওযূ ছাড়াই মারা গেছে। তাদের চেহারাগুলোর উপর ওযূর নিদর্শনগুলোর আলো থাকবে না।

পাঁচ. সমস্ত ইবাদতের বদলা জান্নাত; কিন্তু হুযূর মোস্তফার ভালবাসার ফলশ্রুতি হচ্ছে-ভালবাসা, যেমন হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করেছেন, "উহুদ আমাদেরকে ভালবাসেন, আমরাও সেটাকে ভালবাসি।" সুতরাং ইশক্বে রসূল ইবাদতগুলো থেকে উত্তম। কারণ, এর বিনিময় হচ্ছে জান্নাতের মালিক মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম।

বোখারী শরীফের অন্য একটি হাদীস শুনুন। আর তা থেকে ঈমানী ও ইরফানী মাসআলাগুলোর অনুমান দেখুন এবং ঈমান তাজা করুন-

হাদীস শরীফ : হুযূর-ই আক্রাম দীর্ঘকান বিশিষ্ট একটি পশুর উপর আরোহণ করে তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন। সামনে দু'টি কবর পড়লো। পশুটি দু' পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেলো। হুযূর সেটার পৃষ্ঠ থেকে নেমে গেলেন। আর এরশাদ করলেন, এ কবর দু'টিতে সমাহিত লোক দু'টির উপর শাস্তি হচ্ছে, যা দেখে খচ্চরটি ভয় পেয়ে গেছে। তাদের একজন তো উট চড়াতো, যে উটের প্রস্রাবের ছিটকে থেকে নিজেকে বাঁচাতো না। আর অন্যকজন চোগলখোর ছিলো। এ কারণে কবরের আযাবে গ্রেফতার হয়ে আছে। এ কথা বলে খেজুর গাছের এক ডাল নিয়ে চিরে দু' ভাগ করে কবর দু'টির উপর পুঁতে দিলেন। আর এরশাদ করলেন, "যতক্ষণ এ দু'টি ভেজা (তাজা) থাকবে, কবরের আযাব লঘু করা হবে।

কতিপয় অনুমিত বিষয়

এ হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতিভাত হয়-

এক. হুযূর-ই আকরামের দু'চক্ষু মুবারকের সামনে কোন জিনিষ আড়াল হতে পারে না। তিনি পর্দার অপর পাশেও দেখতে পান। দেখুন, আযাব হাজারো মণ মাটির নিচে, অর্থাৎ কবরের ভিতর হচ্ছে; কিন্তু হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় চক্ষু যুগল কবরের উপরে থেকে দেখতে পাচ্ছে।

দুই. যে পশুর উপর হুযূর-ই আকরাম আরোহণ করতেন, ওই পশুর চোখের সামনে থেকেও পর্দা তুলে দেওয়া হতো, খচ্চরটি হুযূর-ই আক্রামের বরকতে কবরের আযাব দেখে নিয়েছিলো। আর থমকে দাঁড়িয়েছিলো। অন্যথায় আমাদের খচ্চরগুলো তো রাত দিন কবরস্থানগুলোর পাশ দিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু থমকে দাঁড়াচ্ছে না। সুতরাং হুযূর-ই আক্রাম যদি কোন ওলীর উপর কৃপাদৃষ্টি দেন, তাহলে তাঁর চোখ থেকেও গায়বী হিজাব উঠে যাবে।

তিন. হুযূর-ই আক্রাম প্রত্যেকের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, পূর্ব ও পরবর্তী সমস্ত আমল সম্পর্কে জানেন। তাই তিনি বলে দিয়েছেন যে, এক ব্যক্তি চোগলখোর ছিলো, আর অপর লোকটি প্রস্রাব থেকে বাঁচতোনা; অথচ তারা এ কাজগুলো হুযূর-ই আকরামের সামনে করেনি। সুতরাং হুযূর আমাদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে অবগত আছেন।

চার. হুযূর-ই আকরাম আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে ও আযাবকে দূরে সরিয়ে দিতে পারেন। এটা তাঁর জানা কথা। এমনকি তিনি আত্মিক রোগগুলো এবং সেগুলোর চিকিৎসা সম্পর্কেও অবগত আছেন। এ কারণে ওই কবর দু'টির শাস্তি দূর করার জন্য খেজুরের তাজা শাখা কবর দু'টির উপর গেড়ে দিয়ে বলেন, ''তাদের শাস্তি হাল্কা হবে।''

পাঁচ. তাজা ডালপালার তাসবীহ্‌র বরকতে মু'মিনের আযাব-ই কবর হাল্কা হয়। সুতরাং যদি কবরের উপরিভাগে (পাশে) ক্বোরআন তিলাওয়াত কিংবা আল্লাহর যিক্‌র করা হয়, তবে মৃত অবশ্যই উপকৃত হবে। কেননা মু'মিনের তাসবীহ্ ও তাহলীল (যথাক্রমে, 'সুবহানাল্লাহ্' ও 'আল্লাহু আকবার' যিকর) তাজা ডালপালার তাসবীহ্ অপেক্ষা উত্তম।

ছয়. যদিও শুষ্ক জিনিষগুলো তাসবীহ্ পড়ে-وَاِنْ مِّنْ شَيْئٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِه (প্রতিটি বস্তুই আল্লাহর প্রশংসা সহকারে তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে); কিন্তু

সেগুলোর তাসবীহ্ দ্বারা কবরের আযাব দূরীভূত হয় না। যিকরের প্রভাব পড়ার জন্য রসনা ও প্রভাব বিস্তারকারী হওয়া জরুরী। সুতরাং ওহাবী প্রমুখ শুষ্কদের তিলাওয়াত-ই ক্বোরআন ইত্যাদিতে কোন উপকার নেই। মু'মিন, যার হৃদয়ে হুযূর মোস্তফার ভালবাসার তারল্য ও সজীবতা থাকে, তার যিকর হচ্ছে প্রভাব সম্পন্ন।

সাত. মু'মিনের কবরের উপর লাল-সবুজ তথা তাজা ফুল রাখা উপকারী। কারণ, তা দ্বারা কবরবাসীর উপকার হয়। হুযূর-ই আক্রাম তাজা শাখা কবরের উপর লাগিয়ে ছিলেন। আর এরশাদ করেছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি তাজা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আযাব লঘু করা হবে।

আট. হালাল পশুর প্রস্রাব নাপাক। তা থেকে নিজেকে বাঁচানো জরুরী। সেটার ছিটকে কবরের আযাবের কারণ। দেখুন, উটের গোশ্‌ত হালাল; কিন্তু সেটার প্রস্রাবের ছিটকে কবরের আযাবের কারণ।

এ পর্যন্ত আমি আপনাদেরকে 'হাশিয়া-ই বোখারী'র অঙ্গনে কিছুটা ভ্রমণ করালাম। এখন আমার 'হাশিয়া-ই ক্বোরআন'-এর ময়দানেও কিছুটা ভ্রমণ করাতে চাই। শুধু একটি আয়াত থেকে অনুমিত কিছু মাসাইল আরয করছি। আয়াতটি নিম্নরূপ:

فَمَادَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖۤ اِلاَّ دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ مِنْسَاَتَهٗ

তরজমা: জিনদেরকে হযরত সুলায়মানের ওফাতের কথা কেউ জানায়নি, কিন্তু (জানিয়েছে) যমীনের উই পোকা, যা তাঁর লাঠি খাচ্ছিলো।

হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর ওফাত নামাযের অবস্থায় হয়েছিলো। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পুনর্নির্মাণের কাজ চলছিলো। তিনি ওইভাবে লাঠির উপর ভর করে দন্ডায়মান ছিলেন। দীর্ঘ ছয়মাস পর উইপোকা লাঠিটা খেয়ে ফেললো। লাঠিটা পড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর শরীর মুবারক যমীনের উপর ঢলে আসছিলো। তখন জিনগুলো, যারা বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ কাজ করছিলো, কাজ ছেড়ে পলায়ন করেছিলো।

এ আয়াত ও ঘটনা থেকে যে কয়েকটা মাসআলা অনুমতি হয়ঃ

এক. নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর শরীর মুবারকগুলো বিকৃত ও বিগড়ে যাওয়া থেকে সংরক্ষিত। হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর দেহ শরীফ ছয় মাস পর্যন্ত স্থির ছিলো; কিন্তু কোন পরিবর্তন আসেনি।

দুই. সম্মানিত নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর দেহ শরীফগুলোকে পোকা খেতে পারে না। দেখুন, উই পোকা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর লাঠি খেয়েছে, কিন্তু তাঁর পা শরীফ খায়নি। সুতরাং হযরত ইয়াক্বুব আলায়হিস্

সালাম-এর নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো যে, হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামকে নেকড়ে বাঘ খায়নি। এ ছেলেরা ভুল বলছে।

তিন. পয়গাম্বরের কাফনও গলে যাওয়া এবং অপরিচ্ছন্ন হওয়া থেকে নিরাপদ। দেখুন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর পোশাক শরীফ এ ছয় মাসে ছিঁড়েও যায়নি, অপরিচ্ছন্নও হয়নি। অন্যথায় জিনেরা তাঁর ওফাত সম্পর্কে জেনে যেতো।

চার. সম্মানিত নবীগণ ওফাতের পরও দুনিয়াবী ও দ্বীনী চাহিদাদি পূরণ করেন। দেখুন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম ওফাত শরীফের পর বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ কাজ পূর্ণাঙ্গ করিয়েছেন।

পাঁচ. দ্বীনী প্রয়োজনে পয়গাম্বরের দাফন-কাফনে বিলম্ব করা আল্লাহ্‌র সুন্নাত। দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা মসজিদের নির্মাণকাজ পরিপূর্ণ করার জন্য হযরত সুলায়মানের ওফাতের পর দীর্ঘ ছয়মাস পর্যন্ত দাফন-কাফন ছাড়া রেখে দিয়েছেন। সুতরাং সাহাবা-ই কেরামের খলীফা নির্বাচনের কাজ পূর্ণাঙ্গরূপে সমাধা করার জন্য হুযূর-ই আক্বরামের কাফন-দাফনে বিলম্ব করা একেবারে বিশুদ্ধ ছিলো। কেননা, খিলাফতের কাজ পূর্ণাঙ্গ করা মসজিদের কাজ পূর্ণাঙ্গ করার চেয়ে বহুগুণ বেশী শ্রেয় ও গুরুত্বপূর্ণ।

ছয়. হার্টফেল অর্থাৎ হঠাৎ মৃত্যু আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্য তিরস্কার নয়; বরং রহমত। দেখুন, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম-এর ওফাৎ হঠাৎ হয়েছে; কিন্তু রহমত ছিলো। অবশ্য উদাসীনের জন্য আযাব। কারণ, এর ফলে তাদের তাওবা করার সুযোগ পাওয়া যায় না। সুতরাং হাদীস শরীফ সুস্পষ্ট।

আরো কয়েকটি আয়াত শরীফের মর্মার্থ ও সেটা থেকে অনুমিত মাসা-ইল দেখুন, যেগুলো আমি ওই 'হাশিয়াতুল ক্বোরআন'-এ বর্ণনা করেছি। আয়াতটি হচ্ছে-

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۔ وَرَاَیْتَ النَّاسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

তরজমা: ১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে, ২. এবং আপনি লোকদেরকে দেখবেন যে, আল্লাহর দ্বীনে দলে দলে প্রবেশ করছে, ৩. অতঃপর আপনি প্রতিপালকের প্রশংসাকারী অবস্থায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

[কান্‌যুল ঈমান: আয়াত-১-৩]

এ আয়াত শরীফে আল্লাহ্ তা'আলা আপন মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট নিজের নি'মাতের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ওই নি'মাত দু'টির শোকরিয়া আদায়ার্থে মহান রবের তাসবীহ্ ও হামদের হুকুম দিয়েছেন;

একটি হলো মক্কা বিজয়, আর অপরটি হলো- বিজয়ের দিনে ও এর পরবর্তী সময়ে লোকদের দলে দলে ইসলাম কবূল করা।

এ আয়াত শরীফ থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রতীয়মান হয়-

এক. সাহাবা-ই কেরামের সংখ্যা দু/চার কিংবা দশ/বিশ নয়; বরং হাজার-হাজার। কেননা, মহান রব তাঁদেরকে 'আফওয়াজ' অর্থাৎ 'দলে দলে' বলেছেন। দু/চারজন মানুষকে 'ফৌজগুলো' বলা হয়না। যেমন সম্মানিত নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর সংখ্যা, মতান্তরে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তাঁদের মধ্যে তিনশ' তেরজন 'রসূল', চারজন 'মুরসাল'। অনুরূপ, সাহাবা-ই কেরাম এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তাঁদের মধ্যে তিনশ' তের জন বদরী, চারজন 'খোলাফা-ই রাশিদীন'। যারা বলে, মু'মিন-সাহাবী ছিলেন মাত্র চার/পাঁচ জন, তাঁরা এ আয়াতের অস্বীকারকারী।

দুই. মক্কা বিজয়ের দিনে এবং এর পরবর্তী সময়ে ঈমান গ্রহণকারীদের ঈমান মহান রবের দরবারে কবূল হয়েছে। কারণ, তাঁদের সম্পর্কে মহান রব এরশাদ করেছেন, তাঁরা আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করেছেন। দ্বীনে তাঁদের প্রবেশ করা ক্বোরআন মজীদ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং হযরত আবূ সুফিয়ান, হিন্দা, ইকরামা, আমীর মু'আভিয়া প্রমুখ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম সাচ্ছা, পাকাপোক্ত ও নিষ্ঠাবান মু'মিন। যে বা যারা তাঁদের ঈমান সম্পর্কে সন্দেহ করে কিংবা অস্বীকার করে, সে বা তারা এ আয়াত শরীফকে অস্বীকার করে।

তিন. মক্কা বিজয়ের দিনে ঈমান আনায়নকারীদের মধ্যে কেউ মুনাফিক্ব ছিলেন না; সবাই ঈমানের উপর স্থির ছিলেন। তাঁদের শেষ নিঃশাস ঈমানের উপর বের হয়েছে। কেননা, তাঁদের ঈমানের মধ্যে প্রবেশ করার পক্ষে স্পষ্ট আয়াত রয়েছে; ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবার পক্ষে কোন আয়াত নেই। অনুরূপ, মহান রব তাঁদের ঈমানের উল্লেখ আল্লাহর নি'মাত হিসেবে করেছেন। যদি তাঁরা ভবিষ্যতে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবেন এমন হতেন, তবে মহান রব তাসবীহ্ ও তাহমীদের হুকুম দেওয়ার পরিবর্তে এভাবে বলতেন, "হে মাহবূব! তাদের ঈমানের উপর ভরসা করবেন না, এরা ফিরে যাবে।" এখন যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা তাঁদের কারো কুফর প্রমাণ করছে বলে মনে হয়, সেগুলো মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, ক্বোরআন শরীফের পরিপন্থী।

হে ওহাবীরা! বলুন, আজ পর্যন্ত ক্বোরআন ও হাদীসের এমন ঈমান সতেজকারী খোদা পরিচিতিদায়ক মাসআলা-মাসাঈল কোন ওহাবীর ধারণা-কল্পনায়ও এসেছে কিনা। এ নি'মাত তো আল্লাহ্ তা'আলা মুক্বাল্লিদদেরকে দান করেছেন। আপনারা তো শুধু ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ তরজমা করাই শিখেছেন।

হে হানাফী ভাইয়েরা!

যদি আপনাদের মধ্যে এমন শতশত আরিফানা ও আশিক্বানা ঈমানী মাসআলা-মাসাইল দেখার আগ্রহ থাকে, তবে আমার 'হাশিয়াতুল ক্বোরআন' (উর্দু) এবং 'হাশিয়া-ই বোখারী' ('ইন্শিরাহ্-ই বোখারী) [আরবী] পাঠ-পর্যালোচনা করুন।

দ্বিতীয়ত, ক্বোরআন ও হাদীস হচ্ছে- ঈমানী চিকিৎসার ঔষধরাজি। যখন ইউনানী চিকিৎসার ঐষধগুলো প্রত্যেকে নিজের রায় দ্বারা নির্ণয় করতে পারে না, যদি করে, তাহলে নিজের প্রাণটুকু খুইয়ে বসবে, তেমনি ক্বোরআন ও হাদীস থেকে প্রত্যেকে মাসআলা বের করতে পারে না; যদি বের করে তবে ওহাবীদের মতো ঈমানহারা হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, ক্বোরআন ও হাদীস হচ্ছে সমুদ্র। সমুদ্র থেকে যেমন প্রত্যেকে মুক্তা আহরণ করে আনতে পারে না, তেমনি ক্বোরআন ও হাদীস থেকে প্রত্যেকে মাসআলা বের করতে পারে না। আপনারা মুক্তা সমুদ্র থেকে পাবেন না; বরং স্বর্ণাকারের দোকান থেকে পাবেন, তেমনি আপনারা মাসাইল ক্বোরআন ও হাদীস থেকে পাবেন না, বরং ইমাম আবূ হানীফাও ইমাম শাফে'ঈ প্রমুখ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে পেতে পারো।

চতুর্থত, দুনিয়ার প্রত্যেকে কোন না কোন পেশোয়ার মুক্বাল্লিদ হয়। খানা পাকানো, কাপড় সেলাই, করা, পোশাক পরা, মোটকথা, দুনিয়ার কোন কাজ এমন নেই, যাতে সেটার বিশেষজ্ঞদের তাক্বলীদ বা অনুসরণ করা হয় না। দ্বীন তো দুনিয়া থেকে অনেকগুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যদি তাতে প্রত্যেকে লাগামহীন উটের মতো বন্ধনহীন হয়, যেটার সেদিকে সুযোগ হয়েছে মুখ লাগিয়ে দিয়েছে, তবে তো দ্বীন ধ্বংস হয়ে যাবে।

গায়র-মুক্বাল্লিদ ওহাবীদের উচিৎ, তারা যেন পায়ে টুপি, মাথায় জুতা, পাগুলোতে জামা ও কাঁধের উপর জায়জামা পরে নেন। কেননা, আম লোকদের মতো লেবাস-পোশাক পড়লে তো তা 'তাক্বলীদ' হয়ে যাবে। এরাই হলেন 'গায়র মুক্বাল্লিদ'। এ কেমন কথা যে, আপনারা প্রত্যেক কাজে, যে কোনভাবে মুক্বাল্লিদ। কিন্তু শুধু তিন/চারটা মাসআলায় যেমন- ইমামের পেছনে ক্বিরআত, রফ'ই ইয়াদায়ন ইত্যাদিতে গায়র মুক্বাল্লিদ। যদি আপনারা গায়র মুক্বাল্লিদই হোন, তাহলে পূর্ণাঙ্গভাবে হোন, প্রত্যেক কাজ নতুন নতুনভাবে, আজব ধরনের করুন, প্রত্যেক কথাও নতুনভাবে, আজব ধরনের বলতে থাকো।

পঞ্চমত, বাহ্যত: হাদীসগুলোতে এতো 'পরস্পর বিরোধ' আছে বলে মনে হয় যে, আল্লাহরই পানাহ্! এক মাসআলা সম্পর্কে যখন হাদীসমূহ দেখা হয়, তখন

মাথা ঘুরে যায়। যদি তাক্বলীদ করা না হয়; শুধু হাদীসগুলো দেখা হয়, তবে হতভম্বতা আসে। হে আল্লাহ! কি করবো? কোথায় যাবো? হে ওহাবীরা, দু' রাক্'আত এমনভাবে পড়ে দেখান, যাতে সব হাদীস অনুসারে আমল হয়। একেক মাসআলার উপর দশ দশ প্রকারের রেওয়ায়ত মওজুদ আছে, হুযূর-ই আক্রাম কি 'বিতরের নামায' এক রাক্'আত পড়তেন, না তিন কিংবা পাঁচ অথবা সাত রাক্'আত পড়তেন, নাকি এগার ও তের রাক্'আত পড়তেন। এখন গায়র মুক্বাল্লিদ এমন বিতর পড়িয়ে দেখান। যা'তে সব হাদীস অনুসারে আমল হয়ে যায়। এক ওহাবী 'উচ্চস্বরে আমীন' বললো এবং সেটার পক্ষে একটা হাদীসও পড়লো। আমি নিরবে 'আ-মী-ন' বলার পক্ষে পাঁচটি হাদীস পড়ে পেশ করলাম। বেচারা আমার দিকে তাকিয়েই রইলো। এ কাজতো মুজতাহিদদেরই। তিনি দেখেন কোন হাদীস নাসিখ, কোনটা মানসূখ, কোন হাদীস প্রকাশ্য অর্থের উপর আছে, কোন্টার তা'ভীল বা ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া ওয়াজিব। হাদীস শরীফ অনুসারে ওই ব্যক্তি আমল করবেন, যিনি রসূল-ই আক্রামের মেজাজ শরীফ সম্পর্কে জানেন এবং পায়গাম্বরের ভেদ সম্পর্কে অবগত। এ মেজাজ শরীফ ও ভেদ অবগত হওয়া যেন তেন মানুষের কাজ নয়।

ওহাবী এবং হাদীস

গায়র মুক্বাল্লিদদের আসল নাম 'ওহাবী'; উপাধি নজদী। কেননা, তাদের পূর্ববর্তী মূল পুরুষ হলো 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব' যে নজদের অধিবাসী ছিলো। যদি তাদেরকে ওই পূর্ববর্তী মূল পুরুষের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তবে তাদেরকে 'ওহাবী' বলা হয়। আর যদি তার জন্ম স্থানের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়, তবে 'নজদী' বলা হবে। যেমন মীর্যা গোলাম আহমদ ক্বাদিয়ানীর উম্মতকে 'মীর্যায়ী'ও বলা হয় এবং 'ক্বাদিয়ানী'ও। প্রথমটির সম্পৃক্ততা পূর্বপুরুষের সাথে, আর দ্বিতীয় সম্পৃক্ততা জন্মস্থানের দিকে। এ দল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী খোদ্ হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এরই ছিলো। কারণ, তিনি নজদ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন- هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ **অর্থ:** নজদে ভূ-কম্পন এবং ফিৎনা হবে আর সেখান থেকে এক শয়তানী ফির্ক্বা বের হবে।

মোটকথা, এ ফির্কার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে 'মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদী'। আর হিন্দুস্তানে তার লালন-পালনকারী হচ্ছে ইসমাঈল দেহলভী। এ ফির্ক্বার অবস্থাদি সম্পর্কে আমার কিতাব 'জা-আল হক্ব' : ১ম খন্ড'-এ দেখুন। এসব লোক আম মুসলমানদেরকে মুশরিক এবং শুধু নিজেদের দলকে 'একত্ববাদী'

বলে থাকে। মুক্বাল্লিদদের প্রাণের দুশমন আর তারা চার ইমাম- হযরত ইমাম-ই আ'যম আবূ হানীফা, ইমাম শাফে'ঈ, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম আজমা'ঈনের শানে আক্বদাসে বেয়াদবী ও তাঁদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্যাদি করে থাকে।

এসব লোক নিজেরা নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' অথবা 'হাদীস অনুযায়ী আমলকারী' (আমিল বিল হাদীস) বলে দাবী করে। এসব লোক প্রথমে তো নিজেদেরকে গৌরব সহকারে 'ওহাবী' বলতো। সুতরাং তাদের অনেক কিতাবের নাম 'তোহ্ফা-ই ওহাবিয়াহ্' ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু এখন 'ওহাবী' নামে ডাকলে রেগে যায়। তাদের আক্বীদা ও আমল উভয়ই অতিমাত্রায় অপবিত্র। তারা 'ইসলাম ও মুসলমানদের স্বচ্ছ দামনের উপর বিশ্রী দাগের সামিল! আমি এখানে 'আহলে হাদীস' নামের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি; যাতে বুঝা যায় যে, তাদের নামটাও শুদ্ধ নয়। মুসলমানদের নিকট বিচারের দায়িত্ব বর্তানো হলো আর আল্লাহ্ তা'আলা ও তার মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পাক দরবারে কবুল হবার আশা পোষণ করছি।

স্মর্তব্য যে, দুনিয়ায় কেউই 'আহলে হাদীস' কিংবা 'আমিল বিল হাদীস' হতেই পারে না। কারো 'আহলে হাদীস' অথবা 'আমিল বিল হাদীস' হওয়া তেমনি অসম্ভব, যেমন দু'টি বিপরীতধর্মী জিনিষ একত্রিত হওয়া অসম্ভব। কেননা, 'হাদীস'-এর আভিধানিক অর্থ- কথা, কথোপকথন অথবা বাণী। মহান রব এরশাদ ফরমাচ্ছেন-

১. فَبِاَیِّ حَدِیْثٍ بَعْدَہٗ یُؤْمِنُوْنَ (ক্বোরআনের পর কোন কথার উপর তারা ঈমান আনবে?) ২. اَللّٰہُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِیْثِ (আল্লাহ্ তা'আলা সর্বাপেক্ষা উত্তম বাণী নাযিল করেছেন।) ৩. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّشْتَرِیْ لَھْوَ الْحَدِیْثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰہِ (কিছু লোক হচ্ছে তারা, যারা খেলা-তামাশার কথা ও নভেল-কিস্সা ক্রয় করে), যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে।)

এ তৃতীয় আয়াতে নভেল, কিস্সা-কাহিনীগুলোকে 'হাদীস' বলা হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায়, 'হাদীস' ওই বাণী ও বচনের নাম, যাতে হুযূর সাইয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীসমূহ অথবা কর্মসমূহ, অনুরূপ, সাহাবা-ই কেরামের কথা ও কাজগুলো বর্ণনা করা হয়। ওই 'আমিল-বিল হাদীস' (হাদীস অনুসারে কর্মসম্পাদনকারী) ফির্ক্বার প্রতি প্রশ্ন- আপনারা কোন্ 'হাদীস' অনুসারে আমলকারী? আভিধানিক হাদীস অনুসারে, না পারিভাষিক হাদীস অনুসারে যদি আভিধানিক হাদীস অনুসারে আমলকারী হোন? তবে উচিৎ হবে প্রত্যেক নভেলগো, কিস্সাখানি করে এমন লোকও 'আহলে

হাদীস' হওয়া। অর্থাৎ তারা 'হাদীস' তথা কথা বলে, প্রত্যেক সত্য ও মিথ্যা কথা অনুসারে আমল করে।

যদি পরিভাষার 'হাদীস' অনুসারে আমলকারী হন, তবে আবার এ প্রশ্ন জাগবে, আপনারা প্রত্যেক হাদীস অনুসারে আমল করেন, না কিছু সংখ্যক হাদীস অনুসারে আমল করেন? এ শেষোক্ত কথা তো ভুল। কেননা, হুযূর-ই আক্রামের কোন না কোন বাণী অনুসারে প্রত্যেকেই আমল করে থাকে। হুযূর-ই আকরাম বলেন, "সত্য মুক্তি দেয়, মিথ্যা ধ্বংস করে।" প্রত্যেক মুশরিক ও কাফির এ কথা স্বীকার করে। সুতরাং তারা সবাই 'আহলে হাদীস' হয়ে গেলো! আপনারা হানাফী, শাফে'ঈ, মালেকী ও হাম্বলী মুসলমানদেরকে 'আহলে হাদীস' বলে কেন মানছেননা। তাঁরা তো হাজারো হাদীস অনুসারে আমল করেন। যদি 'আহলে হাদীস' মানে এ হয় যে, 'তারা সমস্ত হাদীস অনুসারে 'আমলকারী', তবে তো এটা অসম্ভব। কেননা, হুযূর-ই আক্রামের কিছু সংখ্যক হাদীস মান্সূখ, আবার কিছু সংখ্যক হাদীস তেমনি রয়েছে, যেগুলোতে হুযূর-ই আক্রামের ওইসব বিশেষ আমল শরীফ বর্ণিত হয়েছে, যা হুযূর-ই আক্রামের জন্য মুবাহ্ অথবা ফরয ছিলো, আমাদের জন্য হারাম। যেমন, মিম্বরের উপর নামায পড়া, উটের পিঠে চড়ে তাওয়াফ করা, হযরত হুসায়ন সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা, খাতিমে আহলে 'আবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জন্য নামাযের সাজদাকে দীর্ঘায়িত করা, হযরত উমামাহ্ বিনতে আবিল 'আসকে কাঁধের উপর নিয়ে নামায পড়া, নয়জন স্ত্রী একসাথে বিবধাহীন রাখা, মহর ছাড়া বিবাহ্ হয়ে যাওয়া, স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা ও মহর ওয়াজিব না হওয়া; বরং হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কলেমা এভাবে পড়তেন- لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰہِ (আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্য নেই, আর আমি আল্লাহর রসূল) এসব লোক (আহলে হাদীস) এ হাদীসের উপর আমল করে এভাবে কলেমার ওযীফা পড়তে পারবেন না। মোটকথা, 'হাদীস'-এ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বাণীসমূহ ও কর্মসমূহের উল্লেখ রয়েছে, যা হুযূরের জন্য পূর্ণতাই কিন্তু আমাদের জন্য কুফর।

অনুরূপ, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওই পবিত্র কর্মসমূহও, যেগুলো ভুলবশত কিংবা ইজতিহাদী ভুলবশতঃ সম্পন্ন হয়েছে, 'হাদীস'-এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং 'আমিল বিল হাদীস' (হাদীস অনুসারে আমলকারী)'র উচিৎ হচ্ছে-ওইগুলো অনুসারেও আমল করা; কারণ তারা তো প্রত্যেক হাদীস অনুসারে আমলকারী। মোটকথা, কেউ প্রত্যেক হাদীস অনুসারে আমল করতে পারে না। যারা এ অর্থে নিজেদেরকে 'আহলে হাদীস' অথবা 'আমিল বিল হাদীস' বলে দাবী করেন তারা তো ভুল দাবী করেন। যখন

নামই ভুল ও মিথ্যা, তখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, সব ক'টি কাজও খুঁত সম্পন্ন হবে। এ কারণে হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ করেছেন- عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ **অর্থ:** "আঁকড়ে ধরো আমার ও খোলাফা-ই রাশেদীনের সুন্নাতকে।" এ কথা এরশাদ করেননি, 'আমার হাদীসকে আঁকড়ে ধরো।' কেননা, প্রত্যেক হাদীস অনুসারে আমল করা সম্ভবপর নয়; কিন্তু প্রত্যেক সুন্নাত অনুসারে আমল করা সম্ভব। হুযূর-ই আক্‌রামের ওই পবিত্র আমল, যেগুলো মানসূখও হয়নি, হুযূর-ই আক্‌রামের জন্য খাসও নয়; ভুলবশত:ও সম্পন্ন হয়নি, বরং উম্মতের জন্য আমল করার উপযোগী, সেগুলোকেই 'সুন্নাত' বলা হয়।

সুতরাং আমাদের নাম 'আহলে সুন্নাত' একেবারে হক্ব ও সঠিক। কারণ, আমরা মহামহিম আল্লাহর অনুগ্রহক্রমে, হুযূর-ই আক্‌রামের প্রত্যেক সুন্নাত অনুসারে আমলকারী; কিন্তু ওহাবীদের নাম 'আহলে হাদীস' সম্পূর্ণ ভুল; কারণ প্রত্যেক হাদীস অনুসারে আমল করা সম্ভবপর নয়।

বাকী রইলো হাদীসগুলো যাচাই-বাছাই করা- কোন হাদীসটা মান্‌সূখ, কোন হুকুম, কোন্ হাদীস হুযূর-ই আক্‌রামের বিশেষত্বগুলোর অন্তর্ভুক্ত, কোনটা সবার অনুসরণের জন্য; কোন্ কর্ম শরীফ অনুসরণের জন্য, কোন্‌টা নয়, কোন্ বাণী শরীফের কি মর্মার্থ, কোন্ হাদীস শরীফ থেকে কি মাসআলা সুস্পষ্টভাবে (صراحة) প্রমাণিত, কোন মাসআলা ইঙ্গিতে (اشارة) কোন্ মাসআলার শব্দাবলী প্রত্যক্ষ অর্থবোধক (دلالة), কোন মাসআলার শব্দাবলী পরোক্ষ অর্থ (اقتضاء) থেকে প্রতিভাত- এ সবকটি মুজতাহিদ ইমামই বলতে পারেন। আমাদের মতো সাধারণ লোক এই মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারি না। যেমন ক্বোরআন অনুসারে আমল (কাজ) করানো হাদীস শরীফের কাজ, তেমনি হাদীস শরীফ অনুসারে আমল করানো মুজতাহিদ ইমামের কাজ। এমনই বুঝে নিন যে, হাদীস শরীফ হচ্ছে মহান রব পর্যন্ত পৌঁছানোর রাস্তা। আর মুজতাহিদ ইমাম হচ্ছেন ওই রাস্তার আলো। আলো ব্যতীত যেমন রাস্তা অতিক্রম করা যায়না, তেমনি ইমাম ও মুজতাহিদ ব্যতীত হুযূর-ই আকরামের সুন্নাত অনুসারে আমল করা সম্ভবপর নয়। এ কারণেই বিজ্ঞ আলিমগণ বলেন- اَلْقُرْاٰنُ وَالْحَدِيْثُ يُضِلَّانِ الاَّ بِالْمُجْتَهِدِ

অর্থ: মুজতাহিদ ব্যতীত ক্বোরআন ও হাদীস পথভ্রষ্ট হয়ে যাবার কারণ হয়।

মহান রব ক্বোরআন-ই করীম সম্পর্কে বলেন- يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَيَهْدِىْ بِهٖ كَثِيْرًا **তরজমা:** আল্লাহ্ তা'আলা ক্বোরআনের মাধ্যমে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন এবং তা দ্বারা অনেককে হিদায়ত দেন। [২:২৬]

চাকড়ালভী সম্প্রদায় এ জন্য পথভ্রষ্ট যে, তারা ক্বোরআন শরীফকে হাদীস শরীফের আলো ব্যতীত বুঝতে চায়। তারা সরাসরি মহান রব পর্যন্ত পৌঁছাতে চায়। ওহাবী-গায়রে মুক্বাল্লিদ এজন্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত। কারণ, তারা এ হাদীস শরীফকে ইল্‌মের আলো ব্যতীত এবং মুজতাহিদ ইমামের নূর ব্যতীত বুঝতে চায়। মুক্বাল্লিদ আহলে সুন্নাতের নৌযান, আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে, তীরে এসে লেগে থাকে। কারণ, তাঁদের নিকট আল্লাহর কিতাবও রয়েছে, রসুলে করীমের সুন্নাতও রয়েছে। আর উম্মতের প্রদীপ মুজতাহিদ ইমামের নূরও রয়েছে।

সারকথা হলো- 'আহলে হাদীস' হওয়া অসম্ভব এবং মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আর 'আহলে সুন্নাত' হওয়া সত্য ও সঠিক। 'আহলে সুন্নাত' সে-ই হতে পারবে, যে কোন ইমামের অনুসারী হবে, ক্বিয়ামতে মহান রবও আপন বান্দাদেরকে ইমামদের সাথে ডাকবেন। মহামহিম রব এরশাদ করেন- يَوْمَ نَدْعُوْ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ **তরজমা:** ওই দিন আমি প্রত্যেককে তার ইমামের সাথে ডাকবো।

স্মরণ রাখবেন- ক্বোরআন ও সুন্নাহ্‌রূপী সমুদ্র আমরা মুক্বাল্লিদগণও পার হই; গায়র মুক্বাল্লিদ ওহাবীরাও; কিন্তু আমরা 'তাক্বলীদ'-এর জাহাজের মাধ্যমে, যার চালক হলেন ইমামে আ'যম আবূ হানীফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, তাঁর দায়িত্বে আমরা সফর করছি। আর গায়র-মুকাল্লিদ ওহাবী তাদের নিজ দায়িত্বে এ সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ছে। ইনশা-আল্লাহ্, মুক্বাল্লিদদের নৌযান তীরে ভিড়ে থাকে, আর ওহাবীদের পরিণাম হচ্ছে নিমজ্জিত হওয়া।

পরিশেষে, 'আহলে হাদীস' সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আমরা জিজ্ঞাসা করছি, 'ইসলামের প্রথম ইবাদত হচ্ছে নামায। দয়া করে আপনারা সহীহ্ হাদীসগুলোর আলোকে বলুন- ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মাকরূ-ই তাহরীমী এবং হারাম-এর মধ্যে পার্থক্য কি? আর নামাযে ফরয কয়টি? ওয়াজিব কয়টি? সুন্নাত কয়টি? মুস্তাহাব কয়টি? মাকরূহ-ই তানযীহী কয়টি? মাকরূ-ই তাহরীমী কয়টি? হারাম কয়টি? ইনশা-আল্লাহ্, ক্বিয়ামত পর্যন্ত এসব মাসআলা এসব লোক হাদীসের আলোকে বলতে পারবেন না; অথচ দিন ও রাতে এসব মাসআলার সাথে সম্পৃক্ত থাকেন। সুতরাং হে বন্ধুরা, জেদ করছেন কেন? 'তাক্বলীদ' অবলম্বন করুন! যা'তে দ্বীনী ও দুনিয়াবী মঙ্গল রয়েছে!

মহান রব আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় এটা কবূল করুন! আমার জন্য গুনাহর কাফ্‌ফারা করুন! এবং সাদক্বাহ-ই জারিয়া করে দিন! আর মুসলমানদের জন্য সেটাকে উপকারী সাব্যস্ত করুন! যে কেউ এ কিতাব দ্বারা উপকৃত হবেন, তিনি যেন আমি অসহায় গুনাহ্‌গারের জন্য, উত্তম পরিণতি ও গুনাহ্ মাফ হবার জন্য দো'আ করেন। বস্তুত এ আশায়ই আমি এ মেহনত করেছি।

وَصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ - بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ